সানন্দা
বোধন
২০২২



বোধন ২০২২

সানন্দা

সূচিপত্র

গল্প ১



৪৯

ফাঁদ

অংশু পাণিগ্রাহী

টাকাভর্তি মানিব্যাগ খুঁজে পেয়ে আনন্দ আর ধরছে না মতির! কী হবে, যখন সেই টাকার আসল মালিকদের মুখোমুখি হবে সে?

৮ ফ্যাশন ২
‘আনন্দ’ শাড়ির সাজে গায়িকা মধুবন্তী বাগচী।
১৪ রান্নাঘর ১
বাংলাদেশের আমিষ ভর্তা।
২৮ ফিটনেস
পাউন্ড ওয়র্কআউট।
৩২ বিশেষ রচনা ১
বিভিন্ন রাজ্যের দেবী আরাধনা
৪৪ রান্নাঘর ২
বার্মিজ রেসিপির সন্ধান।
৫৪ ফ্যাশন ৩
সাবেকি থেকে ওয়েস্টার্ন পোশাক, অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তীর পুজো ফ্যাশনের এক্সক্লুসিভ ঝলকের কোলাজ।
৬০ বিশেষ রচনা ২
বিপ্লবের অগ্নিকন্যাদের স্মরণ।
৬৪ অন্দরসাজ
পুরনো আসবাব অদল-বদল করলেই আপনার ঘর পুজো-রেডি! হদিশ রয়েছে ‘অন্দরসাজ’-এর অন্দরে।
৭০ ফ্যাশন ৪
অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্যের ফেস্টিভ স্টাইল স্টেটমেন্ট।
৭৮ রান্নাঘর ৩
বাংলার হারিয়ে যাওয়া মিষ্টি।
৮৬ বিনোদন ১
ওটিটির জনপ্রিয় বাংলাদেশের পাঁচ কলাকুশলীর সাক্ষাৎকার।
৯৩ বিশেষ রচনা ৩
দুর্গাপুজো ও আন্তর্জাতিকতা।
১০৫ ব্যক্তিত্ব
সদ্যপ্রয়াত রানির স্মরণে...।
১০৯ বিনোদন ২
ফোক-ঘরানার তারকারা।
১১৫ বিশেষ রচনা ৪

সৌন্দর্য ১

লেটেস্ট লিপ ট্রেন্ডস

২০

জামাকাপড়ের বাউন্ডারির বাইরে এই পুজোয় হোক ঠোঁটের সাজের সাতকাহন।





সৌন্দর্য ২

হেয়ার স্ক্রাবের হরেক কথা

৩৮

পুজোয় নিজেকে একধাপ এগিয়ে রাখতে আজই শুরু করুন হেয়ার স্ক্রাবের অভ্যেস।



সৌন্দর্য ৩



৭৪

রূপচর্চার বিবর্তনে ভারতবর্ষ

রূপচর্চা ও প্রসাধনে ফিরে দেখা প্রাচীন ভারতবর্ষ। সেই গল্প মুগ্ধ করবে আধুনিকাদেরও।



৯৮ সৌন্দর্য ৪

বিনুনি-বৃত্তান্ত

খেজুর বিনুনি থেকে শুরু করে ফিশটেল ব্রেড অথবা অ্যাকসেসরি হিসাবে ফুল বা গয়না— নানা বিনুনির কাহিনি।



ফ্যাশন ১ ৪

আশ্বিনে আনন্দ

মায়ের আগমনে সেজে ওঠে পরমা-প্রকৃতি। শারদ উৎসবের উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ রঙে 'আনন্দ' শাড়িতে সাজলেন টলি-অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার।



১২৮ রান্নাঘর ৪

দমদার দমপোখ্‌ত

দমের কেরামতিতে দমদার রান্না, সঙ্গে বহাল পুষ্টিগুণও। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও কম। পুজোর পাতে নতুন স্বাদ।

কলকাতার ফুচকার ইতিহাস

১২০ বেড়ানো ১
আটলান্টিকে তিমিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কাহিনি।

১৩৪ ফ্যাশন ৫
ফ্যাশনের কি সত্যিই কোনও রুলবুক হয়? আমরা তো মানতে নারাজ। তাই সাজিয়ে দিলাম এই ফ্যাশনফাইল।

১৪২ রান্নাঘর ৫
রকমারি ফ্রেঞ্চ ডেসার্টের সহজ পাঠ।

১৪৭ বিশেষ রচনা ৫
জন্মদিনের ১৫০ বছরে অতুলপ্রসাদ সেন।

১৫২ বিনোদন ৩
কী বলছে ভারতীয় সিনেমার হল-কালচার?

১৫৮ ফ্যাশন ৬
পুজোতে বৈচিত্রময় শাড়ির সাজ।

১৬৬ বেড়ানো ২
ভিসুভিয়াসের অমোঘ টানে।

১৭২ গল্প ২
ভৃগু বিন্দু
অধীর সিনহা

১৭৬ ফ্যাশন ৭
ডিজাইনার পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল ও এক্সক্লুসিভ কালেকশন।

১৮০ রান্নাঘর ৬
সময়ের সঙ্গে বাঙালি ভোগের বিবর্তনের নানা পরত।

প্রচ্ছদ: মধুমিতা সরকার
মেক-আপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
ফোন: ৯৭৩৪৮১৮৪৯০
হেয়ার স্টাইলিং: মৌসুমী ছেত্রী
ফোন: ৯৮৩০৫৫১০৪৪
স্টাইলিং: মাধব
ফোন: ৯৮৭৫৩৭৬৯৭৮
লোকেশন: দ্য ওবেরয় গ্র্যান্ড কলকাতা
ফোন: ০৩৩ ২২৪৯২৩২৩
ছবি: শিলাদিত্য দত্ত

শাড়ি: আনন্দ
কুইন্‌স ম্যানসন, ১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫, ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

15 September 2022, Bodhon 2022



মাল্টিকালার্ড ফ্লোরাল মোটিফের ডিজ়াইনে এক্সক্লুসিভ কটন জামদানি বেনারসি শাড়ি। ভারী গয়নার সহযোগে রাজকীয় সাজ।

আশ্বিনে আনন্দ

তিনি আধুনিকা। কিন্তু মনে-প্রাণে ভালবাসেন বাংলার সংস্কৃতি ও সনাতনী সাজ। তাই শারদ উৎসবে অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার সেজেছেন ‘আনন্দ’ সাজে। তাঁর এক্সক্লুসিভ ফোটো ক্যানভাস তুলে ধরলেন মৌমিতা সরকার।



গোলাপি আভার স্পেশ্যাল শিফন বেনারসি। শাড়ি জুড়ে হ্যান্ড পেন্টেড ব্রাশের স্ট্রোক দেয় শেডেড এফেক্ট। সঙ্গে রোজ় গোল্ড গয়নার সাজ।



লাল ইক্কত শাড়িতে
কালো পাড়। তবে
ট্র্যাডিশনাল শাড়ির
সঙ্গে মধুমিতার
পছন্দ কন্টেম্পোরারি
হোয়াইট গোল্ড
ও সিলভার
গয়নার সাজ।



উৎসবের সন্ধ্যায় মধুমিতার পছন্দ ব্রাইট পার্পল কাতান বেনারসি। শাড়ি জুড়ে জ়রি বুটি। পাড় ও আঁচলে গোল্ড ও সিলভার জ়রির ভরাট কাজ।

এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি

শাড়ি: আনন্দ
কুইন্‌স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫,
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

মেক-আপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
ফোন: ৯৭৩৪৮১৮৪৯০
হেয়ার স্টাইলিং: মৌসুমী ছেত্রী
ফোন: ৯৮৩০৫৫১০৪৪
স্টাইলিং: মাধব
ফোন: ৯৮৭৫৩৭৬৯৭৮
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
লোকেশন: দ্য ওবেরয় গ্র্যান্ড, কলকাতা
ফোন: ০৩৩ ২২৪৯ ২৩২৩
ছবি: শিলাদিত্য দত্ত
রূপায়ণে: অসীম হালদার



বাজল আনন্দ ধ্বনি...

শরতের আকাশ সেজেছে উৎসবের সাজে। দেবীর আগমনে চারিদিকে সুরেলা আবহ। এই উৎসবের মরসুমে সঙ্গীতশিল্পী মধুবন্তী বাগচী সাজলেন 'আনন্দ' শাড়ির সাজে।



(বাঁদিকের পাতা) প্যাস্টেল শেডের জিওমেট্রিক ডিজ়াইন করা ক্রিম কালার্ড কাতান বেনারসি। পাড় ও আঁচলে ভরাট জ়রির কাজ। সিলভার গয়নার সঙ্গে স্নিগ্ধ সাজ।

পুজোর সাজে লাল শাড়ি অবশ্যই চাই! লাল তসর বেনারসি শাড়ির জমিতে রেশম সুতোর ফ্লোরাল মোটিফ। পাড় ও আঁচলেও রেশম জ়রির নিখুঁত কারুকাজ।



অলওভার 'আনন্দ' সিগনেচার মাল্টিকালার্ড কলকা প্রিন্টের শাড়ি। প্রিন্টেড শাড়িতে চওড়া লাল পাড় ও আঁচল আনে অভিনবত্ব।



অন্ধ্রের তাঁতির হাতে বোনা লাইম গ্রিন খাদি কটন শাড়িতে কনট্রাস্টিং লাল সিল্ক বর্ডার। আঁচলে জ়রি ও মাল্টিকালার্ড সুতোয় ফুল ও পাতার মোটিফ।



পিঙ্ক শিফন
বেনারসি শাড়ি।
জমিতে জমকালো
মাল্টিকালার্ড
ফ্লোরাল মোটিফ।
পাড় ও আঁচলে
জ়রির কাজ দেয়
গ্ল্যামারাস লুক।



সরষে হলুদ ও
লালের কম্বিনেশনে
ট্র্যাডিশনাল ইক্কত
সিল্ক শাড়ি।
স্টাইলিং ও ড্রেপিংয়ে
বদলে ফেলতে
পারেন আপনার
স্টাইল স্টেটমেন্ট।

শাড়ি: আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫,
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ছবি: সোমনাথ রায়
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
সহযোগী: রাজীব দাস
স্টাইলিং: অয়ন হোড়
ফোন: ৯০০৭২২০৪৯৬
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়,
৮৬৯৭১১৩৩৬৭
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩৯৯০০

এই পত্রিকাটি সঙ্গে আনলে যে
কোনও একটি শাড়ির উপর পেয়ে
যাবেন ১০% ছাড়।

ভর্তার ভোজবাজি!



ভাত আর ভর্তার জুটি চিরন্তন। বাংলাদেশি আমিষ ভর্তার রেসিপি সাজালেন রন্ধনশিল্পী সেলিনা পরভিন নিভা। শোনালেন ভর্তা নিয়ে নানা গল্পও। স্বাদ নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

মলামাছের মাথা ভর্তা

ছুটির দুপুরে গরম ভাত আর সঙ্গে রকমারি ভর্তা— এর চেয়ে বড় স্বাদ-সুখ খুব কম রান্নায় আছে। ভাত আর ভর্তার এই মিলমিশ বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের চিরন্তন সত্য। যদিও ভর্তা বানানো এবং খাওয়ার চল বাঙালিদের মধ্যে ঠিক কবে থেকে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিশেষ করে শুঁটকি ভর্তা। তবে আগেকার দিনে মাছে-ভাতে বাঙালিদের শুঁটকি ভর্তা খাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কারণ মাছ শুকিয়ে শুঁটকি করা ছাড়া অন্য কোনওভাবে তা সংরক্ষণ করা যেত না। নানারকম সবজিও বাঙালি রান্নার অপরিহার্য অঙ্গ। ফলে ভর্তার তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই জুড়ে গিয়েছিল আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা ইত্যাদিও। নানা উপকরণের ভর্তা আর সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা— ব্যস, ভাতের পাতে আর কী চাই! পেট তো ভরবেই, মনও ভরবে। যদিও এক সময় ভর্তা ছিল নিম্ন আয়ের লোকজনদেরই খাবার। ঘরে যাঁদের বিশেষ কিছু উপকরণ থাকত না, তাঁরা যেটুকু যা আছে, তা-ই জলে বসিয়ে ভর্তা বানিয়ে নিতেন। সেই ভর্তা এখন বাঙালির খানাপিনার তালিকায় গৌরবের জায়গা নিয়েছে। শুধু ভাতের পাতেই নয়, শীতকালে বাংলাদেশের নানা পিঠের দোকানেও রকমারি বাহারি ভর্তার সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। নতুন বছরেও পান্তাভাত, ইলিশ আর ভর্তা ভালবেসে খান বাঙালিরা। তবে ভর্তার বৈচিত্র এত বিপুল, এত রকম উপকরণ দিয়ে তা করা যায় যে, বাঙালি বাড়িতে যে কোনওদিনই হতে পারে ভর্তা উৎসব। বানানোও ঝামেলার নয়। সামান্য কিছু জিনিস ঘরে থাকলেই হল। এবারের আলোচনার কেন্দ্র অবশ্য শুধুমাত্র আমিষ ভর্তাই। মাছ দিয়ে যে কত রকম ভর্তা হতে পারে, আগে জানতেন? রেস্তরাঁয় যে চিকেন ভর্তা, এগ ভর্তা খান, বাঙালি রান্নাঘরে যে মুরগি বা ডিম দিয়ে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ভর্তা বানানো হয়, তা-ও বা এর আগে কতজনের জানা ছিল? আর ভর্তা নিয়ে আলোচনা হলে শুঁটকি ভর্তা বাদ পড়ে কী করে? রইল সব কিছুরই রেসিপি।

মলামাছের মাথা ভর্তা

উপকরণ: মলা বা মৌরলামাছ ২০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৫টা, শুকনোলঙ্কা ৫টা, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, সর্ষের তেল ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ।

প্রণালী: মলামাছের মাথা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। নুন আর হলুদ দিয়ে মেখে নিন মাথাগুলো। এবার প্যান আঁচে বসান। সর্ষের তেল গরম করে, পেঁয়াজ, রসুন, শুকনোলঙ্কা আর কাঁচালঙ্কা দিন। হালকা বাদামি করে ভেজে নিন সবগুলো। মেখে রাখা মাছের মাথার সঙ্গে সব মশলা ভাল করে মিশিয়ে, অল্প আঁচে ভেজে নিন। নুন মেশান স্বাদমতো। হয়ে গেলে, নামিয়ে নিন। ঠান্ডা করে, শিল-পাটায় বেটে নিলেই মলা বা মৌরলামাছের মাথা ভর্তা তৈরি।

লাউপাতায় চিংড়ি ভর্তা

উপকরণ: চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১/৪ কাপ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৭-৮টা, সর্ষের তেল ৩ টেবলচামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, লাউপাতা ৮টা।

প্রণালী: লাউপাতা বেছে, ধুয়ে নিন। গরম জল এবং একটু নুন দিয়ে ভাপিয়ে নিন পাতাগুলো। অন্য দিকে চিংড়ির মাথা, লেজ আর খোসা ফেলে, পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। লাউপাতা বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। ১/২ কাপ জল দিয়ে, রান্না করুন মিশ্রণটা। জল শুকিয়ে এলে, নামিয়ে নিয়ে শিল-পাটায় বেটে নিন। এরপর মিশ্রণটাকে সমান আটটা ভাগে ভাগ করুন। একটা করে ভাগ নিয়ে, একটা লাউপাতার মাঝখানে রাখুন। লাউপাতাটা সবদিক থেকে পেঁচিয়ে, একটা পুঁটলির মতো তৈরি করুন। প্রতিটি লাউপাতা এভাবে পুঁটলির আকারে পাকিয়ে নিন। প্যান আঁচে বসিয়ে, অল্প সর্ষের তেল



লাউপাতায় চিংড়ি ভর্তা



কাচকিমাছ ভর্তা

এক সময় ভর্তা ছিল নিম্ন আয়ের লোকজনদেরই খাবার। ঘরে যাঁদের বিশেষ কিছু উপকরণ থাকত না, তাঁরা যেটুকু যা আছে, তা-ই জলে বসিয়ে ভর্তা বানিয়ে নিতেন।

গরম করুন। প্রতিটা পুঁটলি সর্ষের তেলে অল্প আঁচে ভেজে নিন। নামিয়ে, পরিবেশন করুন লাউপাতায় চিংড়ি ভর্তা।

কাচকিমাছ ভর্তা

উপকরণ: কাচকিমাছ ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, রসুনকুচি ২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৫টা, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, নুন পরিমাণ অনুযায়ী, সর্ষের তেল ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: কাচকিমাছ ভাল করে ধুয়ে, জল ঝরিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে অল্প সর্ষের তেল গরম করে নিন। মাছ, পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি আর কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে ভেজে নিন হালকা করে। ভাজা হয়ে গেলে, আঁচ থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। তারপর নুন আর ধনেপাতা দিয়ে শিল-পাটায় বেটে কাচকিমাছের ভর্তা বানিয়ে নিন। ভাতের পাতে দারুণ লাগবে এই ভর্তা।

ইলিশের লেজ ভর্তা

উপকরণ: ইলিশমাছের লেজ বা ল্যাজা ৫টা, হলুদগুঁড়ো $^1/_2$ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো $^1/_2$ চা-চামচ, ভাজা শুকনোলঙ্কা ১০টা, সর্ষের তেল ৩ টেবলচামচ, পেঁয়াজকুচি $^1/_2$ কাপ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী।



প্রণালী: ইলিশের ল্যাজাগুলো ভাল করে ধুয়ে, জল ঝরিয়ে নিন। ল্যাজাগুলোয় সামান্য নুন, হলুদগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে নিন তারপর। প্যানে পরিমাণমতো সর্ষের তেল গরম করে, মাছগুলো ভেজে নিন। মাছের কাঁটা বেছে নিন সাবধানে। একই তেলে শুকনোলঙ্কা ভেজে নিন মচমচে করে। ঠান্ডা করে নিন তারপর। লঙ্কা ঠান্ডা হলে, পেঁয়াজ এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে মেখে নিন। মিশ্রণটা গুঁড়ো করে নিন তারপর। এর সঙ্গে মেশান কাঁটা বেছে রাখা ইলিশমাছের ল্যাজা। একে একে ধনেপাতাকুচি, স্বাদমতো নুন এবং পরিমাণমতো সর্ষের তেল দিন মাছের মিশ্রণে। সবটা একসঙ্গে ভাল করে মেখে নিলেই ইলিশের ল্যাজা বা লেজ ভর্তা তৈরি। গরম

ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন, ছুটির দুপুর জমে যাবেই।

লইট্টা শুঁটকি ভর্তা

উপকরণ: লইট্টা শুঁটকি ২০০ গ্রাম, শুকনোলঙ্কা ২টো, কাঁচালঙ্কা ৫-৬টা, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, রসুনকুচি ৪ টেবলচামচ, সর্ষের তেল ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: লইট্টা শুঁটকি পরিষ্কার করে, ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ভাল করে ধুয়ে, ১৫ মিনিট গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। আঁচে প্যান বসিয়ে, সর্ষের তেল গরম করে নিন। শুঁটকির টুকরোগুলো দিয়ে, হালকা বাদামি করে ভাজুন। তারপর আঁচ থেকে নামিয়ে, কাঁটা বেছে নিন শুঁটকির। অন্য দিকে, শুকনো লঙ্কা ভেজে, নামিয়ে নিন। একই প্যানে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে, হালকা করে ভেজে নিন। এবার একে একে ভেজে রাখা প্রতিটি উপকরণ ভাল করে মেখে নিন। শুঁটকি একদম ভেঙে ফেলবেন না, খাওয়ার সময় যেন মুখে পড়ে। ধনেপাতার কুচি দিয়ে মেখে, সাজিয়ে পরিবেশন করুন।



ইলিশের লেজ ভর্তা

ডিম ভর্তা

উপকরণ: ডিম ২টো, শুকনোলঙ্কা ৪টে, পেঁয়াজকুচি ১/৪ কাপ, সর্ষের তেল ২ টেবলচামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালী: ডিম সেদ্ধ করে নিন। কড়াই আঁচে বসিয়ে সামান্য সর্ষের তেল গরম করে নিন। গরম তেলে শুকনোলঙ্কা ভেজে নিন মচমচে করে। ভাজা শুকনোলঙ্কা, পেঁয়াজকুচি এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান পরিমাণমতো সর্ষের তেল এবং কুচনো ধনেপাতা। সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে, ডিম চটকে নিন। লঙ্কা, পেঁয়াজ এবং ধনেপাতার মিশ্রণটা ডিমে ভাল করে মিশিয়ে, একসঙ্গে মেখে নিতে হবে। ডিম ভর্তা তৈরি। গরম গরম ভাতের পাতে খেয়ে দেখুন! রুটি বা পরোটার সঙ্গেও ভাল লাগবে।



কুমড়ো বড়িতে রুইমাছের ভর্তা

উপকরণ: রুইমাছ ৪ টুকরো, কুমড়ো বড়ি



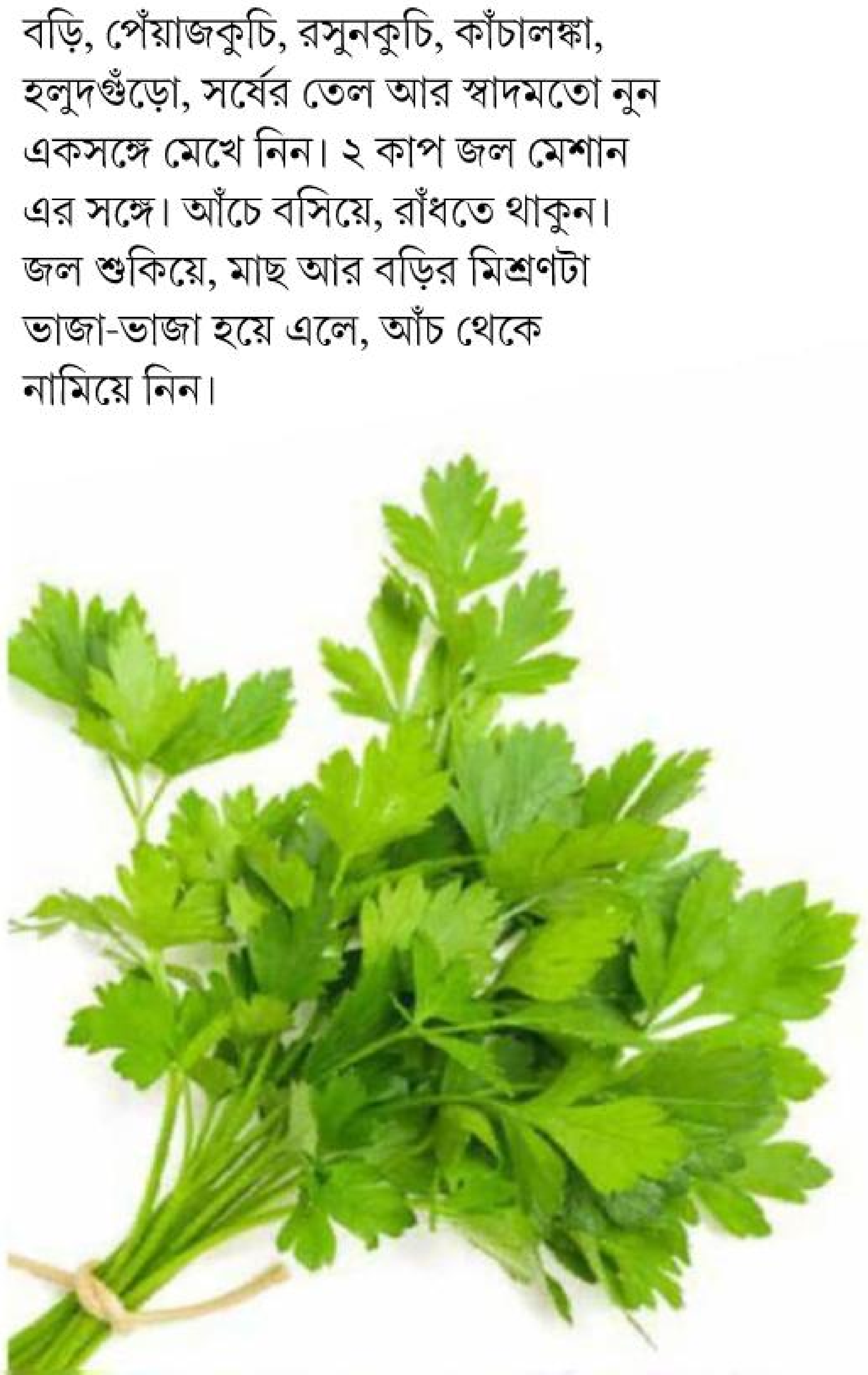
ডিম ভর্তা



কুমড়ো বড়িতে রুইমাছের ভর্তা

৮টা, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৮টা, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, সর্ষের তেল ৩ টেবলচামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালী: কড়াই আঁচে বসান, তেল দেবেন না। কুমড়ো বড়ি শুকনো কড়াইয়ে ভেজে নিন। তারপর রুইমাছ, কুমড়ো বড়ি, পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি, কাঁচালঙ্কা, হলুদগুঁড়ো, সর্ষের তেল আর স্বাদমতো নুন একসঙ্গে মেখে নিন। ২ কাপ জল মেশান এর সঙ্গে। আঁচে বসিয়ে, রাঁধতে থাকুন। জল শুকিয়ে, মাছ আর বড়ির মিশ্রণটা ভাজা-ভাজা হয়ে এলে, আঁচ থেকে নামিয়ে নিন।



ঠান্ডা করে নিয়ে, শিল-পাটায় বেটে ফেললেই ভর্তা তৈরি।

মুরগি ভর্তা

উপকরণ: মুরগির বুকের মাংস ২ টুকরো, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৬-৭টা (কুচনো), সাদা তেল ১ টেবলচামচ, সর্ষের তেল ১ টেবলচামচ, শসাকুচি ১/২ কাপ, টোম্যাটোকুচি ১/২ কাপ, সেদ্ধ মটরশুঁটি ১ টেবলচামচ (সাজানোর জন্য)।

প্রণালী: মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। তারপর আদাবাটা, রসুনবাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো এবং স্বাদমতো নুন দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। প্যানে সাদা তেল গরম করে, মাংসের টুকরোগুলো ভেজে

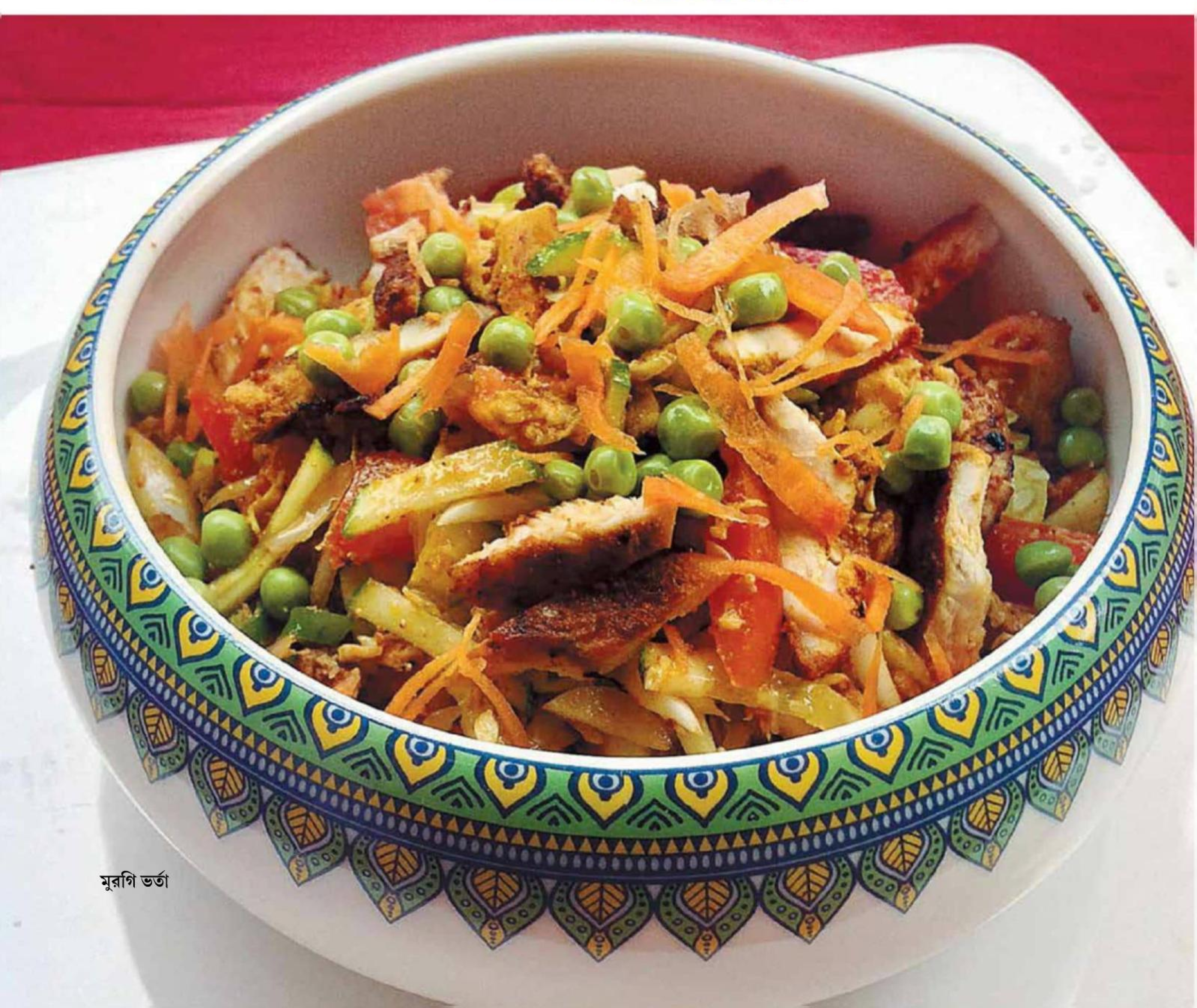


নিন। নামিয়ে, ঠান্ডা করে নিন। এরপর পেঁয়াজকুচি, শসাকুচি, টোম্যাটোকুচি, সর্ষের তেল এবং নুন একে একে দিন ভেজে রাখা মাংসের টুকরোয়। সবটা মিশিয়ে সেদ্ধ মটরশুঁটি দিয়ে সাজিয়ে নিন। এই ভর্তা রুটি, পরোটা বা ভাত, যে কোনও কিছুর সঙ্গেই খেতে ভাল লাগবে।

আর কী! ছুটির দুপুরে পাতের চারদিকে রকমারি ভর্তার বাটি সাজিয়ে বসে পড়ুন। গরম ভাতের সঙ্গে ভর্তা মুখে ফেললে আরামে চোখ বুজে আসবেই, কথা দিলাম।

যোগাযোগ: ০১৭১৬০৩৯৬২৫

ছবি: শাফে হায়াত খান



মুরগি ভর্তা



Dual Tone

উপরের ঠোঁটে ম্যাট গেরুয়া। বৈপরীত্য রেখে নীচের ঠোঁটে ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাজেন্টা পিঙ্ক।

লেটেস্ট লিপ ট্রেন্ডস

একঘেয়ে লিপ মেক-আপের দিন শেষ! উৎসবের সাজে ওষ্ঠ-আবেদন বাড়াতে চোখ রাখুন এই সময়ের লিপস্টিক চার্টবাস্টারে। অভিনব লিপস্টিক লুকবুক তৈরি করলেন সায়নী দাশশর্মা।



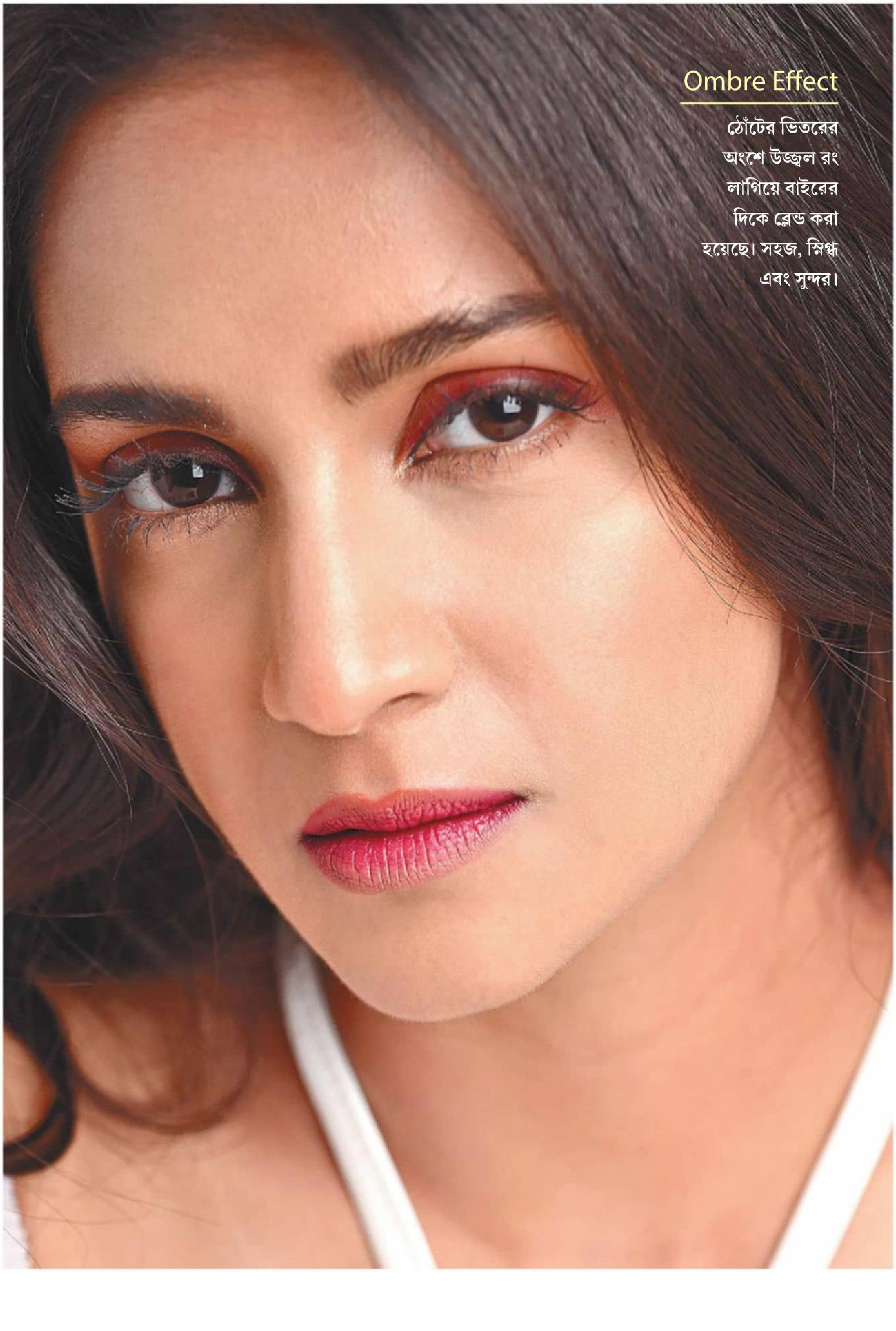
Linear Magic

ঠোঁটের আউটলাইন বরাবর শুধু সরু লাইনারের রেখা। স্টেটমেন্ট তৈরি করার এর চেয়ে সহজ উপায় আর কিছু হয় কি?



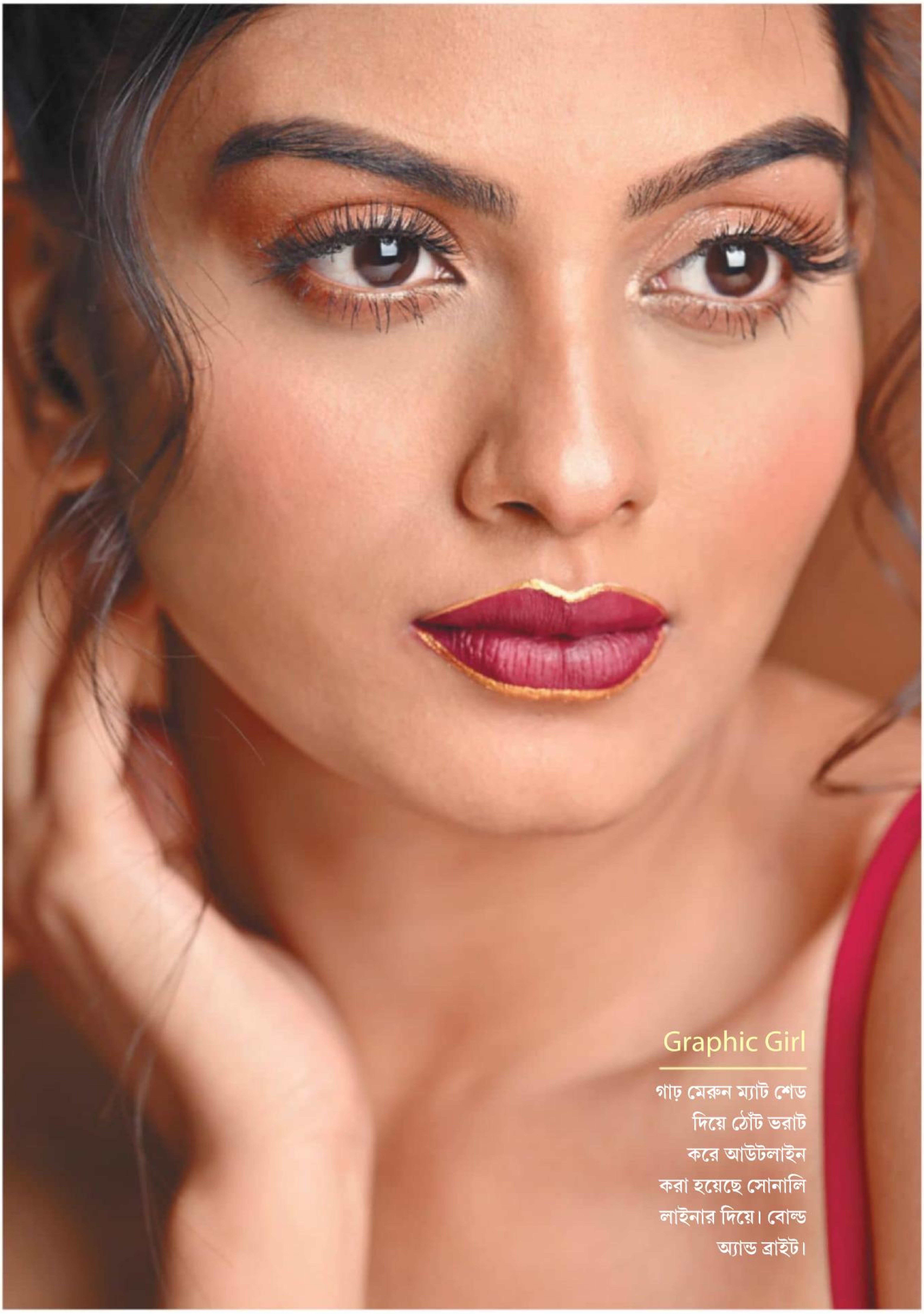
Glitter Glam

সাহসী হতে আপত্তি না থাকলে গ্লিটারের ছোঁয়া রাখতেই পারেন ঠোঁটের ক্যানভাসে। যে কোনও অনুষ্ঠানেই মধ্যমণি অপনি!



Ombre Effect

ঠোঁটের ভিতরের অংশে উজ্জ্বল রং লাগিয়ে বাইরের দিকে ব্লেন্ড করা হয়েছে। সহজ, স্নিগ্ধ এবং সুন্দর।



Graphic Girl

গাঢ় মেরুন ম্যাট শেড দিয়ে ঠোঁট ভরাট করে আউটলাইন করা হয়েছে সোনালি লাইনার দিয়ে। বোল্ড অ্যান্ড ব্রাইট।



Shimmer & Shine

ফ্রেশ পিঙ্ক লিপস্টিকের উপর সিলভার শিমার লিপগ্লসের পরত। মিনিম্যালিস্ট মেক-আপপ্রেমীদের পারফেক্ট পার্টিলুক।



Gloss Game

ম্যাট লিপস্টিকের ভিড়ে ফের নজর কাড়ছে গ্লস। দিনের সাজে বা ডিউয়ি মেক-আপ লুকের সঙ্গে পারফেক্ট।



Dark Desires

গাঢ় শেডস নতুন নয় ঠিকই, তবে এখন আনইউজ্যুয়াল ডার্ক শেডের পাল্লা ভারী হচ্ছে ধীরে ধীরে। রাতের অনুষ্ঠানে অনন্য আবেদন তৈরি করার জন্য আদর্শ।

মডেল: অনন্যা, শ্রীময়ী
মেক-আপ: কাজু গুহ
ফোন: ৮০১৭৯৪২৬৫১
হেয়ার: আম্রপালি
ফোন: ৯০৭৩৮০৮০৬০
পোশাক: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
ছবি: সোমনাথ রায়



ড্রামিংয়ের তালে এক্সারসাইজ়

ব্যায়াম বিষয়টা অনেকের কাছেই বড় একঘেয়ে। অথচ ফিটনেস সবসময় জরুরি। শরীরচর্চা হওয়া উচিত মনের আনন্দ মেনেই। আর সেই নতুন উপায়ের নাম পাউন্ড ওয়র্কআউট। সবিস্তারে জানাচ্ছেন সার্টিফায়েড পাউন্ড ইন্সটাকট্রার এবং ভারতের পাউন্ড ওয়র্কআউট অ্যামবাসাডার নিধি গর্গ। লিখছেন পৃথা বসু।

প্রতিদিনের বেঁচে থাকা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত এমন এক চাপ বা স্ট্রেসের আবহ তৈরি করছে, যেখানে উপলব্ধি করার ক্ষমতা ক্রমশ লোপ যাচ্ছে। আমরা যতটা চিন্তা করতে পারছি বলে মনে করছি, সেটুকু ওই আবহের কাঁচামাল সরবরাহেই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এহেন ‘স্ট্রেসফুল লাইফ’ থেকে যখন দু’ দণ্ডের শান্তি পায়, মানুষ তখন তা আঁকড়ে ধরে বরাবর। এই ভাল থাকা স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ স্বাস্থ্য বিগড়োলে অসুখী হতে কতক্ষণ? স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সবথেকে উপযোগী হল শরীরচর্চা, বিশেষ করে কোভিড-পরবর্তী সময়ে। বিজ্ঞান বলে, ভাল কোনও কিছু অনুভব করলে, আমাদের দেহে এন্ডরফিন হরমোন নিঃসৃত হয়। যেটাকে বলে ‘হ্যাপি হরমোন’। ব্যায়ামের সময় শারীরিক পেশি সঞ্চালিত হওয়ায়





পাউন্ড ওয়র্কআউটের ক্লাসে

মনেও আনন্দের সঞ্চার হয়। ফলে তখনও এই হরমোন নিঃসৃত হয়। কিন্তু রোজকার ব্যায়ামে অনেকেরই অনীহা। মনের খুশিই যদি বাদ পড়ল, তবে তো ব্যায়ামের আসল উদ্দেশ্যই বৃথা! তাই সংখ্যা গুনে শরীরচর্চা নয়, এক্সারসাইজ় এবার হোক ড্রামিংয়ের তালে, মিউজ়িকের মোহময়তায়। এই অভিনবত্বের নাম 'পাউন্ড ওয়র্কআউট'। সংখ্যা আর একঘেয়েমির হিসেব-নিকেশ তোলা থাক দিনের আসল স্ট্রেসের খাতায়। বেঁচে যাওয়া জরুরি অবসরে খুশিটুকু থাক।

পাউন্ড ওয়র্কআউট কী?

পাউন্ড ওয়র্কআউটের জন্ম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কার্স্টেন পোটেনজ়া (সি.ই.ও, পাউন্ড ওয়র্কআউট হেডকোয়ার্টার) এবং ক্রিস্টিনা পিরেনবুম ২০১১-২০১২ সাল নাগাদ এই নতুন ধরনের ওয়র্কআউটটি নির্মাণ করেন। এঁরা দুজনেই যুক্ত ছিলেন ড্রামিংয়ের সঙ্গে। তাই ড্রামিংয়ের তালে তালে রোজকার একঘেয়ে ওয়র্কআউটে তারা এনেছিলেন নতুনত্ব। এটি আসলে ড্রামিং দ্বারা অনুপ্রাণিত একধরনের ফুলবডি কার্ডিয়ো। নিধি বলছেন, এই ওয়র্কআউটে ৪৫ মিনিটে বার্ন হয় প্রায় ৮০০-১০০০ ক্যালরি। একদিকে যেমন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, অন্যদিকে তেমনই মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে দুর্দান্ত এনার্জেটিক এই পাউন্ড ওয়র্কআউট। এরোবিক্স ও পাউন্ড ওয়র্কআউট, দুইই রিদমিক কার্ডিয়ো সেশন। এরোবিক্স হল 'বিটস বেসড ক্লাস'। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিট কাউন্ট করে করে এক্সারসাইজ়টি করা হয়। কিন্তু পাউন্ড ওয়র্কআউটে সেটি হয় না। সেখানেই এই ওয়র্কআউটটির স্বাতন্ত্র্য। এটি নিমেষে বিট কাউন্টিং থেকে আপনার ফোকাসকে মিউজ়িক ট্র্যাকের তাল, লয় ও ভলিউমে সরিয়ে আনে।

টাইম স্প্যান

এই ওয়র্কআউটের টাইমস্প্যান সম্বন্ধে নিধি গর্গ জানাচ্ছেন, "যারা একেবারে প্রথম শুরু করছেন, অর্থাৎ বিগিনার্স, তাদের জন্য বরাদ্দ ১৫ মিনিট। যারা মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছেন, তাদের জন্য ৩০ মিনিট এবং অ্যাডভান্সডদের জন্য ৪৫ মিনিট।" নিধির মতে, সপ্তাহে তিনদিন, এই ওয়র্কআউটের পক্ষে যথেষ্ট। এটিতে আমাদের শরীরের প্রধান মাস্‌লগুলির একটা বিশেষ অংশগ্রহণ থাকে। নিয়মিতভাবে এই ওয়র্কআউট করে গেলে, আমাদের শরীর (বিশেষ করে শরীরের নিম্নাংশ) দারুণভাবে টোন্ড হয়ে উঠবে। স্ট্যামিনা বাড়াতেও কার্যকরী এই ওয়র্কআউট।

স্টেপ্‌স

পাউন্ড ওয়র্কআউটের সাধারণ চারটি স্টেপ্‌স হল—

১) সেট: এক্ষেত্রে শিরদাঁড়া সোজা রেখে দাঁড়াতে হয়। পা দুটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে, হাঁটু দুটি ভাঁজ করে চতুর্ভুজ আকৃতি তৈরি করে নানা ধরনের স্কোয়াট করা হয়।

২) লাঞ্জ: 'লাঞ্জ'-এ ব্যক্তি সোজা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় প্রথমে এক পায়ের হাঁটু সামনে এনে মাটিতে ঠেকান। তারপর ফিরে যান আগের অবস্থানে। আবার অপর পায়ের হাঁটু সামনে এনে অনুরূপ কাজটি করেন।

৩) কিট: এটি মূলত মৌলিক একটি সিটেড পজ়িশন। মেরুদণ্ড সোজা করে, দুটি পা সামনে টান করে বসতে হয়। এবার নানা রকম টুইস্ট জাতীয় এক্সারসাইজ় করা হয়।

৪) টি অ্যান্ড এ: থাই এবং অ্যাসেটের আদ্যাক্ষর নিয়েই 'টি অ্যান্ড এ'। চিত হয়ে শুয়ে, গোড়ালি ও হিপের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখতে হয়। হাত দুটি সোজা হয়ে শরীরের পাশে থাকে। এই অবস্থায় কোমরটি উপরে তুলে কিছুক্ষণ ধরে রেখে নামিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেকটি স্টেপেই হাতে থাকে রিপস্টিকস।

রিপস্টিকস

পাউন্ড ওয়র্কআউটের অপরিহার্য অঙ্গ হল রিপস্টিকস। এটি বিশেষভবে পাউন্ড ওয়র্কআউটের জন্যই ডিজ়াইন করা হয়। ওজনে এটি খুবই হালকা। মাত্র $^{১}/_{৪}$ পাউন্ড অর্থাৎ ০.১১৩ কেজি। ড্রামস্টিকসের মতো দেখতে হলেও, এর দৈর্ঘ্য খানিকটা কম, ওজন তো বটেই। যখন রিপস্টিকস দিয়ে হিট করা হয়, তখন যে শব্দ তৈরি হয়, সেটিকে নিধি বলেছেন, 'স্পিকিং ফ্রম আ ফিজ়িওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ'। শব্দের তীব্রতা নির্ধারণ করে দেয় আপনার শরীরের বর্তমান অবস্থা। আগের চেয়ে কতটা উন্নতি বা অবনতি হল, শব্দ শুনে ধারণা করতে পারবেন নিজেই।"

মিউজ়িক প্রসঙ্গ

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মিউজ়িক প্রভাব অপরিসীম। স্মৃতি বা ধৈর্যশক্তির বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ক্লান্তি-বিষণ্ণতা দূর করা, সঙ্গীতের ভূমিকা সর্বত্র। ২০০৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কোনও ব্যক্তি ট্রেডমিলে দৌড়নোর সময় যদি দ্রুতলয়ের এবং উঁচু স্বরের কোনও মিউজ়িক শোনেন, তাহলে তাঁর গতি বৃদ্ধি পায়। যার অবশ্যম্ভাবী ফল—একই সময়ের ব্যাপ্তিতে আগের চেয়ে অধিক ক্যালরি বার্ন। মিউজ়িকের এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছে পাউন্ড ওয়র্কআউট। সহজে অনুসরণযোগ্য ও হাই-এনার্জির নানা জঁরের সঙ্গীত এই ওয়র্কআউটে ব্যবহৃত হয়। তবে নিধির কথায়, যে কোনও মিউজ়িক ট্র্যাকের সঙ্গে পাউন্ড ওয়র্কআউট করা যায় না। কী মিউজ়িক ব্যবহৃত হতে পারে, সেটি পাউন্ড সদর দপ্তর নির্ধারণ করে। প্রথমে নির্দিষ্ট মিউজ়িকটি বেছে 'শিট মিউজ়িক' তৈরি করা হয়। তারপর সেই মিউজ়িকের উপর কোরিয়োগ্রাফি করা হয়। প্রত্যেক মাসে তিনটি কোরিয়োগ্রাফি তারা পাঠান, যার ভিত্তিতে এখানকার এক্সপার্টরা শিখিয়ে থাকেন।

ওয়র্কআউটের খুঁটিনাটি

নিধি জানাচ্ছেন, "অনেক মানুষের ধারণা পাউন্ড ওয়র্কআউট তরুণ প্রজন্মের জন্যই, যা ঠিক নয়। যে কোনও বয়সের নারী-পুরুষ এতে অংশ নিতে পারেন। তবে যদি কারওর কোনও শারীরিক অসুস্থতা থাকে, বিশেষত যাঁদের হৃদরোগ আছে, তাঁদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই এই ওয়র্কআউট করা উচিত।" কারণ নিধির মতে, এই ওয়র্কআউটে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক পজ়িশন। তা না হলে, হাঁটু, কোমর বা পিঠে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই নিধি বলছেন, বিগিনারদের অতি অবশ্যই ওয়র্কআউট শুরু করার আগে ইন্ট্রোডাকশন সেশন করা জরুরি। মেনস্ট্রুয়েশনের সময়ও এই ওয়র্কআউট করা যেতে পারে, যদি না কারওর ব্যাকপেন বা হেভি ফ্লো কিংবা মেনস্ট্রুয়াল ক্র্যাম্পের সমস্যা থাকে। এই ওয়র্কআউটটির জন্য প্রয়োজন হয় না কোনও বিশেষ ডায়েটেরও। "তবে ওয়র্কআউট শুরুর আগে যদি কিছু প্রি-ওয়র্কআউট স্ন্যাক্স খাওয়া যায়, তাহলে বেটার পারফরম্যান্স হতে পারে"—এমনটাই মনে করেন নিধি।



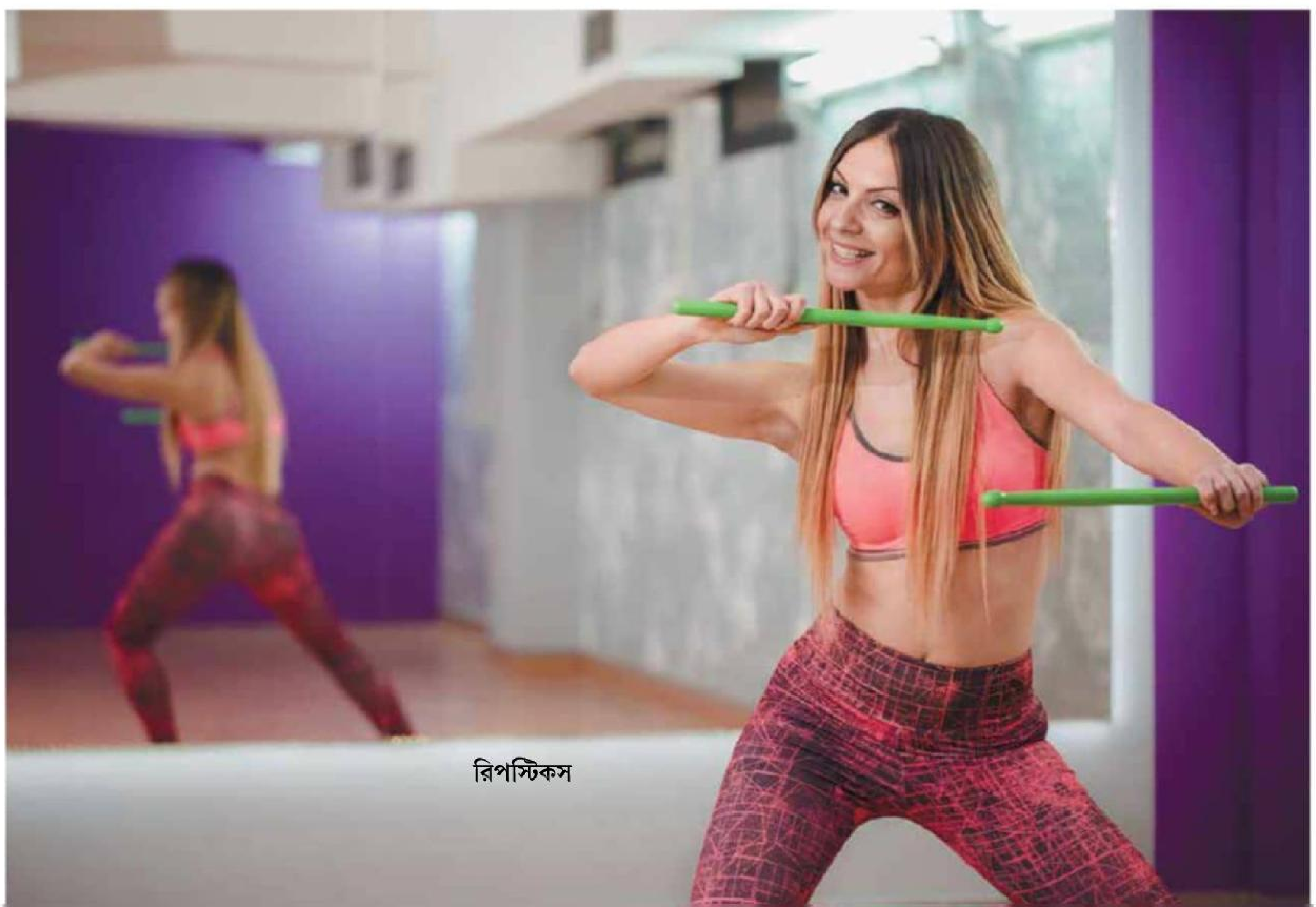
নিধি গর্গ

এদেশে পাউন্ড ওয়র্কআউট

এই ওয়র্কআউটের সঙ্গে ভারত পরিচিত হয় ২০১৭ সালে। কিন্তু পাঁচ বছরে তেমন জনপ্রিয় হয়নি। কারণ হিসেবে নিধি বলছেন, "এদেশে সার্টিফায়েড পাউন্ড ইন্সটাকট্রারের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব কমজনই অ্যাক্টিভ। রিপস্টিকসও সহজলভ্য নয়। যা পাওয়া যায় তার দাম আকাশছোঁয়া"। যদিও অনেক পাউন্ড এক্সপার্টরা উদ্যোগ নিয়ে ওয়র্কআউটটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। নিধি নিজেও অনলাইন-অফলাইন ক্লাস করানোর মাধ্যমে এ ব্যাপারে ভূমিকা নিয়েছেন।

ঘরে থেকেও এই ওয়র্কআউট সম্ভব। নিধির মতে, প্রয়োজন খোলামেলা জায়গা। রিপস্টিকস না পাওয়া গেলে, তার পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন ডান্ডিয়ার লাঠি বা বড় বড় দুটি কাঠের চামচ কিংবা কাঠের দুটি বড় স্কেল। তবে সার্টিফায়েড ইন্সটাকট্রার ছাড়া এটি সম্ভব নয়।" ভারতে পাউন্ড ওয়র্কআউট এক্সপার্টের সংখ্যা কম। তবে একেবারে বিরল নয়। নিধির মতো অনলাইন ক্লাসও করান অনেকেই। সামান্য সন্ধানেই এক দারুণ অভিজ্ঞতা হতে পারে আপনার। ব্যস্ততার ভিড় থেকে প্রতিদিন ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা রাখুন ব্যায়ামের জন্য। যা গোটা দিনের ৪ শতাংশ মাত্র। শরীর ফিট থাকলে, ভাল থাকবে মনও। সেই ভাল থাকারই নতুন হদিশ হয়ে উঠতে পারে 'পাউন্ড ওয়র্কআউট'।

ছবি: আইস্টক ও ট্রেনার



রিপস্টিকস



অলঙ্করণ: রৌদ্র মিত্র

ইয়া দেবী সর্বভুতেষু

মহালয়ার পবিত্র ভোরে উৎসবমুখরিত হয়ে ওঠে বাংলা সহ সমগ্র ভারত। ভারতের জনজাতির মতোই বৈচিত্রময় এ দেশের উৎসবের মেজাজ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বৈচিত্রময় দেবীআবাহনের খোঁজ দিলেন দেবলীনা অধিকারী।



'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর;/ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;/ প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোর্তিময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।/ আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাবমাধুরীর সঞ্জীবন।'
কৃষ্ণপক্ষের অন্তিম দিনে গঙ্গাঘাটে উদিত সূর্যকে সাক্ষী রেখে পিতৃপুরুষের জন্য নিবেদিত অর্ঘ্যের প্রতিটা পতনোন্মুখ জলবিন্দু এক পবিত্র ভোরের সৃষ্টি করে। শরতের স্নিগ্ধতম ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের এই মন্ত্রোচ্চারণ শহর, শহরতলি ও গ্রামবাংলার আকাশে বাতাসে, ঠাকুরদালানে, পাড়ার বারোয়ারি আড্ডায়, স্কুল-কলেজে, কর্মক্ষেত্রে প্রবাহিত করে পুজোর আমেজ। শরতের নীল আকাশ, তিরতির হাওয়ায় মাথা দোলানো কাশফুলের বনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা সেজে ওঠে আলোয় আলোয়, নতুন পোশাকে, দৈনন্দিন জীবনের রুটিন-ভাঙা ঝলমলে হাসিমুখে। তবে এই আমেজ কেবল বাংলার সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, আকাশে ভেসে বেড়ানো পেঁজা মেঘের সঙ্গে এই আমেজের বিস্তার ঘটে আসমুদ্রহিমাচলে। উত্তরে হিমাচল প্রদেশ থেকে দক্ষিণের তামিলনাড়ু, পশ্চিমে গুজরাত থেকে পূর্বে অসম— সমগ্র ভারতের মানচিত্রখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উৎসবের আলোকে। ঝলমলে ভারতের বুকে এই সময় তৈরি হয় এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবেশ, যেখানে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র হাত-ধরাধরি করে হাঁটে। বাঙালি যখন মেতে ওঠে ঘরের মেয়ে উমার আগমনী বার্তায়, ঠিক তখনই ভারতের অন্যপ্রান্ত নিবেদিত আদিশক্তির আরাধনায়। এই আরাধনাও পৃথক তার আবেদনে, প্রকারে, আচারে, ঐতিহ্যে ও বিশ্বাসে। উত্তর ভারত মজে রাবণদহনে, দক্ষিণ ভারত আদ্যাশক্তির আরাধনা করে বোম্বাই কলু রীতিতে, বিদ্যারম্ভ ,আয়ুধ পুজোর মাধ্যমে। পশ্চিমে দেবীর আবাহন হয় গরবার মাধ্যমে। এই বৈচিত্র মিলেমিশে গড়ে উঠছে বিরাট এক আধ্যাত্মিক ভূখন্ড। শরতের নীল আকাশের নিচে উৎসবের এই বৈচিত্রে প্রকাশিত হয় দেশের আত্মা— 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'।

তব অচিন্ত্য রূপচরিত মহিমা

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত প্রত্ন-উপাদান থেকে অনুমান করা যায়, ভারতে মাতৃপূজার প্রচলন প্রাক আর্যযুগে ব্যাপকভাবে ছিল। কেবল সিন্ধু উপত্যকায় নয়, কৃষ্ণসাগরের তীরে, দানিয়ুব উপত্যকাতেও মাতৃপূজা হত। অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে অনার্য ভারতে মাতৃদেবীর আরাধনাই হিন্দুদের শক্তি আরাধনার মুল উৎস। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এই শক্তি বা মাতৃকা আরাধনা প্রচলিত সেই প্রস্তর যুগ থেকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভগবতীপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীকস্বরূপ এই আদিশক্তিই সৃষ্টি করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে। ঋগ্বেদের সূক্ত মন্ডলের দশম সুক্তে জগদীশ্বর রূপে আদিশক্তির উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদের দুর্গা-গায়ত্রীতে দুর্গা বা দুর্গির নাম প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও দুর্গার উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে দুটি দুর্গাস্তোত্রে ও হরিবংশে দুর্গার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। মহাভারতে তাঁকে বাসুদেবের ভগিনী ও নন্দগোপকুলোদ্ভাবা বলা হয়েছে। দুর্গাকে লক্ষ্মী, বলদেবের ভগিনী, নন্দগোপসূতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে হরিবংশের আর্যাস্তবে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে তিনি যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া, যাঁর প্রেরণায় বিষ্ণু বধ করেছিলেন মধু ও কৈটভকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম



কুল্লু দসেরা

মহিষাসুরমর্দিনীরূপী দুর্গার বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণে আছে মহিষাসুরের অত্যাচারে পীড়িত দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নিকট প্রার্থনা করলে তাঁদের মুখ থেকে এক ক্রোধজনিত তেজোরাশির জন্ম হয়। এই তেজোরাশি ও অন্যান্য দেবতাদের দেহনির্গত তেজোরাশির সম্মিলনে জন্ম হয়েছিল অসুরহন্তা মহাদেবীর। রাজস্থানে দুর্গার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। গুপ্তযুগ থেকে দুর্গার এই মহিষমর্দিনী রূপটি প্রচলিত হতে থাকে। এই সময়েই ভীলসার কাছে উদয়গিরি গুহামন্দিরে এই দশভুজা দেবীর উল্লেখ আছে। রাজস্থানে গঙ্গানগরের ভদ্রকালী প্রাপ্ত দুর্গা চর্তুভুজা, মহিষের পৃষ্ঠে আরোহিত হয়ে তাকে বধ করছেন। অম্বরের মূর্তির দুই হাতে ঢাল ও বজ্র, নীচের হাতে ছিল আকর্ষণরত মহিষের জিহ্বা। কুম্ভকোনমের নাগেশ্বর স্বামী মন্দিরের দুর্গামূর্তি চতুর্ভুজা। দক্ষিণ ভারতে কোনও কোনও দুর্গামূর্তির সঙ্গে মৃগের সম্পর্ক বিদ্যমান। রাজস্থানের উদয়পুরের দুর্গামূর্তি বিবাসনা ও তারা নামে পরিচিত। বাংলার দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী হয়েও ঘরের মেয়ে, চার সন্তানকে নিয়ে যেন বিরাট এক পরিবার। ভারতের আধ্যাত্মবাদও পৃথক হয়ে যায় অঞ্চলভেদে। আদ্যাশক্তির বৈচিত্রের সঙ্গে পৃথক রীতি দেখা যায় দেবীর আবাহনেও। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম পৃথক হয়ে যায় উৎসবের উদযাপনে, আনন্দের বহিঃপ্রকাশে।



পাথরের দেবীদুর্গার মূর্তি

বিচিত্ররূপেণ সংস্থিতা

'প্রণমি বরদা, অজরা অতুলা/ বহুবলধারিণী... জাগো মা, / শরন্ময়ী, চণ্ডিকা, শঙ্করী জাগো'... যে গান পুজোর বার্তা বয়ে আনে, তাতেই দুর্গার বিচিত্ররূপের বর্ণনা আছে। রাজা সুরথ ও রাম শরৎ ও বসন্তকালে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। ১৬০৬ সালে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার নদিয়ায় যে পুজোর প্রচলন করেন, সম্প্রতি তা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি প্রাপ্ত। বাংলার বাইরে সারা ভারতে এই সময় যে দেবী আরাধনা হয়, তা নবরাত্রি রূপে পরিচিত। এই উৎসবেও ধর্মীয় আচারকে মান্যতা দিয়ে নবদুর্গার আবাহন করা হয়। নবরাত্রিতে পার্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহারাত্রি, সিদ্ধিকা—এই ন'টা রূপে সারা ভারতে মা দুর্গা পূজিত হন। অঞ্চলভেদে পার্থক্য ঘটে যায় মাতৃআবাহনে। উৎসবমুখর নবরাত্রির আচারের পার্থক্য খুঁজলেই পাওয়া যাবে ভারতের দেবী আবাহনের বৈচিত্র।

● হিমাচল প্রদেশের কুল্লু দসেরা

'দসেরা' শব্দটির মূলগত উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'দশোহারা' থেকে, যার অর্থ দশম দিন। দশেরা নবরাত্রির অন্তিম দিনে অনুষ্ঠিত সবার্পেক্ষা বর্ণময় উদযাপন। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো নবরাত্রি অনুষ্ঠিত হলেও দসেরা উৎসব বেশ খানিকটা অন্য



কুল্লু দসেরার দেবীমূর্তি

রকমভাবে পালিত হয় এখানে। নয়দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে আদ্যাশক্তির আরাধনা, উপোস করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে মনে করা হয় এই দিন রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। সেই উপলক্ষে কুলু ভ্যালিতে এক বিরাট সমারোহ হয়। দেবীর শক্তিতে যুদ্ধ জিতেছিলেন শ্রীরাম। তাই এইদিন কুলুর প্রধান প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দেবতা ও দেবী দুর্গার এক বিশাল শোভাযাত্রা হয়ে থাকে। দর্শনার্থীদের সামনে নৃত্য-গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুলুর আঞ্চলিক সংস্কৃতির ঝলক পরিবেশিত হয়। কুলু প্রদেশে নদীর ধারে অভিনীত 'লঙ্কাদহন' পালাটির সাক্ষী থাকা, ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এভাবেই উদযাপিত হয় কুল্লু প্রদেশের ভিন্ন দসেরা।

● উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের দেবী আরাধনা

এখানে নবরাত্রির সঙ্গে মিশে থাকে রাম-রাবণের যুদ্ধ, রামলীলা, তুলসীদাসের রামচরিত-মানস। দেবী নিজে দুষ্টের দমন করতে অবতীর্ণ হন না, এই অঞ্চলে দেবী পূজিত হন বরদা রূপে। রাবণের মতো মহাশক্তিধর অশুভশক্তিকে বিনাশ করতে রামচন্দ্র আরাধনা করেছিলেন আদ্যাশক্তির দেবী দুর্গা রূপকে। সেই বরে বলিয়ান হয়ে তিনি বধ করেছিলেন রাবণকে। সেই আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে হোম, যজ্ঞ, উপোস সহ নানা ধর্মীয় আচার পালিত হয়। মনে করা হয় নয়দিন শক্তি আরাধনা করার পর দশম দিনে যুদ্ধের ময়দানে রঘুনন্দন বধ করেন রাবণ, কুম্ভকর্ণকে। তাই দশেরার দিন রঘুনন্দনের জয় ও অশুভশক্তির বিনাশকে উদযাপিত করার জন্য দশানন রাবণের মূর্তি নির্মাণ করা হয় ও তাকে আগুনের মাধ্যমে ভস্মীভূত করা হয়, যা 'রাবণদহন' নামে খ্যাত। এই দিন সমস্ত অঞ্চলে আতসবাজির মাধ্যমে বর্ণময়ভাবে শুভশক্তির জয়কে উদযাপন করা হয় থাকে।

● মহারাষ্ট্রের দেবী আরাধনা

রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, মহারাষ্ট্রে নবরাত্রি



গুজরাটের গরবা

পালিত হয় দেবী দুর্গার আধ্যাত্মিক উপাসনার মাধ্যমে। আদ্যাশক্তি মহারাষ্ট্রতে নানা রূপে পূজিত হয়— প্রথম দুইদিন কালী রূপে, পরবর্তী তিনদিন লক্ষ্মী রূপে এবং অন্তিমে চারদিন সরস্বতী রূপে। মাটির বেড় তৈরি করে ঘট স্থাপন করা এই অঞ্চলের বিশেষ ধর্মীয় আচার, যাকে 'ঘটস্থাপনা' বলা হয় থাকে। এই ঘটই দেবী দুর্গার প্রতীক। ঘটের চারপাশের মাটিতে শস্যদানা রোপণ করা হয়ে থাকে, ঘটের উপরে মাটি দিয়ে সেখানেও জোয়ারের শিষ প্রোথিত হয়। নয়দিন ধরে বাড়ির মহিলারা সেখানে জল দিয়ে থাকেন, যাতে শস্যদানা ও জোয়ারের শিষ অঙ্কুরিত হতে পারে। মহাঅষ্টমীর দিনে এখানে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ কামনায় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে এক বিশেষ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। নবম দিনে ঘটের চারপাশে অঙ্কুরিত শস্যদানা প্রচলিত বিশ্বাসে দেবীর প্রসাদ-স্বরূপ মাটি থেকে তুলে রাখা হয়। কোনও কোনও পরিবার 'মাতাঙ্গ' সম্প্রদায়ের নারীকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তার নিকট থেকে আশিস গ্রহণ করে। স্থানীয় বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের নারীরা দেবীর প্রতিমূর্তিস্বরূপ। দশমদিনে বাড়ির পুরুষরা ক্ষেত অথবা জঙ্গল থেকে 'আপ্তা' গাছের পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। আধ্যাত্মিক মূল্যের জন্য এই পাতাকে 'সোনা' বলা হয়ে থাকে। এইদিন শিশু ও প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের সংগৃহিত পাতা ও উৎপাটিত শস্য প্রদান করে ও গুরুজনদের আশিস গ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় মহারাষ্ট্রের দেবী আরাধনা।

● গুজরাতের গরবা

গরবা কথাটির উৎস সংস্কৃত শব্দ 'গর্ভ'। একটি মাটির পাত্রের মধ্যে নয়দিন ধরে একটি বাতিকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়ে থাকে। এই মাটির পাত্রটিকে গর্ভ এবং প্রজ্জ্বলিত বাতিকে চিরন্তন দেবী দুর্গার মূর্তি রূপে কল্পনা করা হয়। অশুভ শক্তি বধের উদযাপন রূপে দশম দিনে গুজরাতে বর্ণময় ও জাঁকজমকপূর্ণ গরবা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য যে সঙ্গীত রচিত হয়েছে, তা মূলত দেবী দুর্গার আরাধ্য ন'টি রূপকে কেন্দ্র করে। এই নৃত্য সাধারণত মৃৎপাত্রের অন্দরে অবস্থিত প্রজ্জ্বলিত বাতির চারধারে প্রদর্শিত হয়, যাকে 'গর্ভদীপ' বলা হয়ে থাকে। এই প্রজ্জ্বলিত শিখাটি জীবনকে ও পাত্রটি গর্ভাধারকে রূপকায়িত করে। এই নৃত্যের জন্য যে গোলাকার মানববন্ধনী রচিত হয় তা সময়ের জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে নির্দেশিত করে, যাকে হিন্দু ধর্মে জন্মান্তরবাদ বলা হয়ে থাকে। মধ্যের ঘটটি চিরন্তন দেবীশক্তির প্রতীক। ঐতিহ্যগত গুজরাতি ঘাগরা-চোলি, এথনিক কেডিয়ে পোশাক ও অক্সিডাইজ়ড গহনায় এবং কাঠের ডান্ডিয়ার মুখরিত ধ্বনিতে সেজে ওঠে ভারতের পশ্চিম ভাগ।


রাবণদহন

● দক্ষিণের বিশেষ আচার

দক্ষিণের দুর্গাও মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজিত। দক্ষিণের পালিত কিছু বিশেষ আচার এখানকার নবরাত্রিকে অন্যপ্রান্ত থেকে পৃথক করেছে। এই অঞ্চলের একটি রীতি হল বোম্বাই কলু। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত এটি একটি পুতুল উৎসব। নবরাত্রির উৎসব এখানে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমা থেকে তৃতীয়া ইচ্ছাশক্তিস্বরূপা দেবী দুর্গা, চতুর্থী থেকে জ্ঞানস্বরূপা দেবী লক্ষ্মী ও সপ্তমী থেকে নবমী ক্রিয়াস্বরূপা সরস্বতী আহূত হন। দশেরার দিন প্রথমে দুর্গার ঘট স্থাপন করা হয়। এই ঘট কাঠ অথবা ধাতু দ্বারা নির্মিত হয়। কলু পুতুলের সজ্জা বিজোড় সংখ্যায় হয়ে থাকে। সর্বাধিক নটি পর্যায়ে কলু পুতুলের সাহায্যে রচিত হয় গ্রাম্য লোকাচার ও বিবাহের গল্প। থাকে পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত পুতুল ও দেবমূর্তি। আয়ুধ পূজাও দক্ষিণের নবরাত্রির এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি। সন্ধিপূজোয় চামুণ্ডেশ্বরী অসুর নিধন করেন। তারপর দেবীর হাতে অস্ত্রের প্রয়োজন ফুরায়। সেই অস্ত্রশস্ত্রের আরাধনা হয় এই পূজার মাধ্যমে। কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে দশমীতে শিশুদের চাল বা বালির উপর দাগ কেটে হাতেখড়ি হয়, বিদ্যার্থীরা বইখাতা দেবীকে নিবেদন করে। একে বলে এদুপ্পু পুজা। কেরলে দুর্গাঅষ্টমীতে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করা হয়, যা পূজাবাইপু রূপে পরিচিত। মাইসুরুরে দসেরা ভারতের একটি অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপন। অসাধারণ আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে মাইসুরু শহর ও রাজপ্রাসাদ। বিজয়নগরের রাজা


আয়ুধ পূজা



মাইসুরু দসেরা



বোম্বাই কলু

কৃষ্ণ দেবরায়ের জাঁকজমকপূর্ণভাবে নবরাত্রি উদযাপনের কাহিনি পাওয়া যায় ইতিহাসে। পরবর্তীতে রাজা ওয়াদেয়ার নবরাত্রির রীতি নির্ধারণ করেন,যা বর্তমানে 'মাইসুরু দসেরা' নামে বিখ্যাত। ওয়াদেয়ার রাজপরিবারের বংশধররা রাজপ্রাসাদে দসেরা পালন করে থাকে। শহরের শিশু ও মহিলারা গৌরীর বৃহদাকারের মূর্তি নির্মাণ করে থাকেন। শাড়ি ও গহনায় সজ্জিত করে তাঁকে পুজো করেন। রাজপ্রাসাদ থেকে, সুদৃশ্য হস্তির উপরে সোনার ছাউনি দ্বারা আবৃত দেবী দুর্গার প্রতীকস্বরূপ ঘটের সুসজ্জিত শোভাযাত্রায় সমগ্র শহর যেন বিবাহের সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

'ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে/দেখো চেয়ে গিরিরাণী! আলুকিত বেশ, এলোথেলো বেশ, / হাসি-হাসি মুখখানি'।... এই পংক্তি শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপেরবাড়ি আগত উমার জন্য রচিত হলেও এই এলোথেলো বেশ, হাসি-হাসি মুখ হানাহানিময়, জাতি-বর্ণভেদে দীর্ণ এই পোড়া দেশের বুকে নামিয়ে আনে সম্প্রীতির বার্তা। শরতের অখণ্ড নীল আকাশের তলায় সেজে ওঠে ভারত, নানা রঙে, নানা বর্ণে। বাংলায় মেয়ের পুনরায় বাপেরবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার বিরহে অশ্রুভরা চোখ ও একবুক অপেক্ষা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে রাবণবধের উদযাপন, হিমাচল প্রদেশে রঘুনন্দনের ঘরে ফেরার আনন্দ, কাঠের ডান্ডিয়ার মুখরিত গরবার ধ্বনি, দক্ষিণের পুতুল সজ্জা, সুসজ্জিত মাইসুরু শহর— ছোট ছোট এই বর্ণময় কোলাজের মিলনে নির্মিত হয় দুর্গা মায়ের এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবার।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার আর্কাইভ ও ইন্টারনেট

ছবি: ইন্টারনেট



হেয়ার স্ক্রাবের হরেক কথা

ফেশিয়াল বা বডি স্ক্রাব নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানলেও হেয়ার স্ক্রাব এখনও ততটাও চর্চিত নয়। অথচ মাথার ত্বক ভাল রাখতে স্ক্রাবের গুরুত্ব অপরিসীম। হেয়ার স্ক্রাব নিয়ে আলোচনায় বিউটি এক্সপার্ট মৌসুমী মিত্র। শুনলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

ত্বক ভাল রাখতে ক্লেনজ়িং, টোনিং, ময়শ্চারাইজ়িংয়ের পাশাপাশি স্ক্রাবিংও যে কতটা জরুরি, তা আমরা সকলেই জানি। এক্সপার্টদের হাতেই হোক, বাড়িতে বাজারচলতি স্ক্রাব কিনেই হোক বা নিজে বানিয়ে, কমবেশি মুখ বা শরীরের বিভিন্ন অংশ স্ক্রাবিং করেও থাকি। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, মাথার ত্বককে ভাল রাখাও কি একই রকম জরুরি নয়? তা হলে সেখানে কেন শ্যাম্পু-কন্ডিশনার-সেরামেই যত্নের পর্বে দাঁড়ি টেনে দিই আমরা? তেলময়লা হোক বা মৃত কোষ, সেগুলোকে দূর করার জন্য স্ক্রাবিং তো আবশ্যক! এখানেই হেয়ার স্ক্রাবের গুরুত্ব। মাথার ত্বককে পরিষ্কার রাখতে, খুসকি বা চুল পড়ার সমস্যার মোকাবিলা করতে স্ক্রাবিং লাগেই। কিন্তু 'হেয়ার স্ক্রাব' শব্দদুটোর সঙ্গে অনেকেই এখনও ঠিক পরিচিত নন। সেই পরিচয়টুকুই করিয়ে দিতে এলাম আমরা। হেয়ার স্ক্রাবের উপকারিতা কী, কোন কোন ক্ষেত্রে স্ক্রাবিং এড়িয়ে চলাই ভাল, কীভাবে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন নানা ধরনের স্ক্রাব, আলোচনা করব সব নিয়েই।



হেয়ার স্ক্রাব কী?

এই নামটা আসলে একশো ভাগ ঠিক নয়। স্ক্রাবিংটা চুলে হয় না, হয় স্ক্যাল্পে। শরীর বা মুখের মতো মাথার ত্বকেও মৃত কোষ জমে। অনেকের খুসকির সমস্যা থাকে। কারও কারও মাথার সেবাম গ্রন্থিগুলো অতিরিক্ত অ্যাকটিভ হয় বলে তেল নিঃসরণ বেশি হয়। কারও কারও স্ক্যাল্প অতিরিক্ত সেনসিটিভ হয়, ইচিংয়ের সমস্যা থাকে। এ ছাড়া এখন অনেকেই আমরা নানা ধরনের হেয়ার প্রডাক্ট ব্যবহার করি। কখনও কখনও সেগুলোও ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না, চুলের গোড়ায় জমে যায়। একে বলে 'বিল্ড আপ'। এ সব পরিষ্কার করার জন্যই শ্যাম্পুর পাশাপাশি স্ক্রাব কাজে লাগে। অনেক সময় আমাদের ফলিকলগুলো অতিরিক্ত তেল বা খুসকির কারণে বন্ধ হয়ে যায়, চুল বেরতে পারে না সেখান দিয়ে। স্ক্রাবিংয়ের ফলে এই তেল বা খুসকি সরে গিয়ে চুলের বৃদ্ধি হয় অনেক ক্ষেত্রে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেল রিভাইভালের প্রসেসেরও গতি কমে যায় আগের চেয়ে। স্ক্যাল্প স্ক্রাব করলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, স্ক্যাল্প স্টিমুলেটেড হয়, ফলিকলগুলো একটু সক্রিয় হয়ে ওঠে— ফলে হেয়ার গ্রোথের সাইকলটা বজায় থাকে।



কীভাবে ও কতবার

মাথায় স্ক্রাবিং দু'ভাবে করা যায়— বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে অথবা বাড়িতে নিজেই স্ক্রাব বানিয়ে





নিয়ে। কে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন জানতে গেলে আগে তাঁর সমস্যার ধরন বোঝা দরকার। চুলের সমস্যা দু'ধরনের হয়। একটা হল চুলেরই সমস্যা— ড্রাইনেস, চুল ফ্রিজ়ি হয়ে থাকা, ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি। অন্যটা হল স্ক্যাল্পের সমস্যা— অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ, সেনসিটিভিটি, চুল পড়ে যাওয়া, খুসকি ইত্যাদি। যদি কারও স্ক্যাল্পে সমস্যা না হয়, তাঁর প্রফেশনাল সাহায্যের দরকারই নেই। বাড়িতেই স্ক্রাব বানিয়ে, মাসে একদিন শ্যাম্পুর আগে হালকা হাতে স্ক্রাবিং করে নিন। আর এমনিতে যেমন সালঁয় গিয়ে হেয়ার স্পা, শ্যাম্পু বা কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করেন, তা-ই করুন, ওতেই হবে। স্ক্যাল্পের সমস্যার ক্ষেত্রে যদি অল্প খুসকি থাকে, তা হলেও বাড়িতেই স্ক্রাবিং করে নিতে পারেন, কিন্তু সপ্তাহে একবার। স্পা করাতে যাচ্ছেন

যদি কারও স্ক্যাল্পে সমস্যা না হয়, তাঁর প্রফেশনাল সাহায্যের দরকারই নেই। বাড়িতেই স্ক্রাব বানিয়ে, মাসে একদিন শ্যাম্পুর আগে হালকা হাতে স্ক্রাবিং করে নিন।





যখন, তখনও স্ক্রাবিং হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি দেখেন স্ক্যাল্প থেকে মারাত্মক রকমের তেল নিঃসরণ হচ্ছে, বা খুসকি সমানে ফিরে আসছে, তার ফলে র‍্যাশ বেরচ্ছে অথবা চুলের গোড়ায় অত্যন্ত বেশি ইচিং হচ্ছে, বাড়িতে স্ক্রাব করে ফল হচ্ছে না— তখন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে।
বাজারচলতি স্ক্রাব যদি ব্যবহার করেন, তা হলে প্রডাক্টের ধরন বুঝে নিন ভাল করে। কিছু কিছু স্ক্রাবে এক ধরনের ফোমিং এজেন্ট থাকে, যার ফলে শ্যাম্পু না করলেও চলে। হালকা হতে স্ক্রাব করে, ৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলে, কন্ডিশনার ও সেরাম লাগিয়ে নিলেই হয়। সব স্ক্রাব অবশ্য এ রকম হয় না। সেক্ষেত্রে মাথা ভিজিয়ে নিয়ে প্রথমে স্ক্রাব করলেন, তারপর শ্যাম্পু, কন্ডিশনার বা মাস্ক, সেরাম— এই রুটিনেই চুল পরিষ্কার করে নিলেন। কালার্ড হেয়ারের জন্যও বিশেষ স্ক্রাব পাওয়া যায়। এই তথ্যগুলো প্রডাক্ট কেনার সময়ই জেনে নিতে হবে। আর মনে রাখুন, স্ক্রাবিংয়ের আগে মাথা ভেজানোর জন্য হয় স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল ব্যবহার করবেন। নাহলে শ্যাম্পু করার জন্য এমনিতে ঠিক যতটুকু উষ্ণ জল ব্যবহার করেন, সেটা দিয়েই মাথা ভেজাবেন। গরম জল একদম নয়। কিছু স্ক্রাবের ক্ষেত্রে বলা থাকে শুকনো স্ক্যাল্পেই ব্যবহার করতে। সেগুলো বাদে স্ক্রাবিং ভিজে মাথাতেই করতে হবে।
চুল ভাগ ভাগ করে নিয়ে, প্রতিটি ভাগে স্ক্রাব লাগাবেন। হালকা হাতে ম্যাসাজ করবেন। ৫-১০ মিনিট রেখে, প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। বাড়িতে অনেকে এরপর মাথায় হট টাওয়েল জড়িয়ে রাখেন। সালঁয় অনেক ক্ষেত্রে স্টিম দেওয়া হয়। এতে মাথার পোরগুলো একটু বেশি খুলে যায়, ফলে স্ক্রাব আরও ভালভাবে কাজ করে। অনেকে স্ক্যাল্প স্ক্রাব করতে গিয়ে চুলেও স্ক্রাব লাগিয়ে ফেলেন, ফলে চুল শুষ্ক হয়ে যায়। খেয়াল রাখতে হবে এ ব্যাপারেও।

বাড়িতে বানান স্ক্রাব

বাড়িতে স্ক্রাব বানানো কঠিন নয় মোটেই! স্ক্রাবের মূল উপকরণগুলো রান্নাঘরেই পাবেন। কফি বিন, কফিগুঁড়ো এবং চিনি— এগুলো স্ক্যাল্প স্ক্রাব করতে খুব সাহায্য করে। এর সঙ্গে কয়েকটা জিনিস মিশিয়ে, চটজলদিই বানিয়ে ফেলা যায় স্ক্রাব।

- নারকেল তেল, চিনি, কয়েক ফোঁটা পেপারমিন্ট অয়েল আর ১ চা-চামচ ভিনিগার মিশিয়ে নিন। অ্যাপল সিডার ভিনিগার হলে ভাল, না হলে সাধারণ ভিনিগারই ব্যবহার করুন। অনেক সময় ইচি স্ক্যাল্পে অ্যাপল সিডার ভিনিগার লাগালে আবার স্ক্যাল্প একটু জ্বালা-জ্বালা করে। ১ চা-চামচ মধুও মিশিয়ে নিন এর সঙ্গে। স্ক্যাল্পে লাগিয়ে, ৫ মিনিট রেখে দিন। হালকা হাতে স্ক্রাব করে, শ্যাম্পু করে নিন। পেপারমিন্ট অয়েল দেওয়া হয়, কামিং এজেন্ট বলে।
- যে কোনও ফল—ধরুন আপেল— কুরিয়ে নিন ১ চা-চামচ। তার সঙ্গে ১ চা-চামচ করে চিনি আর হিমালয়ান সি-সল্ট নিন ১ চা-চামচ করে। একটু নারকেল তেল মেশান এগুলোর সঙ্গে, ময়শ্চারাইজিংয়ের জন্য। পুরো স্ক্যাল্পে লাগিয়ে, ১৫ মিনিট রাখুন। মাসাজ করে, শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন চুল। কন্ডিশনার এবং সেরাম লাগিয়ে নিন। স্ক্যাল্প যদি খুব তৈলাক্ত হয়, নারকেল তেলের বদলে ১





চা-চামচ মধু ব্যবহার করুন।

● কফির গুঁড়োর সঙ্গে ১ চা-চামচ মধু মেশান। চাইলে ১ চা-চামচ চিনিও মিশিয়ে নিন (বাদও দিতে পারেন)। এটাও খুব ভাল স্ক্রাব মাথার ত্বকের জন্য। এতে লেবুর রসও মেশাতে পারেন কয়েক ফোঁটা, যদি না স্ক্যাল্প খুব ইচি হয়।

● মেথির গুঁড়ো খুব ভাল স্ক্রাব। এর সঙ্গে ১ চা-চামচ কুরনো তরমুজ মিশিয়ে নিন। স্ক্যাল্পের ধরন বুঝে ১ চা-চামচ মধু বা নারকেল তেল দিন। এই মিশ্রণ স্ক্রাব করে নিন স্ক্রাব।

একটা প্রশ্ন অনেক সময় ওঠে, যে ফেস স্ক্রাব দিয়ে মাথার স্ক্রাবিং করা যায় কি না। এমনিতে এটা করা উচিত নয়। তবে অনেক সময় হয় যে, এখনই বেরতে হবে, সালঁয় গিয়ে বা বাড়িতে স্ক্রাব বানিয়ে স্ক্রাবিং করার সময় নেই। তখন যদি হাতের কাছে হালকা, জেল-বেসড কিংবা ফাইন গ্র্যানিউলের কোনও স্ক্রাব থাকে (যেগুলোয় অ্যাপ্রিকটের বদলে ওয়ালনাট ব্যবহার করা হয়, সেই স্ক্রাবগুলোর গ্র্যানিউল ফাইন হয়), সে রকম কিছু দিয়ে স্ক্রাবিং করতে পারেন। তবে এক-আধবার, খুব প্রয়োজনে। নিয়মিত নয়।

কখন স্ক্রাবিং এড়িয়ে চলবেন?

ফলিকল ঠিক থাকলেও চুল যদি খুব দুর্বল হয়, অন্য নানা কারণে চুল পড়ে— থাইরয়েড, সুগার, স্ট্রেস, বা রক্তচলাচলে কোনও সমস্যা, যা কিছুই হতে পারে— তখন স্ক্রাবিং এড়িয়ে চলাই ভাল। কারণ স্ক্রাবিংয়ের ফলে যে টেনশন সৃষ্টি হয় চুলে, তার ফলে হয়তো আরও বেশি চুল উঠে এল হাতে। চুলের কোন সমস্যার ক্ষেত্রে স্ক্রাব ব্যবহার করবেন আর কখন করবেন না বা খুব কম করবেন— এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরাই



ছবি: আইস্টক





আপনাকে সবচেয়ে ভাল গাইড করতে পারবেন।

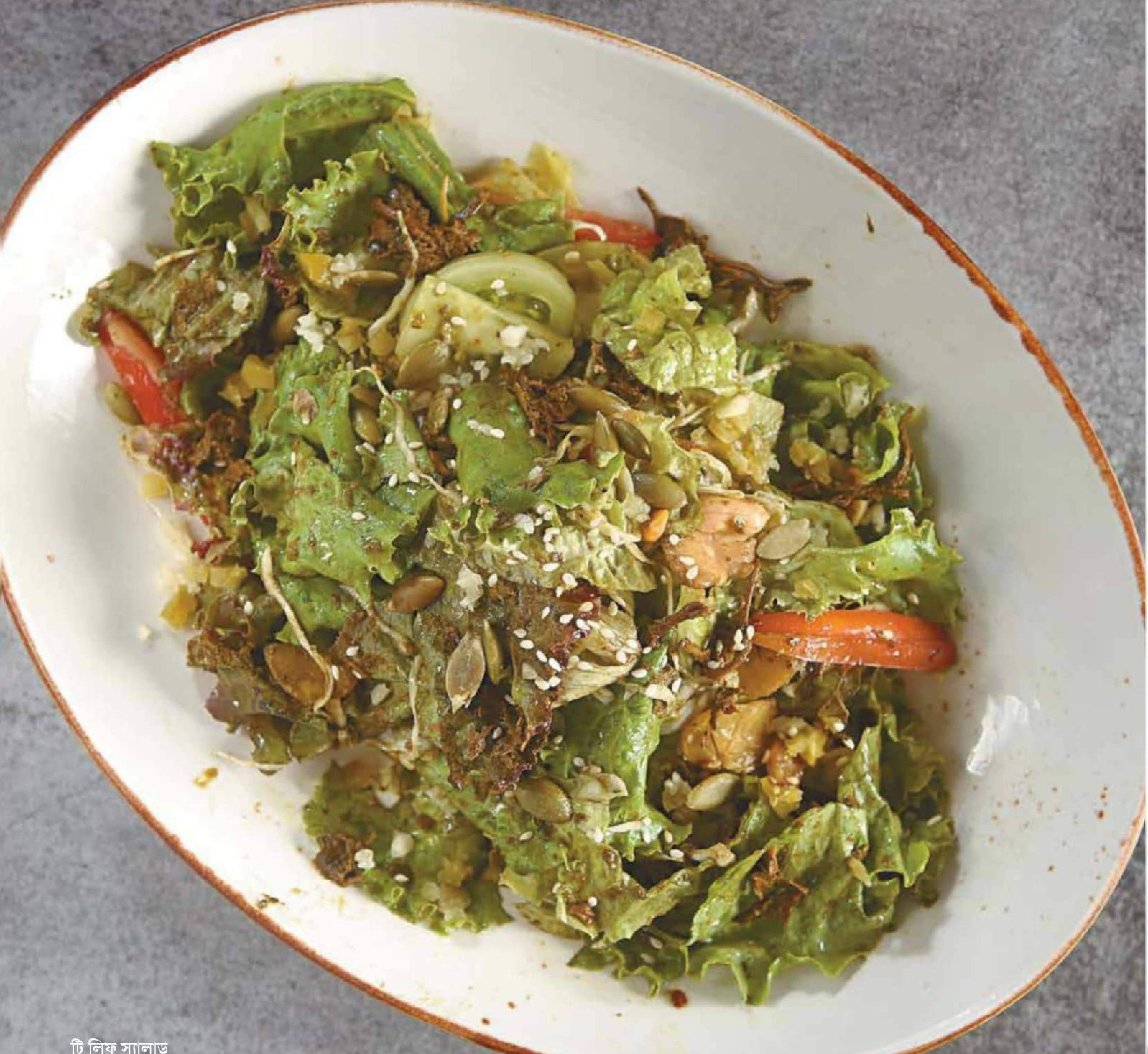
তবে একটা জিনিস মনে রাখুন— হেয়ার স্ক্রাব কিন্তু শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নয় মোটেই। স্ক্যাল্পের সমস্যা জেন্ডার দেখে আসে না। তাই সকলেরই নিয়মিত স্ক্রাব করা উচিত, স্ক্যাল্প ও চুলের ধরন বুঝে। স্ক্যাল্পের যত্ন নিলে হেয়ার হেলথও
ভাল থাকবে।

যোগাযোগ: বি বনি হেয়ার অ্যান্ড বিউটি সালঁ
ফোন: ৯৯০৩৯৭৭৭৭৮
মডেল: তরুণিমা, দেবলীনা
মেক-আপ: প্রীতি দাস
ফোন: ৯৭৪৮৬৭৪৫৭২
হেয়ার: রাজীব দাস
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩২৪২৩৯৯০০
ছবি: শুভদীপ সামন্ত
সহযোগী: সৌম্য সেনগুপ্ত



পদ-বৈচিত্রের মায়ানমার

চা পাতা দিয়ে স্যালাড, মোচা দিয়ে মুচমুচে ভাজা বা নারকেল-পিনাট চাটনি দিয়ে ভাত...মায়ানমারের খাদ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমনই নানা ট্র্যাডিশনাল ডিশ। তেমনই কয়েকটি বার্মিজ় রেসিপি শেখালেন শেফ আনসাব খান। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।



টি লিফ স্যালাড

বার্মিজ় কুইজ়িনের মূল সুর বাঁধা আছে সে দেশের প্রাচীন ট্র্যাডিশন ও প্রতিবেশী দেশগুলোর খাদ্য-সংস্কৃতির মধ্যে। মায়ানমারের উপকূল, জঙ্গল, পাহাড়-ঘেরা প্রকৃতির প্রতিটি অংশই সেখানকার খাওয়াদাওয়াকে প্রভাবিত করেছে। বার্মিজ় খাবারের বৈশিষ্ট্য হল স্বাদ আর গন্ধ। নানা ধরনের কারি, স্যালাড বা সাদা ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য সুপ...এসব সে দেশের মানুষের রোজকার খাবার বলতে পারেন। নুডলসও নানাভাবে খেতে ভালবাসেন তাঁরা। ফ্রায়েড বা ড্রাই নুডলস, নুডল স্যালাড বা নুডল সুপ, এসবও তাঁদের প্রিয়। আবার স্ট্রিট ফুডের মধ্যে নানা ধরনের ভাজা (বার্মিজ় ফ্রিটারস) বা একধরনের বিশেষ স্ন্যাক্স 'মন্ট'-এর কথা বলতে হয় আলাদা করে। ধান চাষ তো বটেই, চায়ের বাগানও অসংখ্য এখানে। মায়ানমার আর চিনের সীমান্তে নাকি একটা সময়ে চায়ের উৎপাদন হত প্রচুর, সেই থেকে এখানকার মানুষদের চা খাওয়ার এক ঐতিহ্য রয়েছে! খাওয়াদাওয়ার নানা আদব-কায়দাও মেনে চলেন মায়ানমারের মানুষরা। যেমন, মাদুরের উপরে বসে নিচু টেবল থেকে খাবার খান তাঁরা। সবচেয়ে বয়স্ক সদস্যকে সবার আগে খাবার পরিবেশন করা হয়। একদম ট্র্যাডিশনাল পদ বলতে সাদা ভাত, সঙ্গে কোনও সুপ বা কারি। সাইড ডিশের মধ্যে থাকে সবজি ভাজা, ফ্রিটারস বা এক বিশেষ বার্মিজ় পদ যা মূলত পিকলড ফিশ ডিপ ও ব্লাঞ্চ করে রাখা সবজির সংমিশ্রণে তৈরি। বার্মিজ় কারিতে প্রচুর মশলা দেন না তাঁরা। বরং, রান্নায় রসুন আর আদা থাকবেই। লোয়ার মায়ানমারে মাছ বা সি ফুড-বেসড প্রডাক্ট বেশি। তুলনায় আপার মায়ানমারে মাংস, ডাল, বিনস, পোলট্রিজাত খাবারের ব্যবহার বেশি। আবার মায়ানমারের কোনও রেস্তরাঁয় গেলে কমপ্লিমেন্টারি চা দেওয়া হবেই! চা এতটাই জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের খাদ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে। মূলত গ্রিন টি (শান রাজ্য ও কাচিন রাজ্যে উৎপাদিত) ও দুধ চা (কালো চায়ের সঙ্গে কনডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে) খান তাঁরা। এ তো গেল খাবারের গল্প, এবার রেসিপি শেখার পালা।

ভাত আর চা, মায়ানমারের মানুষ বড্ড ভালবাসেন এই দুই উপাদানকে। তাঁদের খাদ্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রে রয়েছে এই দুই। এছাড়া কারি, সুপ, নুডলস, ব্রেড বা নানাধরনের স্ন্যাক্সও তাঁদের খুব প্রিয়।

টি লিফ স্যালাড

মায়ানমারের মানুষ পানীয় হিসেবে চা খান, খাবার হিসেবেও চা খান! পিকলড টি লিফ বা আচার দেওয়া চা পাতাকে স্থানীয় ভাষায় বলে লাহপেত। প্রাচীনকালে আবার যুদ্ধরত গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিস্থাপনের প্রতীক হিসেবে এই লাহপেত দেওয়ার প্রচলন ছিল। এখন, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসেবে পরিবেশন করা হয় টি লিফ।

উপকরণ: টি লিফ পেস্ট ২ টেবলচামচ, আইসবার্গ লেটুসকুচি ১/২ কাপ, ফ্রিসি লেটুসকুচি (একটু কোঁকড়ানো ধরনের) ১/২ কাপ, লোলো রোসো লেটুসকুচি (লাল রঙের) ১/৪ কাপ, বাঁধাকপি ১/৪ কাপ (কুচনো), সবুজ টোম্যাটো অর্ধেকটা (পাতলা করে কাটা), লাল টোম্যাটো অর্ধেকটা (পাতলা করে কাটা), হ্যালেপিনো ১ চা-চামচ (কুচনো), রসুনকুচি ১/২ চা-চামচ, স্যালাড অয়েল ১ চা-চামচ, বাদামের মিশ্রণ (মশলা ছোলার ডাল, সল্টেড ব্রড বিন, সল্টেড পিনাট, সাদা তিল, কুমড়োর বীজ, সূর্যমুখী বীজ) ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, লেবুর রস অর্ধেকটা লেবুর, রোস্ট করা তিল (সাজানোর জন্য)।

প্রণালী: লেটুসপাতা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন। একটি মিক্সিং বোলে টি লিফ পেস্টের সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। এতে লেটুসপাতা দিন। সার্ভিং প্লেটে মিশ্রণটি রেখে উপর থেকে তিল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।



কোকোনাট রাইস উইথ পিনাট চাটনি

কোকোনাট রাইস উইথ পিনাট চাটনি

বার্মিজ় কুইজ়িনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নারকেল। মিষ্টি বা নোনতা, নানা খাবারে ব্যবহার হয় নারকেলের। এই পদটি ওদেশে খুবই কমন। অনেকে শুধু কোকোনাট রাইসও খান। অনেকে কারি বা সবজির সঙ্গে খান।

উপকরণ: কোকোনাট রাইসের জন্য: জ্যাসমিন রাইস ২ কাপ, নারকেল দুধ ২ ১/২ কাপ, আদা ১ টুকরো, তেজপাতা ২টো, গোটা গোলমরিচ ৬টা, কাঁচালঙ্কা ১টা, লেমনগ্রাস ১ আঁটি, বেরেস্তা ১ কাপ, নুন স্বাদমতো, শ্যালট (ছাঁচি পেঁয়াজ) ৮-১০টা, মাখন ১/২ টেবলচামচ, জল ১ কাপ।



টাগু পিয়ান

ভেজিটেবল স্টক, নুন, ভিনিগার দিয়ে মেশান। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। সার্ভিং বোলে গরম গরম কোকোনাট রাইস মাঝখানে রেখে পাশে চাটনি-সহযোগে পরিবেশন করুন। বেরেস্তা ও জুলিয়েন করে কাটা স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে সাজিয়ে দিন।

টাগু পিয়ান

ক্লাসিক বার্মিজ় ডেসার্ট। কোকোনাট কাস্টার্ড, পাম জ্যাগারি ও সাগু দিয়ে তৈরি এই পদ মায়ানমারের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই খুব জনপ্রিয়।

উপকরণ: কোকোনাট মিল্ক পাউডার ৪০০ গ্রাম, জল ৫০০ গ্রাম+ ৫৫০ গ্রাম, ক্যাস্টর সুগার ৮০ গ্রাম, চায়না গ্রাস ২০ গ্রাম, সাগু ৭৫ গ্রাম, জল (সাগুর জন্য) ১২৫ মিলি, পাম জ্যাগারি (প্লেটিংয়ের জন্য) অল্প, নারকেলকুচি (প্লেটিংয়ের জন্য) অল্প।

চিনির সিরাপ বানানোর জন্য: চিনি ৫০ গ্রাম, জল ৫০ গ্রাম।

প্রণালী: প্যানাকটার জন্য প্রথমে আধ লিটার জলে চায়না গ্রাস ভিজিয়ে রাখুন, মিনিটপনেরো মতো। ভেজানো চায়না গ্রাস ফুটিয়ে নিন। বয়েলিং পয়েন্টে পৌঁছে গেলে বাকি জল দিন। একে একে কোকোনাট পাউডার, ক্যাস্টর সুগার দিন। পুরো মিশ্রণ ১৫-১৮ মিনিট মতো ফুটিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে ছেঁকে নিন। এক ইঞ্চি গভীর ট্রে-তে মিশ্রণটি ঢেলে রুম টেম্পারেচারে এক ঘণ্টা মতো রাখুন। তারপর ফ্রিজে দিন। ঠান্ডা হয়ে জমে গেলে ইচ্ছেমতো শেপে কেটে নিন। চিনির সিরাপ বানানোর জন্য জলে চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। ফুটনো জলে সাগু ১০ মিনিট মতো সেদ্ধ করে নিন। নরম হয়ে এলে জলে ধুয়ে নিন। চিনির রসে সাগু ডুবিয়ে রুম টেম্পারেচারে রাখুন। পরিবেশন করার আগে কড়াইতে সাগু ও গুড় দিন। গুড় গলে এলে নামিয়ে নিন। একটি প্লেটে প্যানাকটা, চিনির সিরাপ-সাগুর মিশ্রণ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। কুরনো নারকেল ও গুড় দিয়ে গার্নিশ করে নেবেন।

পিনাট চাটনি বানানোর জন্য: তেল ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ১টা (পাতলা স্লাইস করা), পেঁয়াজকুচি ১/২ টেবলচামচ, রসুনকুচি ১/২ টেবলচামচ, আদাকুচি ১/৪ চা-চামচ, টোম্যাটোকুচি ১ টেবলচামচ, ক্রাশড পিনাট ৩ ১/২ টেবলচামচ, সুইট চিলি সস ১ টেবলচামচ, হোয়াইট ভিনিগার ১/২ টেবলচামচ, শুকনোলঙ্কা পেস্ট ২ ১/২ টেবলচামচ, রেড চিলি সস ৩/৪ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, বেরেস্তা ও স্প্রিং অনিয়ন (সাজানোর জন্য)।

প্রণালী: আধঘণ্টা মতো জেসমিন রাইস ভিজিয়ে রাখুন। প্যানে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা, গোলমরিচ, আদা ফোড়ন দিন। নেড়েচেড়ে নারকেল দুধ, জল দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটান। লঙ্কা দিন। সব উপকরণ একটু ফুটে উঠলে স্টক ছেঁকে নিন। ছেঁকে রাখা দুধ একটি প্যানে নিয়ে তাতে জল ঝরানো চাল, পেঁয়াজ, লেমনগ্রাস, নুন দিন। ফুটিয়ে নিন যতক্ষণ না জল শুকিয়ে আসছে। ভাত সেদ্ধ করতে প্রয়োজনে জল দিন। পরিবেশনের আগে উপর থেকে লেমনগ্রাসের আঁটি তুলে উপর থেকে বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন। কোকোনাট রাইস তৈরি। এবার পিনাট চাটনির জন্য প্যানে তেল গরম করে তাতে রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, আদাকুচি দিন। সতে করে স্লাইস করে রাখা পেঁয়াজ দিন। টোম্যাটোকুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। সস, চিলি পেস্ট, ক্রাশড পিনাট দিন। নেড়েচেড়ে



পেয়াজো কারি

পেয়াজো কারি

বার্মায় ভারতীয় কমিউনিটির সৌজন্যে এই পদের সঙ্গে পরিচিত হন বার্মিজ়রা। এখন ইয়ানগনের স্ট্রিট ফুডের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় পদ এটি।

উপকরণ: **কারি বানানোর জন্য:** গোটা সরষে ১/২ চা-চামচ, দই ২ কাপ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১ চা-চামচ, বেসন ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবলচামচ, কারিপাতাকুচি ১ চা-চামচ, তেল ১ টেবলচামচ, জল ১ কাপ। **গ্রিন চাটনির জন্য:** ধনেপাতাকুচি ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, স্যালাড অয়েল ১/৪ কাপ, নুন স্বাদমতো। **আলু-ছোলার মিশ্রণের জন্য:** শুকনোলঙ্কার পেস্ট ২ টেবলচামচ, তেঁতুলের ক্বাথ ১ টেবলচামচ, বার্মিজ় সিজ়নিং ১ টেবলচামচ, ছোলা (শুকনো)১ কাপ, আলু সেদ্ধ ১/২ কাপ, ওয়ান্টন শিট (শ্রেডেড) সাজানোর জন্য, বাঁধাকপিকুচি পরিমাণমতো, টোম্যাটোকুচি ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবলচামচ, ধনেপাতা (সাজানোর জন্য)। **ফালাফলের জন্য:** ভেজানো মটর ১/৩ কাপ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১/৩ চা-চামচ, চিলি পাউডার ১/৪ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১/২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ১টা, পেঁয়াজ অর্ধেকটা (কুচনো), রসুনকুচি ৩ কোয়া, বেসন ১ চা-চামচ, আদাকুচি ১/২ চা-চামচ।

প্রণালী: প্যানে তেল গরম করে গোটা সরষে, কারিপাতা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরলে পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা দিন। নেড়েচেড়ে নিন। একটি পাত্রে দই ও বেসন একসঙ্গে নিয়ে মিহি করে ফেটিয়ে নিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিন। ঘনত্ব ঠিক হয়ে এলে ফোড়নে দিন। কারি তৈরি। আলু-ছোলার মিশ্রণের জন্য ছোলা সেদ্ধ করে নিন। প্যানে তেল, চিলি পেস্ট, ছোলাসেদ্ধ একসঙ্গে টস করে নিন। বার্মিজ় সিজ়নিং ও নুন দিন। নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। ফালাফলের জন্য ভেজানো মটর ও বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে পিষে নিন। মিশ্রণ থেকে ১ ইঞ্চি চৌকো শেপে কেটে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। সার্ভিং বোলে আলু-ছোলার মিশ্রণ, পেঁয়াজ-টোম্যাটোকুচি মেশান। গ্রিন চাটনি দিন। উপকর থেকে কারি ঢেলে, ভেজে রাখা শ্রেডেড ওয়ান্টন শিট দিয়ে সাজিয়ে দিন। ধনেপাতাকুচি ও সামান্য বার্মিজ় সিজ়নিং ছড়িয়ে দিতে ভুলবেন না।

বানানা ফ্লাওয়ার ক্রোকে উইথ কোকাম ক্রেম

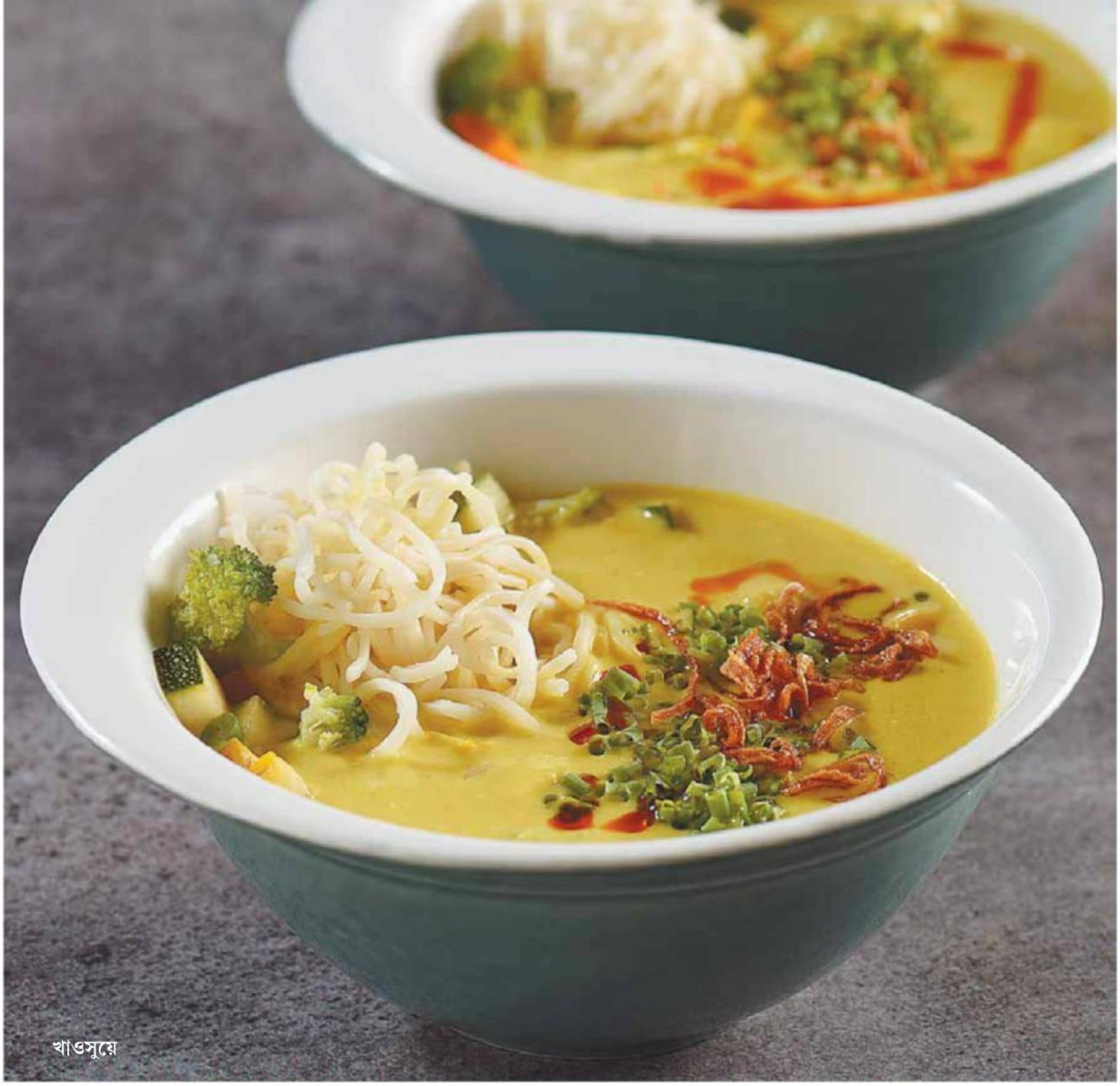
মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মোচার ক্রোকে। এই রাজ্য আবার বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত। বার্মিজ় কুইজ়িনের সঙ্গে আমাদের দুটি মিল আছে: দু'জনেই মশলা ভালবাসি আর দু'দেশের খাবারই হিট-টলারেন্ট।

উপকরণ: মোচা ১ কাপ (পরিষ্কার করে ছাড়িয়ে কুচনো), মিষ্টি আলুর টুকরো ১/৪ কাপ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, বেরেস্তা ১ চা-চামচ, রসুনভাজা ১/২ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনিগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ভাজা শুকনোলঙ্কা ১/৪ চা-চামচ, হোয়াইট ভিনিগার ১ চা-চামচ, চিলি অয়েল ১ চা-চামচ, তেঁতুলের ক্বাথ ১/২ চা-চামচ, ব্রেড ক্রাম প্রয়োজনমতো, ময়দা ১/২ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১/৪ কাপ। **কোকাম ক্রেম বানানোর জন্য:** কোকাম নির্যাস ১ কাপ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১ চা-চামচ, কোকোনাট মিল্ক পাউডার ২ কাপ, ভিনিগার ১ চা-চামচ, স্যালাড অয়েল ১/২ কাপ।



বানানা ফ্লাওয়ার ক্রোকে

প্রণালী: উষ্ণ জলে মোচা সেদ্ধ করে নিন। নরম হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। একটি পাত্রে সেদ্ধ মোচা ভাল করে কুচিয়ে তাতে সেদ্ধ মিষ্টি আলু দিন। একে একে বেরেস্তা, চিলি অয়েল, তেঁতুলের ক্বাথ, কুচনো শুকনোলঙ্কা, রসুনভাজা, হোয়াইট ভিনিগার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে ডো-এর আকারে গড়ে তা থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। অন্য একটি পাত্রে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, জল ও সামান্য নুন মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন। মোচা-আলুর লেচি ব্যাটারে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলুন। মুচমুচে হয়ে এলে নামিয়ে রাখুন। কোকাম ক্রেম বানানোর জন্য সব উপকরণ (কোকাম, কোকোনাট


খাওসুয়ে

মিল্ক পাউডার, ভিনিগার, স্যালাড অয়েল, নুন-চিনি) একটি পাত্রে ফেটিয়ে নিন। মুচমুচে ক্রোকের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

খাওসুয়ে

নুডলস, সবজি আর ঝোলের সংমিশ্রণ। আর তা রান্না হয় নারকেলের দুধে। মায়ানমারের অসম্ভব জনপ্রিয় ওয়ান পট মিল এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে ভারতীয়রা বার্মা থেকে ভারতে চলে আসেন, তাঁদের হাত ধরেই এদেশে, বিশেষত পূর্ব ভারতে জনপ্রিয় হয় এই পদ।

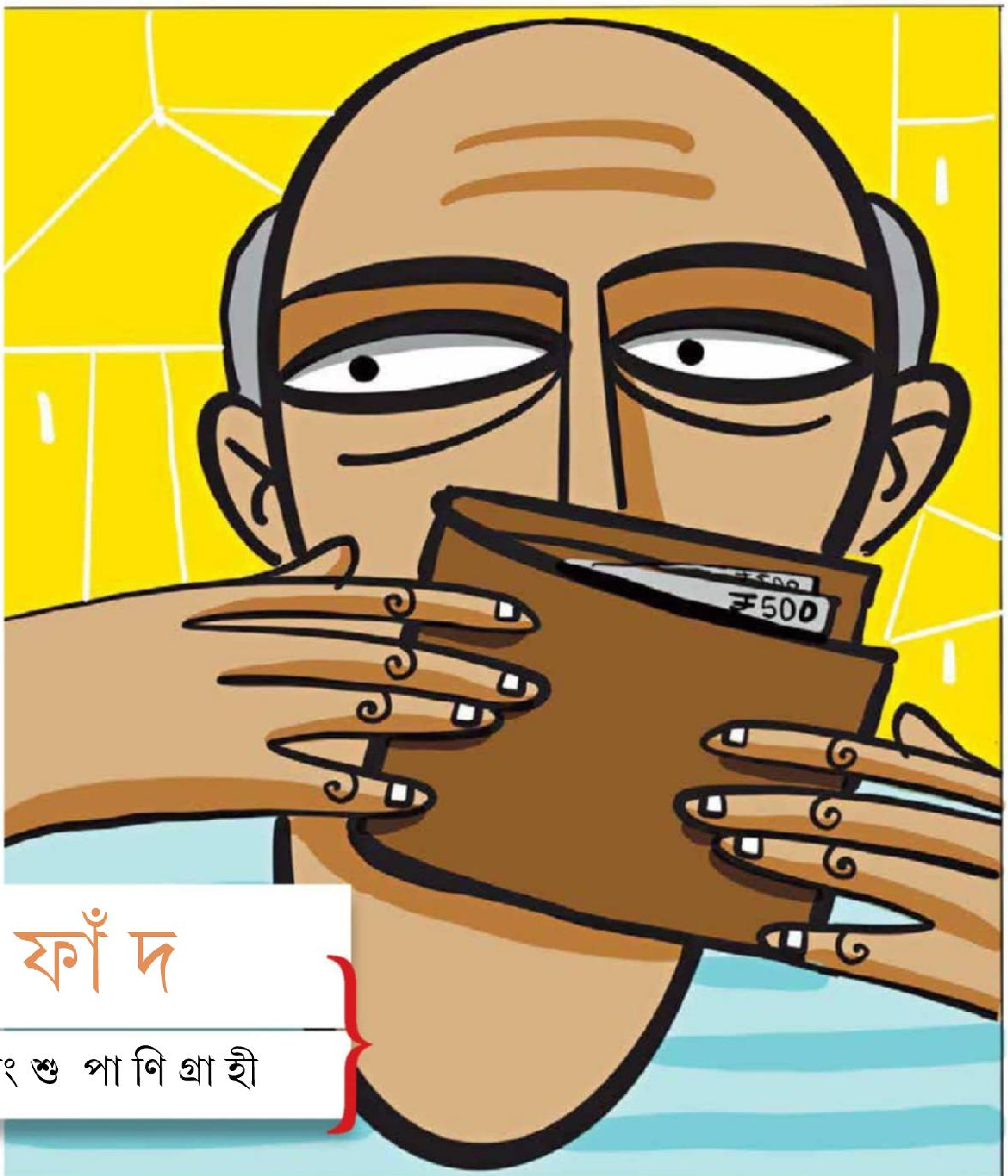
উপকরণ: খাওসুয়ে কারি পেস্ট ১০০ গ্রাম, জল ১০০ মিলি, নারকেল দুধ ৩০০ মিলি, সবজি (গাজর, ব্রকোলি, জুকিনি, বেবিকর্ন, ফ্রেঞ্চ বিনস) ব্লাঞ্চ করে রাখা ১/২ কাপ, নুডলস ১/৩ কাপ, স্প্রিং অনিয়ন, রসুনভাজা ও লঙ্কাভাজা (সাজানোর জন্য) পরিমাণমতো, বালাচং স্বাদমতো, চিলি অয়েল সাজানোর জন্য।

প্রণালী: প্যানে জল গরম করে খাওসুয়ে কারি পেস্ট দিন। ফুটিয়ে নিয়ে তাতে নারকেল দুধ, টুকরো করে কাটা ও ব্লাঞ্চ করে রাখা সবজি দিন। নেড়েচেড়ে নিন, কারি ঘন হয়ে আসবে। ব্লাঞ্চ করে রাখা নুডলস দিন। সব মিশে গেলে সার্ভিং বোলে কুচনো স্প্রিং অনিয়ন, চিলি অয়েল, রসুনভাজা ও লঙ্কাভাজা ও বালাচং (এটি একধরনের ঝাল ঝাল সস) দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

মায়ানমারের লোকেরা কিন্তু বেশ খাদ্যরসিক। ঘরোয়া সহজ খাবারেও তাঁরা অভিনবত্ব পছন্দ করেন। নানা দেশের মানুষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে ঠিকই। নানারকম নতুন পদেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু সাবেকি বার্মিজ় রান্নাগুলো এখনও যে কোনও অনুষ্ঠানে বা বাড়িতে হয়। ‘সানন্দা’য় এবারের প্রতিবেদনে ট্র্যাডিশনাল বার্মিজ় রান্না শিখে নিলেন তো? রেস্তরাঁয় হোক বা বাড়িতে চেষ্টা করলে বানিয়ে ফেলতে পারেন এরকম পদ...

মায়ানমারের অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়ান পট ডিশ হল খাওসুয়ে। যেমন পুষ্টিকর, তেমনই ফিলিং। নুডলস, সবজি আর সুপের মিশ্রণে তৈরি এই পদ জনপ্রিয় আমাদের দেশেও। এমনকি বিদেশেও।

রেসিপি সৌজন্যে: বার্মা বার্মা ইন্ডিয়া
যোগাযোগ: ৭৫০৬০৬১৪৬০, ৯৯২০২৪০০৯৭
ছবি: শুভেন্দু চাকী



ফাঁদ

অংশু পাণিগ্রাহী

দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল।
খাওয়া-দাওয়া সেরে মতি যখন বাড়ি থেকে বেরল তখন রোদ উঠে গিয়েছে। গন্তব্য বিমলের চায়ের দোকান। ওটাই তার ঠেক। খাওয়া আর ঘুমোনো বাদে দিনের বাকি সময়গুলো ওখানেই কাটে।
বিমলের দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে ভাল আড্ডা জমে, মাঝেমধ্যে তাসের আসর। অনেক সময় সঙ্গীর দরকার হয় না। একা একাই বেঞ্চিতে বসে থাকে সে। এই বিকেলের সময়টা যেমন। চারটের আগে ঝাঁপ তুলবে না বিমল। তবু ঘণ্টাখানেক আগেই হাজির হয়ে যায় মতি। মাছের আড়তের কাজটা চলে যাওয়ার পর থেকেই এই অভ্যাস। নিজের বাড়িটা যেন জেলখানা! বাড়িতে থাকলেই প্রাণ হাঁকুপাকু।
বড় রাস্তার পাশে চায়ের দোকান। আজ রাস্তা পেরিয়ে দোকানের ছাউনিটার নিচে পৌঁছতেই তার চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে যায়। বাঁশের বেঞ্চির উপর একটা মানিব্যাগ! সেটা আবার জলে ভিজে ন্যাতা।
এদিক-ওদিক তাকায় সে। পাশেই বাস-স্টপ, হাস্যমুখ নেতা-মন্ত্রীর ছবি সমেত সিমেন্টে বাঁধানো যাত্রী প্রতীক্ষালয়। তবে এখন খাঁ-খাঁ করছে, জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। মাঝে-মাঝে মাটি কাঁপিয়ে দূরপাল্লার বাস চলে যাচ্ছে। সেগুলো এখানে থামবে না।
দ্রুতহাতে মানিব্যাগটা খুলে ফেলে মতি। পাঁচশো টাকার দশটা নোট! বুকের ধুকপুকুনিটা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এ যে অনেক টাকা! এত টাকা একসঙ্গে কতদিন দেখেনি সে! মাছের আড়তে কর্মরত অবস্থায় অবশ্য মাসান্তে এ রকমই বেতন পেত। কাজ হারানোর পর থেকে টাকাপয়সার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। ও সব ব্যাপার তার বউ লাবণি সামলায়।
এখন টাকাগুলো নিয়ে কী করা যায়? অপেক্ষা করবে দাবিদারের

জন্য? লাবণি এখানে থাকলে তেমনই পরামর্শ দিত। বিনা পরিশ্রমের উপার্জন লাবণির কাছে তীব্র ঘৃণার বস্তু।
গতবার স্থানীয় এক নেতা ভোটের আগের রাতে টাকা বিলি করছিল। মতিদের বাড়িতেও এসেছিল। লাবণি সরাসরি হাঁকিয়ে দিল, "টাকা লিকি ভোট দিয়াটা অন্যায়। টাকা লাগবে নি।"
রাগ হচ্ছিল মতির। ইচ্ছে করছিল মেয়েমানুষটাকে একটা থাপ্পড় লাগায়। গাড়ল নাকি? নিজেকে হরিশচন্দ্র না যুধিষ্ঠির ভাবছে! তাঁরা সম্রাট ছিলেন। তুই তো হাড়হাভাতের বউ। তোর এত রোয়াব কীসের?
মতি লোভী, আবার ভিতুও। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে। অবশ্য এমন প্রাপ্তিযোগ তো আর রোজ-রোজ ঘটে না!
শেষ অবধি ভয়কে ছাপিয়ে লোভটা গ্রাস করে ফেলে তাকে। নোটগুলো সাবধানে জামার পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। ছেঁড়াফাটা রংচটা মানিব্যাগটা ছুড়ে ফেলে পাশের ঝোপে।
প্রত্যক্ষদর্শী থেকে গেল না তো? চারদিকে আর-একবার চোখ চালিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয়। নাহ্, কেউ কোথাও নেই! এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। হনহন করে হাঁটা লাগায় বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে উনুন ধরায় মতি।
লাবণি এ সময় কাজু প্রসেসিং কারখানায় থাকে। বাবু ইস্কুলে।
নিশ্চিন্তে পা ছড়িয়ে বসে ন্যাতানো নোটগুলোকে অল্প আঁচে মেলে ধরে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেঁকতে থাকে একটা একটা করে। খড়খড়ে হয়ে এলে নাকে ঠেকায়। আহ্, কী চমৎকার ঘ্রাণ! গন্ধটা গিয়ে সোজা হাতুড়ি মারে তার ব্রহ্মতালুতে।
মাথাটা অনেকদিন আগেই ম্যাদামারা হয়ে গিয়েছে। সবসময় ঝিমুনি, কেমন একটা হতাশ-অলস, বোকা-বোকা ভাব।
আজ পাঁচশোর নোটের গন্ধ স্নায়ুগুলোকে ফের উত্তেজিত করে তোলে। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে মনের গোপনতম কুঠুরিতে দাবিয়ে রাখা বাসনাগুলো।
দুটো নোট আলাদা করে, বাকিগুলো নিজের টিনের বাক্সে তুলে রাখে মতি। তালাচাবি দেয়। মনে-মনে আঁটতে থাকে পরিকল্পনা। যতটা পারবে মজা লুটেপুটে নেবে আজ। জীবনটা তো একপ্রকার খরচের খাতায়, বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে গিয়েছে কবেই। বিগত দশটা বছর একপ্রকার জড়ভরত হয়েই কাটিয়ে দিয়েছে।
আড়তটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কিছুকাল কাজের খোঁজে অনেক চক্কর কেটেছিল। কোনও কাজই পছন্দ হয়নি। আলসেমি বেড়েছে দিন-দিন। হাল ছেড়ে দিয়েছে এক সময়।
আড়তের মাইনে সামান্যই ছিল, সংসারে পড়তে না পড়তেই ফুরিয়ে যেত। তবু নিজের উপার্জন। নেশা-ভাঙ করার ইচ্ছে হলে লাবণির কাছে জবাবদিহি করতে হত না।
এমনিতে সে মিনমিনে স্বভাবের। তবে পেটে মদ পড়লে বিকট একটা খোঁচা লাগত সুপ্ত পৌরুষে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা করে নিজেই খুঁচিয়ে তুলত অক্ষমতা ও অপ্রাপ্তির বেদনাগুলো। যাবতীয় ক্ষোভ ও হতাশা উগরোনোর আধার ছিল লাবণির নগ্ন দেহ। পিষে ফেলতে চাইত বউয়ের শরীরটাকে। প্রথমদিকে লাবণিও সর্বংসহা মেয়ে ছিল। মুখ বুজে থাকত। তবে এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। বউকে ভয় করে মতি। বউয়ের ব্যক্তিত্ব তার কাছে ভীতিপ্রদ।
এখন নোটদুটো পকেটে ঢুকিয়ে বাবুর সস্তা পারফিউমের শিশি তুলে স্প্রে করে দুই বগলে। ভাঙা হাত-আয়নায় নিজের বদনটা একবার দেখে। তার মনে হয়, মাথাজোড়া টাকখানা ভ্যানিশ, গোঁফজোড়া আবার কুচকুচে কালো, গালদুটো ভরন্ত... হ্যাঁ, এই তো বছর পঁয়তাল্লিশের আসল মতিলাল নায়ক!

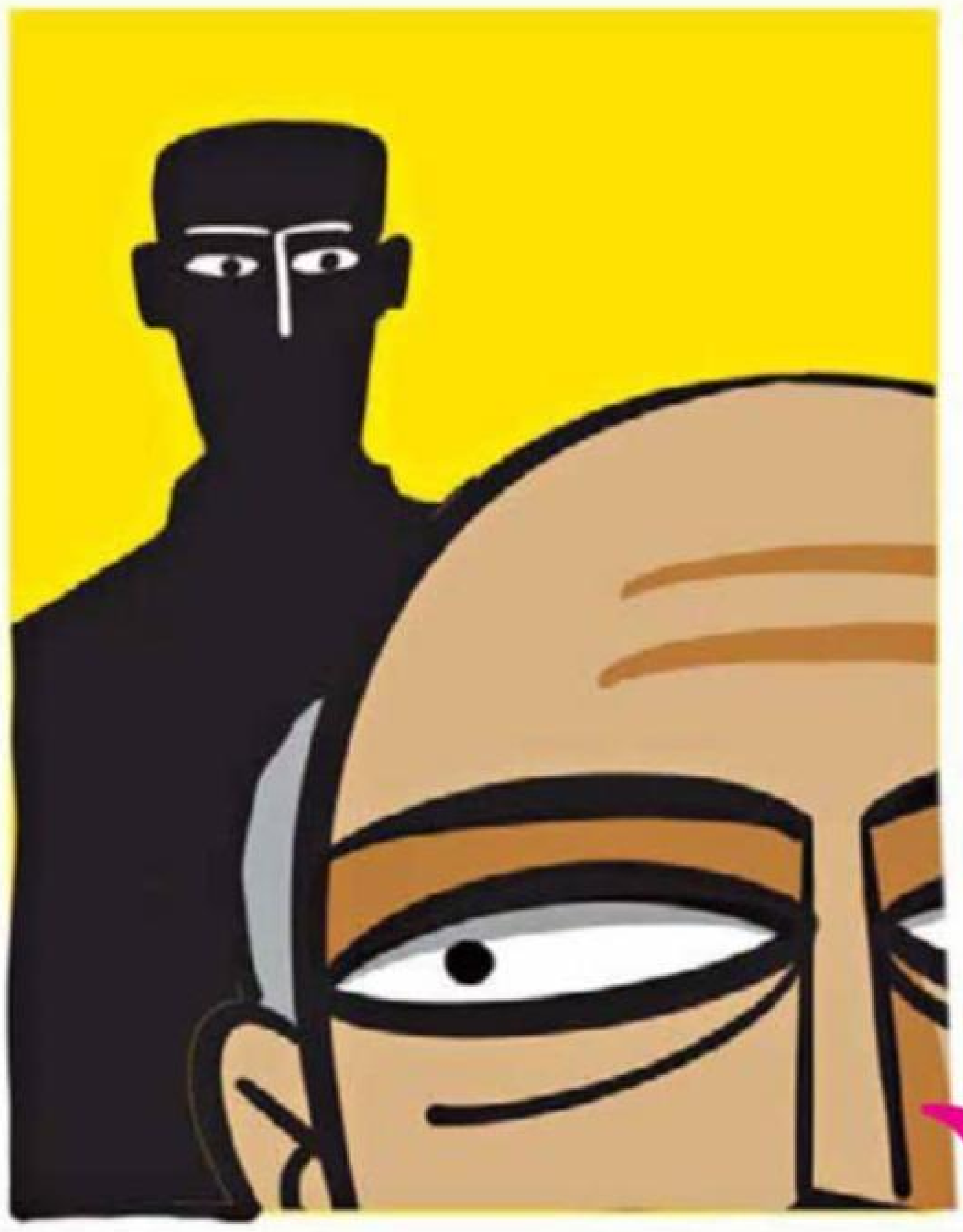
খাসির ঝোলে লুচিটা ডুবিয়ে মুখে পুরতেই মনে হয়, অস্বস্তির অনুভূতিটা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরনোর পর থেকেই ভয় হচ্ছিল, কেউ বুঝি দেখছে, নজর রাখছে তার ওপর! এমনকী এই রেস্টুরেন্টে বসে খাবার অর্ডার দেওয়ার পরও অস্বস্তিটা বিজবিজ করছিল শরীরে। খদ্দেররা যার-যার টেবিলে খাবার নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও সন্দেহজনক কিছু নেই। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।
এখন অবশ্য বেশ ভালই লাগছে। নির্ভার, ফুরফুরে।
ঝোলটাও জব্বর। যেমন খোশবু তেমন রূপ। লাল,
তেল-চিকচিক, থকথকে। কতদিন এসব খাওয়া হয় না! খাসির ঝোল খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই কবে বছরপাঁচেক আগে। পাড়ার সাউদের ছেলের বিয়েতে। নিজের ক্ষমতা ছিল না কোনওকালে। লাবণির রোজগারেও ডাল, সয়াবিন, বড়জোর কুচো সামুদ্রিক মাছ অবধি চলে। এর বেশি নয়।
লুচি দিয়ে জড়ানো অমৃতসমান খাসির মাংস খাদ্যনালী বেয়ে যতই নামছে পাকস্থলীর দিকে, উল্লাস বেড়ে যাচ্ছে ততই। বিকেলের ঘটনার রেশটুকু ধীরে-ধীরে মুছে যাচ্ছে মন থেকে। এখন আর ও সব আজেবাজে কথা মনে রেখে লাভ নেই। যেভাবেই এসে থাক, ওগুলো টাকা! পকেটে টাকা থাকলে সব হয়। মানুষ যা চায় তাই পায়।
বুকপকেট হাতড়ে আর-একবার নোটগুলোর অস্তিত্ব বুঝে নেয় মতি। খড়খড়ে নোটদুটো গরমও যেন বেশ। নিজেরাই বুঝি উত্তাপ ছাড়ছে এখন! মনে-মনে হেসে আবার ডুবে যায় খাবারে। আশ্লেষে চোখ বুজে আসে তার।
পরের গন্তব্য মদের দোকান। অন্যান্য দিনের মতো আজ আর দেশি নয়। এফ এল টানবে। ফুর্তি যখন হচ্ছে পুরোদমেই হোক!
তার মনে পড়ে না, শেষ কবে পকেটে এতগুলো টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। বউয়ের ভাণ্ডার লুট করার সাহস নেই। নেশার উদ্রেক হলে মাঝে-মধ্যে ধান কাটার ঠিকে মজুর, ছাদ ঢালাইয়ের জোগাড়ের কাজ করে। তবে অলস বলে কুখ্যাতি আছে। কেউই তেমন ডাকে না কাজে। ফলে টাকার অভাবে নেশাটা ঠিক জমতে পারে না। তবে আজ আর কোনও বাধা নেই।
লুচি-মাংস সাঁটানোর পর ধীরেসুস্থে দাম মিটিয়ে সামনের বাটি খামচে মৌরি আর চিনির টুকরো মুখে ফেলে বেরিয়ে আসে রেস্টুরেন্ট থেকে। বাবুর কথা মনে হয় একবার। লুচি খেতে ভারী পছন্দ করে ছেলে। নেবে নাকি খানকয়েক প্যাক করে? পরমুহূর্তেই মনে হয়, নাহ্, থাক। অর্থের উৎস নিয়ে জবাবদিহি করতে হবে লাবণির কাছে। ধরা পড়ে যাব। তাছাড়া ছেলেটাও মায়ের দলে। বাড়িতে টিকটিকি-আরশোলার মতোই নকড়াছকড়া করা হয় তাকে। কেউ ফিরে তাকায় না... যাক, মরুক গে! এ পৃথিবীতে কেউ আপন নয়। বউ-ছেলেও নয়। দার্শনিক হয়ে
ওঠে মতি।
সুরাপর্ব সেরে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ে সে। ভেবেছিল রাতভর পান করবে। কিন্তু মদের চেয়ে অধিকতর উত্তেজক এক আয়োজনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এ জিনিস দেখার শখ অনেক দিনের। টিকিটের দাম চড়া। তবে কুছ পরোয়া নেই। একটা নোট এখনও পকেট গরম করে রেখেছে। ভাগ্যদেবী আজ প্রসন্ন। উপুড়হস্ত হয়ে একের পর এক সুযোগ দিয়ে চলেছেন। জীবনপুর যেতে হবে। কিলোমিটার পাঁচেক পথ। পা টলছে সামান্য। দক্ষিণী একটা আইটেম গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে এগিয়ে চলে মতি।
সাউন্ড বক্সের গান ভেসে আসছে, দেখা যাচ্ছে রঙিন আলোর ঝলকানি। প্রায় পৌঁছে গিয়েছে। বুক দুরুদুরু করছে এবার। এক-একবার মনে হচ্ছে, ফিরে যাবে?

একদিনেই এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।
“কাকা, শুনছেন?” ডানদিক থেকে কারও গলা পাওয়া যায়।
চাঁদ মেঘের আড়ালে। কাদাগোলা আলোয় ঢুলু-ঢুলু চোখে মনে হয় একটা কালো ছায়া মতির পাশে-পাশে হেঁটে চলেছে।
চোর-ছ্যাঁচ্চড় নয় তো! বুকপকেট খামচে ধরে অল্প জড়ানো গলায় সে জানতে চায়, “কী ব্যাপার? কী চাই?”
ছায়ামূর্তি মিহি গলায় বলে, “আজ্ঞে, যদি একটা উপকার করেন!”
যাক, তাহলে চোর-ডাকাত নয়। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে মতি। বলে, “ভাই রে, একটু তাড়ায় আছি। নাচ-গান বোধ হয় শুরু হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে!”
“আরে না না, সবে তো মাঝরাত! এসব নাচাগানা আরও একটু গভীর রাত না-হলে জমবে? নাচনেওয়ালিদের গায়ে কাপড়-টাপড় খানিকটা কম থাকবে শুনেছি!”
ছায়ামূর্তির আপাদমস্তক জরিপ করে তেমন কিছুই বোঝা যায় না। কণ্ঠস্বর শুনে বয়স একবার মনে হচ্ছে পঁচিশ, ফের মনে হয় পঞ্চান্ন।
“হ্যাঁ ভাই, তাই তো পড়ি কি মরি করে দৌড়চ্ছি। তোমার উপকারটা যদি পরে একদিন... তাছাড়া আমি বাপু নগণ্য প্রাণী। আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু!” বলে মতি।
“আপনি পারবেন বলেই এই মাঝরাত্তিরে এতটা পথ ঠেঙিয়ে আসা। আজ কেবল সমস্যার কথাটা শুনে নিন। তার পর ড্যান্স দেখুন মন দিয়ে। বাকি কাজ কাল করলেই চলবে।”
“আচ্ছা, শর্টে বলো।” মতি অস্থির হয়ে ওঠে। মাঝরাত্তিরে রাস্তা ঘিরে এ কী আপদ! ওদিকে আবার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল না তো! এই ধরনের প্রোগ্রাম দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবে শুনেছে, বিরাট দাগের জিনিস। গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়,
রক্ত উঠে যায় মাথায়। তখন নার্ভ ঠান্ডা করার জন্য একটু করে মদ খেতে হয়। আধা ভর্তি একটা বোতল বগলে গুঁজে এনেছে সেই উদ্দেশ্যে।
“আমি আসলে এক গরিব বেকার যুবক।” ছায়ামূর্তি বলে।
“তা আমার কাছে কেন বাপু! আমি কি পকেটে চাকরি নিয়ে ঘুরছি?” খেঁকিয়ে ওঠে মতি।
“আহা, দয়া করে রাগ করবেন না। বুঝতে পারছি আপনার দেরি হচ্ছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী সে জন্য।”
“ধুর শালা! আসল কথাটা বলবে তো! গরিব বেকার যুবক, পকেটে টাকা নেই, বাড়িতে বউ নেই। ন্যাংটো মেয়েছেলে দেখতে চাও। এই তো? তাহলে চলো সঙ্গে। আমি দেখাব।”
ছায়ামূর্তি লজ্জিত গলায় বলে, “আরে ছি, ছি! এ সব কী কথা! আসলে, টাকাগুলো খুব দরকার। সামান্য ক’টা টাকা। আপনি তার মধ্যেও কিছুটা খরচ করে ফেলেছেন। তবু যা আছে
সেটুকুই অনেক।”
মতি চমকায়। এত কথা এই লোক জানল কী করে? অনুসরণ করছিল নাকি! নেশাটা চটকে যায় তার। সাবধানী গলায় বলে, “কে তুমি?”
“ভয় পাবেন না। নেহাতই নিরীহ টিউশন-মাস্টার আমি। আজই মাইনে হয়েছে। টাকাগুলো নিয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি। বিমলের বেঞ্চিতে বসেছিলাম। ফোন থেকে একটা কল করার প্রয়োজন ছিল। মানিব্যাগ খুলে চিরকুটে লেখা নম্বরটা বের করে ব্যাগটা বেঞ্চিতেই রেখে দিই। তার পর বেমালুম ভুলে গেছি ওটার কথা। আসলে এত রকমের চিন্তা... সে যাক, আপনি কাল ভোরে বিমলের দোকানে বাকি টাকাগুলো নিয়ে এলেই হবে।”
ছায়ামূর্তির বক্তব্য পরিষ্কার। টাকাগুলো ওর লক্ষ্য। নিশ্চয়ই বিকেলের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। টাকার ভাগ চায়। গপ্পো ভালই ফেঁদেছে। একটা ভয়ের শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়ে মতির শরীর জুড়ে। বুকপকেট চেপে সে দৌড়তে থাকে আলোকপুঞ্জ লক্ষ করে।

হাঙ্গামার আসরে ঢুকতে খানিক দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। ভিড় সরিয়ে মঞ্চের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছিল মতি। কমবয়সি ছেলেগুলো তাকে উদ্দেশ করে আওয়াজ দেয়, “দাদুর তো খুব রস! বুড়ো বয়সে এত উত্তেজনা সইবে তো?”
মাথাজোড়া টাক, তোবড়ানো গাল, নারকেল দড়ির মতো শুঁটকো পাকানো চেহারার মতিকে পঁয়তাল্লিশেই পঁয়ষট্টি দেখায়।
ফচকে ছেলেপুলের রসিকতা অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে একটা জায়গা দখল করে বসে পড়ে সে।
বাঁশবনের মধ্যে বাঁধা মাচার উপরে তিনটে মেয়ে নাচানাচি করছে। থেকে থেকেই ঢেউ তুলছে কেউটে সাপের মতো হিলহিলে শরীরে। নাচের স্টেপ এমনই, যাতে দেহ সঞ্চালনের সঙ্গে-সঙ্গে খোলামেলা প্রত্যঙ্গগুলো ঝলসে ওঠে। মতির চোখ গোল্লা গোল্লা। এই তাহলে হাঙ্গামা!
হঠাৎ ডানদিকে চোখ যেতেই... বিকাশ! তাদের পাড়ার টোটোচালক। চোখাচোখি হতেই মুখে গামছা জড়িয়ে নিয়েছে। পরস্পরকে যখন চিনেই ফেলছে লজ্জা কীসের! এগিয়ে গিয়ে বিকাশের পাশে বসে পড়ে মতি। বিকাশ ফিসফিস করে বলে, “মতিকাকা, আমার কথা কাউকে কইবনি! মা জানলে পিঠের চামড়া তুলি লিবে।”
মতি আশ্বস্ত করে তাকে। বলে, “প্রোগ্রাম শেষ হিলে আমাকে ঘর পৌঁছি দিবু।” আসলে একা ফিরতে সাহস হয় না। ছায়ামূর্তিটা নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে!
“এর আগে হাঙ্গামা দেখচু?” মতি জানতে চায়।
“ঔ প্রথম!”
“অ! লে লে, মাল খা।” মদের বোতল বের করে মতি।
ঢিমেতালে খানিকক্ষণ নাচাগানা চলার পর উত্তপ্ত হয়ে উঠে আসর। নর্তকীরা এবার যেন একটু বেহায়া। তাদের দেহবিভঙ্গে আদিম খেলার হাতছানি। দু’-একটা ছোঁড়া মঞ্চে উঠে কোমর দুলিয়ে আসছে মেয়েগুলোর সঙ্গে। কয়েকজন টাকা উড়িয়ে উৎসাহিত করছে নর্তকীদের। অনেকে আবার নাচের দৃশ্য মোবাইলে বন্দি করতে ব্যস্ত।
হঠাৎ গানের লয় বদলে যায়। মেয়েদের উপর আছড়ে পড়ে রংবেরঙের বুটিদার আলো। মতি অবাক হয়ে দেখে, গানের তালে তালে পোশাক খুলতে শুরু করেছে মেয়েরা। দর্শক হইহই করে ওঠে।
মতির গায়ে সারি-সারি পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষাঙ্গ থেকে একটা তরঙ্গ তৈরি হয়ে বিবশ করে দিচ্ছে তাকে। মদ গিলতে থাকে সে।
বুক আর কোমরে দু’-টুকরো স্বচ্ছ আবরণ জড়িয়ে স্বপ্নালু আলোছায়া মেখে নেচেই চলেছে মেয়েরা।
এই বুঝি স্বর্গ!

মতি যখন বিকাশের টোটো থেকে নামল, পুব আকাশে তখনও আলো ফোটেনি। থেকে-থেকেই পেটটা গোলাচ্ছে। বাড়ির দাওয়ায় কোনওমতে পৌঁছেই হড়হড় করে বমি উগরে দেয় সে। অর্ধপাচিত লুচি, মাংস, মদ তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে আসে। বিকট ঝাঁঝালো গন্ধের চোটে বোধ হয় আরও এক দফা বমি হয়।
আলো হাতে বউ-ছেলে বেরিয়ে এসেছে। পেটটা আবার মোচড় দেয়। তবে এবার নিম্নগামী বেগ। সে করুণ চোখে বউয়ের দিকে তাকায়, ইশারা করে পেট দেখিয়ে। লাবণি তাকে দু’হাতে ধরে নিয়ে যায় শৌচঘরে।

তিনটে বমি ও পাঁচবার মলত্যাগ করে বিছানায় আছড়ে পড়ে মতি। ঘরের জিনিসপত্র বনবন করে ঘুরছে। চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় পড়ে থাকে। গুরুপাক খাবার, মদ, রাত্রি জাগরণ... অনভ্যস্ত শরীর কি আর এতটা ধকল সইতে পারে!
এক গেলাস জলে নুন আর চিনি গুলে এনেছে লাবণি। অতি কষ্টে মাথা তুলে চোঁ-চোঁ করে সেটুকু শুষে নেয়।
সারা রাত বেপাত্তা ছিল, তবু বউয়ের জেরার মুখে পড়তে হয়নি। উল্টে সেবাযত্ন পাচ্ছে। অসুস্থ বলে ছাড় বোধ হয়। তবে লাবণির মুখ বন্ধ। চিরকালই কম কথা বলে। শেষ দশটা বছর আচরণ আরও শীতল।



মতি চমকায়। এত কথা এই লোক জানল কী করে? অনুসরণ করছিল নাকি! নেশাটা চটকে যায় তার। সাবধানী গলায় বলে, "কে তুমি?"

বউয়ের চোখের দিকে তাকালেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে মতির। চোখদুটো যেন আগুনভর্তি মালসা! মনে হয় সামনের মানুষটার অন্তর অবধি পড়ে ফেলছে অনায়াসে। ছোটখাটো নরমসরম শরীরটার মধ্যে এত তেজ! লাবণির সামনে দাঁড়ালে নিজেকে নগ্ন মনে হয় তার।
লাবণি ফুর্তির টাকার উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলে মিথ্যা বলতে পারবে না। ওই মেয়েমানুষের সামনে মিথ্যা বলা যায় না। নিজে যেমন সততার পরাকাষ্ঠা, বরের থেকেও তেমন আচরণই প্রত্যাশা করে।
কাজু প্রসেস করতে গিয়ে বীজ ভেঙে গেলে প্যাকেটে দেওয়া যায় না। কোনও মূল্য নেই সেগুলোর। অনেকেই ভাঙা কাজু মালিককে ফেরত না দিয়ে আঁচলে ভরে আনে। মালিকও অবগত এ বিষয়ে। মতি একবার বলে ফেলেছিল, "তুমিবি তো ভাঙা বিচা লেসতে পারো ঘরে!"
উত্তরে ঠান্ডা গলায় লাবণি শুধু বলেছিল, "এর পর কুনোদিন যদি ওউ কথা শুনচি, বাবুকে লিকি বারি যাবা ঘরনু।"
আর কথা বাড়ায়নি মতি। এ ধরনের দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি আছে। বলতে গেলে আর-একটা মহাভারত হয়ে যাবে।
এখন শুয়ে-শুয়ে এ সবই ভাবছিল সে। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে টাকাগুলো আপদ। লোভ করা ঠিক হয়নি। লাবণি জানলে কুরুক্ষেত্র হবে। যদিও কাল মস্তি ভালই হয়েছে, তবু অস্বস্তিটাকে শেকড় ধরে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা যাচ্ছে না। পিছনে একটা লোকও লেগেছে। সবমিলিয়ে খচখচ করছে মনটা।

পরদিন শরীরটা একটু ভাল ঠেকতেই সন্ধেবেলা মদের নেশাটা ফের চাগিয়ে ওঠে। দুটো নোট পকেটে পুরে সোজা এফ এল শপে। সকালবেলাটা একবার ঘুরে এসেছে বিমলের দোকান থেকে। বার বার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি মানিব্যাগের আসল মালিক এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরল! বেশিক্ষণ বসতে পারেনি। বাড়ি এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে যেন।
এখন গলা অবধি মদ গিলে টলোমলো পায়ে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এল সে। ভরপেট মদ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। মতির বেলায় সেটা হল যৌন উত্তেজনা। মদ খেয়ে মেয়েছেলের শরীর রগড়াতে ইচ্ছে করে, বুকের মধ্যে দাপায় বীরপুরুষ সাজার বাসনা।
যৌনতা ব্যাপারটা অনেক আগেই জীবন থেকে চুকেবুকে গিয়েছে। লাবণি তখন সদ্য কাজে ঢুকেছে আর সে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকার হয়ে। একদিন বউয়ের মাইনের টাকা থেকে পঞ্চাশের একটা নোট বের করে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে। উত্থিত পৌরুষের তাড়নায় কোনও ভূমিকা ছাড়াই লাবণিকে সর্বশক্তি দিয়ে দেওয়ালে চেপে ধরে ধামসাতে শুরু করেছিল। প্রথম কয়েক সেকেন্ড সহ্য করলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল লাবণি। সপাটে একটা থাপ্পড় কষিয়েছিল বরের গালে। বাবু তখন ছোট, দুধ ছাড়েনি মায়ের। হুটোপাটির শব্দে ঘুম ভেঙে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সে। লাবণি আরও দু'-তিনটে চড় কষায়।
দমানো হ্যারিকেনের রহস্যময় আলো-আঁধারিতে বউয়ের মুক্তকেশী দিগ্বসনা চণ্ডরূপ দেখে হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছিল তার। সেই শেষবার। বউয়ের দিকে এগোবার আর সাহস হয়নি।
ড্যান্স হাঙ্গামাটা দেখার পর থেকেই মরা গাঙে জোয়ার খেলছে। আজ দুপুরে হস্তমৈথুন করেছে অনেকদিন পর। এই মুহূর্তেও প্রবল যৌনতৃষ্ণা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শরীরে।
মূত্রত্যাগের বেগ আসছে! মদের দোকানের পেছন দিকে একটা অন্ধকার মতো জায়গা দেখে বসে পড়ে মতি। উঠতে যাবে... একটা লোক! কানের কাছে ফিসফিস করে লোকটা বলে, "ভাল স্টক আছে। রেট বেশি নয়, ঘণ্টায় সাড়ে সাতশো!"
কথাগুলোর মর্মার্থ বুঝতে একটু সময় লাগে। তার পর প্রায় লাফিয়ে ওঠে সে, "কোথায় যেতে হবে?"
"আরে! করেন কী? আস্তে, আস্তে," লোকটা নাকে তর্জনী ঠেকিয়ে বলে, "ওই যে, খালপাড়ে মুরগির খামার। তার পাশ দিয়ে চলে যান। দরজায় আলতো ঘুঁষি মারবেন, তার পর তিনটে টোকা। এভাবে না-ডাকলে দরজা খুলবে না কিন্তু! পছন্দমতো আইটেম নিয়ে ঘরে সেঁধিয়ে যাবেন। নেক্সট একঘণ্টা যা খুশি করুন... নিন, টাকাটা ছাড়ুন এবার!"
লোকটার কাছে টাকা জমা দিয়ে খালের দিকে এগিয়ে যায় সে। কাঠের একটা সেতু পেরোতে হবে।
লাবণি ছাড়া অন্য কোনও নারীগমন এই প্রথম। কাজটা ঠিক হচ্ছে তো? আবার অস্বস্তিটা পাকিয়ে উঠছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। থম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার পর 'দূর শালা, যা হয় হোক' বলে হাঁটা লাগায়। মানুষের শরীর বলেও তো একটা ব্যাপার


আছে!
সেতুতে প্রথম পদক্ষেপটা রাখতেই পিছন থেকে কে যেন বলে, "এই যে দাদা, শুনছেন? আমার টাকাগুলো যদি ফেরত দিতেন..." চমকে পিছনে ফিরে মতি বোঝে, সেদিনের সেই ছায়ামূর্তি। সুবিধামতো অন্ধকার একটা ঘুপচি জায়গা নির্বাচন করে দাঁড়িয়েছে, প্রকাশ্যে আসতে চায় না। আশ্চর্য! লোকটা এখনও তার পিছু ছাড়েনি।
"তোমার টাকা! প্রমাণ দিতে পারবে?" জড়ানো গলায় জানতে চায় মতি।
"তা পারব না! তবে আপনি দয়া না-করলে আমার বউটা যে বাঁচবে না!" কাতর গলায় বলে ছায়ামূর্তি।
"বউ! তোমার বউ আছে নাকি? সেদিন বলোনি তো!"
"সেদিন? এর আগে কি আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে?" ছায়ামূর্তি অবাক।
এই লোকটার সঙ্গেই তো কথা হল! গরিব টিউশন-মাস্টার। অস্বীকার করছে কেন? না কি আর-এক প্রত্যক্ষদর্শী! কতজন সাক্ষী আছে সেদিনের ঘটনার! সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মদটা কি খুব বেশি গেলা হয়ে গিয়েছে আজ! আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে সে। বলে, "তুমি গরিব মাস্টার নও?"
"আমি গরিব ঠিকই, তবে মাস্টার নই। ছোটখাটো একটা ব্যাঙ্কে কাজ করি। বউটা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ওষুধগুলো কিনতেই হবে। সেদিন বন্ধুর কাছ থেকে টাকাগুলো ধার করে ফিরছিলাম। বিমলের দোকানের কাছে পৌঁছতেই বৃষ্টি এল..."
বাকি গল্প আগেও শুনেছে মতি।
"আপনি দয়া করে বাড়ি চলুন, যে ক'টা টাকা টিনের বাক্সে আছে, সেটুকুই ফেরত দিন। আপাতত ওতেই চলে যাবে," আবার বলে ছায়ামূর্তি।
'টিনের বাক্স' শব্দবন্ধটা যেন মস্তিষ্কে বজ্রাঘাত করে! নিজের বাড়ির মধ্যে কোথায় টাকাগুলো গচ্ছিত রেখেছে, তাও জেনে বসে আছে এই লোক! গায়ে কাঁটা দেয়। বিপজ্জনক এই লোকের সংস্পর্শে আর এক মুহূর্তও নয়। পালাতে হবে।
সেতু ধরে দৌড়নোর চেষ্টা করে সে। বৃষ্টিতে ভিজে পিছল হয়ে ছিল কাঠ, পা হড়কে রেলিংবিহীন সেতু থেকে সিধে খালের মধ্যে ঝপাং!
খালপাড়েই পোলট্রিঘর। ভয় পেয়ে মুরগিগুলো তারস্বরে কোঁ-কোঁ করতে থাকে। ভীষণ একটা শোরগোল পড়ে যায়। আলো হাতে দৌড়ে আসে লোকজন।
খালে বিশেষ জল নেই, তবে নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। হাঁটুজলেই হাবুডুবু খেতে থাকে মতি। পচা জল ঢুকে যায় পেটে। চারিদিকে যেন কালিগোলা অন্ধকার। তীব্র একটা ভয় আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরে তাকে। আজই কি শেষ দিন? মনে হয় জলের মধ্যে থেকে কেউ যেন পা দুটো ধরে টানছে। অতল অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে জ্ঞান হারায় সে।

দু'দিন পরে বাড়ির দালানে বসে ছিল মতি। এর মধ্যে আর বাড়ি থেকে বেরয়নি। বউ-ছেলের অনুপস্থিতির সময়টা দরজা-জানলা এঁটে মশারির মধ্যে শুয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কাটিয়ে দিয়েছে। খালে পড়ে যাওয়া ইস্তক আতঙ্কটা কাটছে না। কিছু একটা ঘটছে যা তার ধারণার বাইরে।
লাবণি একবার জানতে চেয়েছিল, "কী হিচে? ঘরে বুসি আছ কেনি?" ভিজেবেড়াল সেজে না-শোনার ভান করে থেকেছে। লাবণিও আর ঘাঁটায়নি।
পাঁচশোর বাকি ছ'খানা নোট নিয়ে কী করা যায়, এই দু'দিন অনেক ভেবেছে সে। ফূর্তিফার্তা আপাতত বন্ধ। লোকজন নজর রাখছে তার উপর। এদের বোধ হয় একটা দল আছে। টাকাগুলো কি ফেরত দেবে? কাকেই বা দেবে? লোকগুলো রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে অনুসরণ করছে, তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জেনে বসে আছে! আচ্ছা, এরা কি আদৌ মানিব্যাগের আসল দাবিদার? তাহলে দিনের বেলা বুক ফুলিয়ে সামনে আসছে না কেন? এত লুকোছাপা কীসের বাপু! যত ভাবছে ততই ঘেঁটে যাচ্ছে মাথাটা।
কাদাগোলা জলের মতো সন্ধে নামতে শুরু করেছে। বাড়ির সামনের রাস্তাটার ওপারে ঝাঁকড়া গাছগুলোর তলায় ঝুপসি অন্ধকার। হঠাৎ মনে হয়, আমগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটা মানুষের অবয়ব। লোকটার দৃষ্টি এ দিকেই। অপেক্ষা করছে। মতি বেরলেই...
বুকটা ধক করে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে মশারিতে ঢুকে পড়ে সে।

"আপনি তো আচ্ছা ধড়িবাজ লোক! টাকাগুলো ফেরত দেওয়ার নামই করছেন না!"
মতির মাথায় কোনও জবাব জোগায় না। জিভটাও অসাড়।
লোকটা এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, আলো গিয়ে পৌঁছচ্ছে তার গলা অবধি। মাথাটা অন্ধকারে। কবন্ধ একটা মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাকে। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকেই সে বলে, "দেখছেনই তো আমি পঙ্গু! দুর্ঘটনায় মাথাটা উড়ে গিয়েছে। এই গরিব প্রতিবন্ধীর টাকা মারতে আপনার একটু বাধল না!"
"আমি... আমি তো..." তোতলাচ্ছে মতি।
এবার লোকটার গলা বেয়ে কালচে রক্ত গড়িয়ে নামতে শুরু করে। বীভৎস দৃশ্য! তীব্র আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে মতি। বাপ রে, কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! বিছানার চাদর ভিজে গিয়েছে ঘামে। উঠে বসে হাঁপাতে থাকে সে।
চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছে লাবণির। বরের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। লাবণিকে দেখে শরীরে যেন বল আসে তার। লাফিয়ে উঠে বউয়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশুর মতো হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে।
লাবণি তাকে সময় দেয়, আলতো করে হাত ঘষে দেয় পিঠে।
"খারাপ স্বপ্ন দেখল?" নরম গলায় জানতে চায়। দশ বছরে এই প্রথম।
"শুই পড়, মাথায় হাত বুলি দেইটি আমি।" আবার বলে সে।
বউয়ের তরফ থেকে শীতল ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত মতি কুঁকড়ে যায়। বউয়ের এহেন স্নেহশীল আচরণ তার অসহায়তাটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ ক'দিন যা-যা ঘটিয়েছে সে সব জানলে লাবণি বোধ হয় আর মুখদর্শন করবে না তার। বউয়ের সেই নগ্নিকা রণচণ্ডী মূর্তির কথা ভাবলে আজও বুক শুকিয়ে যায়।
সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, টাকাগুলো তাদের আসল মালিকের কাছে পৌঁছে না-দেওয়া অবধি নিস্তার নেই। বাড়িতে লুকিয়ে লোকগুলোকে এড়ানো আর সম্ভব নয়। এবার তারা মাথার মধ্যে বাসা করেছে, স্বপ্নে হানা দিচ্ছে। কাল থেকে টাকা নিয়ে বিমলের দোকানে বসে থাকবে দিনভর, তার পর যা হয় হোক। এই মানসিক যাতনা আর সহ্য হয় না।
কিন্তু চারটে নোট খরচ হয়ে গিয়েছে। সেগুলো ফেরত দেবে কী করে? সেই তো লাবণির কাছে চাইতে হবে, ঘটনার আদ্যোপান্ত জানাতে হবে। তার পর কী দশা হবে তার? এখন শ্যাম রাখে না কুল! লাবণি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তবু দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না মতি। ছটফট করতে থাকে ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতো।
'আমি গরিব মাস্টার', 'আমার বউ হাসপাতালে', 'প্রতিবন্ধীর টাকা মারতে একটুও বাধল না'... নাম-সংকীর্তনের মতো পর্যায়ক্রমে বেজে চলে মাথার মধ্যে। নিরন্তর বেজেই চলে...

অলংকরণ: রৌদ্র মিত্র

উৎসবের সাজ-সমাহার



অভিনয় জগতে চরিত্রের খাতিরে যেমনই সাজতে হোক না কেন, পুজোতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্টাইল পছন্দ অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তীর। পুজোয় তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্ট তুলে ধরলেন মৌমিতা সরকার।



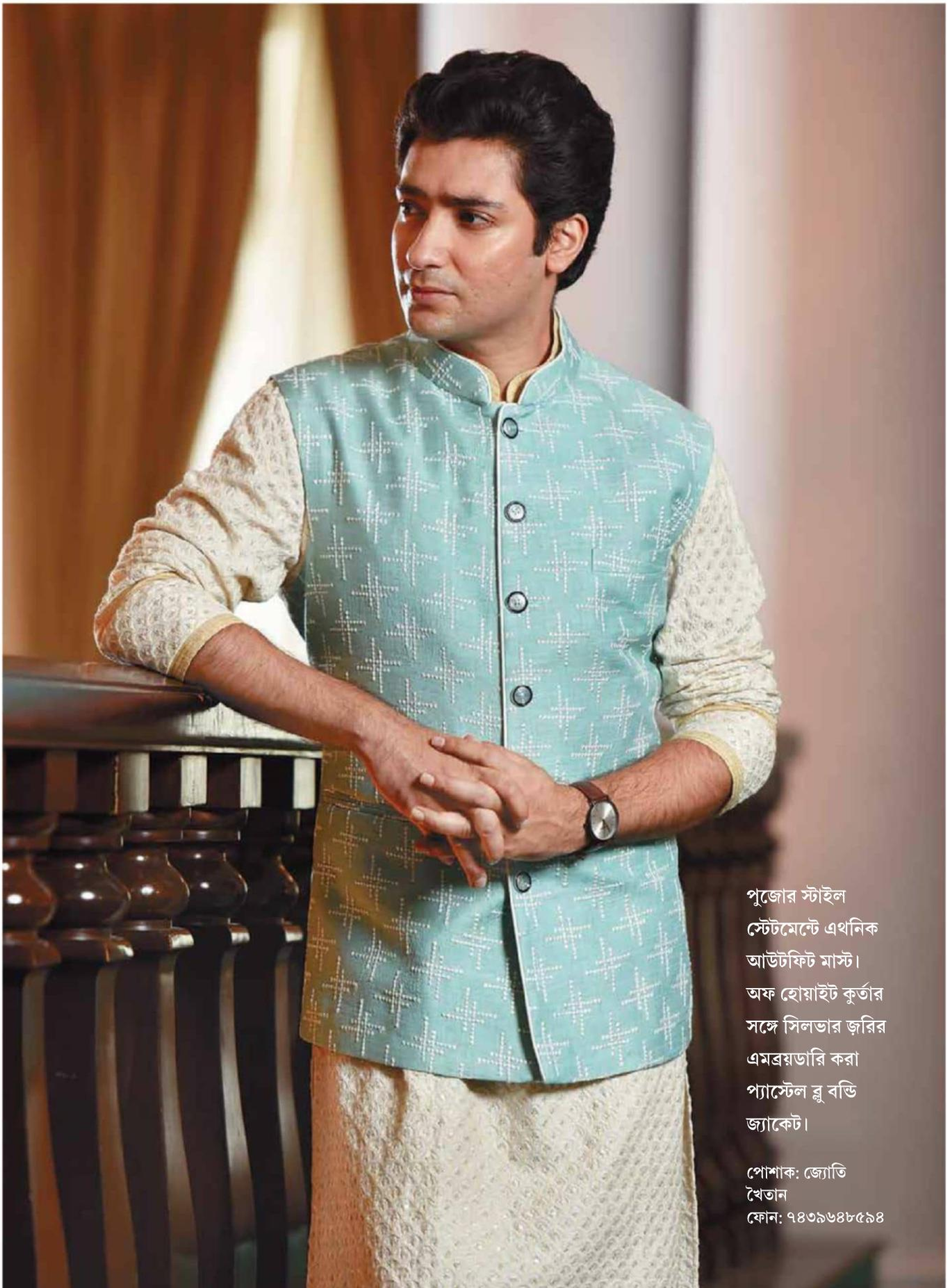
(বাঁদিকের পাতা)
বছরের অন্য দিনগুলোর থেকে পুজোর দিনগুলো একদম অন্যরকমভাবে কাটান তিনি। তাই গৌরব পরেছেন লাল সাদা কম্বিনেশনে সিল্কের পাঞ্জাবি। সঙ্গে চওড়া পাড়ের লাল ধুতি।
পোশাক: আনন্দ
ফোন: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

উজ্জ্বল লাল বন্ধগলা জ্যাকেট। পকেটের প্রিন্ট প্যাটার্ন দেয় ট্রেন্ডি লুক। টিম-আপ করেছেন ক্যাজুয়াল ব্লু ডেনিমের সঙ্গে।
পোশাক: অভিষেক দত্ত
ওয়েবসাইট: www.abhishekdutta.in



উৎসবের সন্ধ্যায় পরিবার ও বন্ধুদের সমাগমে গাঢ় নীল ফর্মাল টাক্সেডো সুট পছন্দ গৌরবের।

পোশাক: রাতুল সুদ
পার্ক স্ট্রিট
ফোন: ৯১৬৩৪৬৯৯৮৬



পুজোর স্টাইল স্টেটমেন্টে এথনিক আউটফিট মাস্ট। অফ হোয়াইট কুর্তার সঙ্গে সিলভার জ়রির এমব্রয়ডারি করা প্যাস্টেল ব্লু বন্ডি জ্যাকেট।

পোশাক: জ্যোতি খৈতান
ফোন: ৭৪৩৯৬৪৮৫৯৪



খুব শান্ত স্বভাবের হলেও ফ্যাশনে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করেন তিনি। ডেনিম প্যাচওয়র্ক করা সুতির ধুতি পাঞ্জাবিতে গৌরবের পুজোর সাজ।

পোশাক: ডেনিম দর্জি
ফোন: ৯৮৩৬৮৫৭৬৬৬



গ্লিটারের কাজ করা
সাদা বম্বার্ড জ্যাকেটে
ইন্দো ওয়েস্টার্ন লুক।
পুজোয় বন্ধুদের
সঙ্গে জমাটি আড্ডার
আসরের জন্য
পারফেক্ট ম্যাচ।

পোশাক: রাতুল সুদ

মেক-আপ ও হেয়ার:
অনিরুদ্ধ চাকলাদার
ফোন: ৯৮৩০০৩৯৬৯৯
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
লোকেশান: দ্য ওবেরয়
গ্র্যান্ড, কলকাতা
ফোন: ০৩৩২২৪৯ ২৩২৩
ছবি: শুভদীপ ধর
রূপায়ণে: বৈশালী সরকরা



আগুনের মেয়েরা

দুর্জয় সাহস তাঁদের। ইস্পাতের মতো দৃঢ় সংকল্প। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্র যখনই অন্যায়, অত্যাচারের খড়্গ শানিয়েছে, রুখে দাঁড়িয়েছেন এই বিপ্লবী কন্যারা। স্মরণ করলেন তন্ময় চক্রবর্তী।

১৯৪৩ সাল। নাৎসি বাহিনী ঢুকে পড়েছে নেদারল্যান্ডসে। সেনাবাহিনী দ্রুত দখল করছে শহর। আমস্টারডাম ইউনিভার্সিটিতে ভারী বুটের শব্দ। জার্মান বাহিনী এক আশ্চর্য শর্ত আরোপ করল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর। শর্ত মিত্রতার। কিন্তু আদতে তাদের হুকুম মেনে চলতে হবে। দমবন্ধ করা ভয়ের পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের এক অন্ধকার কোণ। দুই ইহুদি ছাত্রের সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিল একটি মেয়ে। তখন সারা পৃথিবীতে ইহুদিদের উপর চলেছে অন্যায় অত্যাচার। মেয়েটি আশ্চর্য কঠিন। জার্মান সৈন্যদের সেই শর্তে সই তো সে করলই না, বরং দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করল। ফল যা হয় তা-ই। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল তাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে নাৎসি পার্টি বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিল। যোগ দিল নেদারল্যান্ডস কমিউনিস্ট পার্টির সহায়ক সংগঠন, কাউন্সিল অফ রেজিস্ট্যান্স-এ। মেয়েটির সুবিধে ছিল এই যে, সে সুন্দর জার্মান ভাষা বলতে পারত। ফলে জার্মান সেনাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল। সংগঠনের সহযোদ্ধাদের কাছে তার গোপন ডাকনাম ছিল ‘হানি’। আসল নাম হানি শাফট। জার্মান শত্রুপক্ষের কাছে সে ছিল লাল চুলের মেয়ে। নাৎসি বাহিনীর হিট লিস্টে একদম প্রথমের দিকেই নাম ছিল এই গেরিলা যোদ্ধার। এক দিন রাতে এক হত্যাকাণ্ডে আহত হয় তার এক সহযোগী। আহতকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে এক ডাচ নাৎসি নার্সকে হানির আসল পরিচয় বলে দেয় সেই সহযোগী। মধ্য রাতে হানাদার সৈন্যরা হানা দেয় মেয়েটির বাড়িতে। হানি পালিয়ে গেলেও তার বাবা-মাকে গ্রেফতার করে সৈন্যরা। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় তাদের। কিছু দিন গা ঢাকা দেয় হানি। তার পর সুযোগ বুঝে সে আবার ফিরে আসে। নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা বিলি, অস্ত্র পাচার, নাৎসিবিরোধী কার্যকলাপে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। জার্মান সেনারা যাতে তাকে না চিনতে পারে, সে জন্য নিজের লাল চুল কালো করে ফেলে।
মার্চ, ১৯৪৫। যুদ্ধের হাওয়া যখন অন্য মোড় নিচ্ছে, তখনই নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পত্রিকা বিলির অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা। অকথ্য অত্যাচার। বিচারে মৃত্যুদণ্ড। গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে। দু’জন নাৎসি সেনা গুলি চালিয়েছিল। প্রথম গুলিটি গায়ে লাগার পর সে আহত হয়। চিৎকার করে বলে ওঠে, “আমি তোমার চেয়ে ভাল গুলি চালাতে পারি!” তখনই দ্বিতীয় গুলিটি এসে তার গায়ে লাগে। মৃত্যু হয় এই সাম্যবাদী বিপ্লবী গেরিলা যোদ্ধার। ইতিহাস বলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রায় চারশো জন গেরিলা বিপ্লবীকে চিহ্নিত করা হয়। এঁদের মধ্যে হানি শাফট ছিলেন এক মাত্র মহিলা। মৃত্যুর পর যদিও সে দেশের রানি তাঁকে ‘প্রতিরোধের প্রতীক’ বলে সম্মানিত করেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির পতনের পর তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয়। ইতিহাসের আকাশে মেঘের রূপ ঘন ঘন বদলায়। হার্লেম শহরের



কেনিউ পার্কে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে হানির স্মারক স্তম্ভ। সে দেশে অনেক স্কুল আর রাস্তা তার নামে। মেয়েটির বিপ্লব যে ব্যর্থ হয়নি, তা প্রমাণিত।

রাজনৈতিক আন্দোলনে তখন উত্তাল ফ্রান্স। পারী কমিউন। ব্যারিকেড। ভয়ঙ্কর মারামারি। কমিউনারদের চিকিৎসা করতে লেগে গেলেন একটি মেয়ে। তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে তাঁকে কোনও স্কুলে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। তিনি ছিলেন বোনাপার্টিস্টদের তীব্র বিরোধী। যে বিপ্লবীর সঙ্গে থাকতেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তাঁর উদ্দেশে বিদায়ী কাব্য রচনা করেছিলেন। তখন রাষ্ট্রের ঘোরপ্যাঁচ বড় বেশি। হঠাৎ করেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা ,ষড়যন্ত্র, নাগরিকদের অন্যায় উস্কানি দেওয়া, সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করার অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে সাজা, মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু বাস্তবে বন্দি দশা। তার পর কুড়ি বছরের দ্বীপান্তর। বিপ্লবের আর-এক নাম লুইজ় মিশেল।

দেশের মাটিতে চোখ ফেরানো যাক। নীলকর সাহেব টমাস আইভান কেনি। চরম অত্যাচারী। তাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্যারিসুন্দরী দেবী। প্যারিসুন্দরী আসলে তাঁর পিতার জমিদারির অংশ পেয়েছিলেন। এক দিন হঠাৎ সাহেবের লাঠিয়াল প্যারির একটি কুঠিবাড়ি দখল করে নেয়। প্যারিসুন্দরী ডাক দেন কৃষক সংগ্রামের। হিন্দু, মুসলমান, চাষি, মজুর, সকলকে একজোট করে মধ্য রাতে অতর্কিতে আক্রমণ করেন কেনি সাহেবের কুঠি, দখল করে নেন। সাহেব কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্যারিসুন্দরীকে জ্যান্ত ধরে আনতে পারলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। প্যারিসুন্দরীও পাল্টা ঘোষণা করেন, সাহেবের মাথা যে এনে দেবে তার ইনাম এক হাজার টাকা। এর মধ্যেই প্যারিসুন্দরী আবার কেনির কুঠি আক্রমণ করেন। সাহেব পালিয়ে যান। কিন্তু দারোগা মহম্মদ বক্স খুন হন প্রজাদের হাতে। এর পর সরকারি মামলা। বিচারের নামে প্রহসন। ইংরেজ সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। আইনি যুদ্ধের পর তার সামান্য অংশই ফেরত পান প্যারি। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্যারিসুন্দরীর বিদ্রোহকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের এক অদৃশ্য আগুন বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে তখন অগ্নিযুগ। বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠনগুলি ভীষণ ভাবে সক্রিয়। সদ্য শহিদ হয়েছেন ক্ষুদিরাম। ঠিক সেই সময়ই যুদ্ধে এগিয়ে এলেন একটি বিধবা মেয়ে। সারা দিন বসে সুতো কাটতেন। আর অন্ধকার গাঢ় হলেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দিতেন বিপ্লবীদের ডেরায়। গোপন খবর সংগ্রহ করা, জেলবন্দি কর্মীদের সঙ্গে বাড়ির লোক সেজে দেখা করা... এ ভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য। এই পথে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন চরমপন্থী যুগান্তর পার্টির নেতা, তাঁরই ভাইপো, বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৫ সাল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে বালাসোর হাসপাতালে মারা গেলেন বাঘাযতীন। কলকাতাতে শুরু হল মধ্য রাতে পুলিশি ধরপাকড়। এমনই এক অতর্কিত হানায় ধরা পড়ে গেলেন



বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার। পুলিশ তাঁকে ধরল বটে, কিন্তু তাঁর মাউজ়ার পিস্তলটি খুঁজে পেল না। রামচন্দ্রের স্ত্রী সেজে ঘোমটা দিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন দুঃসাহসী ননীবালা। মাউজ়ার পিস্তলের সন্ধান মিলল। কিন্তু তার পিছনে লাগল গোয়েন্দা পুলিশ। রিষড়া থেকে চন্দননগর। সেখানে বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বেনামে বাড়ি ভাড়া করলেন। সেখানে থাকতেন সেই সব বিপ্লবী, যাঁদের নামে পুলিশ হুলিয়া জারি করেছিল। এক দিন পুলিশের নজর পড়ল বাড়ির কর্ত্রী ননীবালার উপরে। তিনি পালিয়ে গেলেন পেশোয়ারে। বেআইনি অস্ত্র রাখা, বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে ননীবালা যখন গ্রেফতার হলেন তখন তিনি কলেরা আক্রান্ত। তাকে আনা হল কাশীর জেলে। শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার। এমনকি, জেলের জমাদারনিকে দিয়ে গায়ে লঙ্কাবাটাও লাগানো হয়েছিল। সীমাহীন অত্যাচারের পরেও যখন তাঁর মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না, তখন জেলের অত্যাচারী সুপার তাঁকে আলো-বাতাসহীন অন্ধকার, ভূগর্ভস্থ সেলে একাকী আটকে রাখল। তা-ও ননীবালার মুখ দিয়ে বিপ্লবীদের কোনও খবরই বেরোল না। এর পরের ঠিকানা আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। অনশন শুরু করলেন ননীবালা। অনশন ভাঙার শর্ত হিসেবে সাহেবকে বললেন, বাগবাজারে রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী সারদা মায়ের কাছে তাঁকে রেখে আসতে হবে। সাহেব তাঁকে সেটা চিঠিতে লিখে দিতে বলল। ননীবালা সে চিঠি লেখার পর সাহেব তা ছিঁড়ে ফেলে দিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে। বিপ্লবী ননীবালা সপাটে চড় বসালেন সাহেবের গালে। রাজবন্দি হিসেবে প্রেসিডেন্সি জেলে চালান হলেন। চার বছর বাদে মুক্তি। তখন তিনি অসুস্থ। মাথা গোজার ঠাঁইটুকুও নেই। এক সহৃদয় ব্যক্তির অনুগ্রহে কুঁড়েঘরে আশ্রয় পেলেন। অন্যের বাড়িতে রান্না করে, সুতো কেটে দিন গেল। ইতিহাস বলে, কেউ তাঁর খবর নেয়নি। কিন্তু বিপ্লবের খাতায় তাঁর কথা লেখা আছে, বাংলার প্রথম মহিলা বিপ্লবী রাজবন্দি হিসেবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যে ঢেউ পরাধীন ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই ফুলকি এসে মিশেছিল এক গৃহবধূর রক্তে। বীরভূমের নলহাটির ঝাউপাড়া গ্রাম। বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের মাসি ছিলেন তিনি। নিবারণের সূত্রেই তাঁর বাড়ি হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের আখড়া। বিপ্লবীরা তাঁকে মাসিমা বলেই ডাকতেন। ১৯১৪ সালের ২৬ অগস্ট। সশস্ত্র বিপ্লবীরা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে লুট করে ৫০টি জার্মান মাউজ়ার পিস্তল এবং অসংখ্য কার্তুজের বাক্স। লুটের মাল তারা রেখে যায় মাসিমার বাড়িতে। ১৯১৭ সালের ৮ জানুয়ারি। অস্ত্র রাখার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড। শিশুসন্তান রেখে জেলে
গেলেন দু'কড়ি বালাদেবী। বাংলার প্রথম বিপ্লবী মহিলা, যাঁর অস্ত্র আইনে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় সমান দক্ষতা ছিল কল্পনা দত্তের। কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ার সময় ছাত্রী সংঘের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। হরতাল দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু। পরে বিপ্লবী সূর্য সেনের অনুরাগী পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে পরিচিত হন এবং ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখায় যোগদান করেন। বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন। নিজের পড়ার টেবিলে বসে বোমার জন্য তৈরি করতেন গান কটন। বিপ্লবীদের কাজে প্রতি মুহূর্তেই বিপদ। সে জন্য অনেক বিপ্লবী দলই মেয়েদের দলে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনকি, ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা থাকলে নৈতিক আদর্শের স্খলন ঘটতে পারে, এমনও আশঙ্কা করতেন বিপ্লবীরা। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কল্পনা দত্ত লিখেছিলেন, "It was an iron rule for the revolutionaries that they should keep aloof from the woman."
তখন জেলে অনেকেই বন্দি। বন্দি বিপ্লবীদের উপর অনৈতিক বিচার এবং সাজা রুখতে কোর্ট এবং জেলে ডিনামাইট বিস্ফোরণের প্ল্যান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য। ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। সন্দেহের তির যায় কল্পনার দিকে। তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে দেয় সরকার। চট্টগ্রাম কলেজে পড়তেন, কিন্তু রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসতেন গ্রামে। সূর্য সেন, নির্মল সেনের সঙ্গে দেখা করতেন। শিখে গেলেন বন্দুক চালানো। চট্টগ্রাম পাহাড়ের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব ছিল কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর উপর। এক দিন এই কাজের পরিকল্পনার জন্য যখন পুরুষের ছদ্মবেশে নির্মল সেনের সঙ্গে, মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সে সময় তাকে গ্রেফতার

করল পুলিশ। দু'মাসের জেল হল। প্রমাণের অভাবে জামিনে মুক্ত হলেন। আবার পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ভবঘুরে বলে মামলা দায়ের করল। মাস্টারদা কল্পনাকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিলেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামকে মিলিটারি এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৩৩ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি, সমুদ্রের কাছাকাছি গৈরালা গ্রামে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়। মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। কোনওক্রমে পালিয়ে গেলেন কল্পনা। তিন মাস পরে প্রায় ওই একই জায়গায় পুলিশের সংঘর্ষে কল্পনা অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে ধরা পড়েন। বিপ্লবের আগুন তাঁর পিছু ছাড়েনি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি কেস, বিশেষ ট্রাইবুনালে বিপ্লবীদের বিচার হয়। মামলার রায়ে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ নেমে আসে কল্পনার উপরে। স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ বলেছিলেন, মেয়ে বলে এবং বয়স কম বলে কল্পনা দত্তকে প্রাণদণ্ড দেওয়া গেল না। যা হোক, আইনের যুদ্ধে কল্পনার দ্বীপান্তরের আদেশ স্থগিত হয়। ১৯৩৭ সাল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বিনা বিচারে যাঁরা রাজবন্দি হয়েছেন, তাঁদের মুক্তির জন্য শুরু হল তীব্র গণ-আন্দোলন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী কন্যা কল্পনাকে জেল থেকে বের করার জন্য মুক্তির আবেদন জানিয়ে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৩৯ সালের ১ মে। উত্তাল ছাত্র আন্দোলন। কল্পনাকে মুক্তি দিল ব্রিটিশ সরকার। কল্পনা চলে এলেন চট্টগ্রামে। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ১৯৪৭। দেশভাগ। চট্টগ্রাম ছেড়ে কল্পনা চলে এলেন ভারতে। তার পর কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যের রাজনৈতিক জীবনের মাঝখানেই লিখলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দলিল। ভারত সরকারের উদ্যোগে 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান' বলে আরও একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। লিখতে শুরু করেছিলেন চট্টগ্রাম যুব আন্দোলনের ইতিহাস। সে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেল। কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সোনার মেয়ে, কল্পনা দত্ত।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে ফাঁসির অপেক্ষায় চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। হঠাৎই এক দিন তাঁর ভাগিনি পরিচয় দিয়ে দেখা করতে এলেন এক মেয়ে। বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন মেয়েটি। চট্টগ্রামের বিদ্রোহের আগুনে প্রাণকেন্দ্র তখন মাস্টারদা সূর্য সেন। ১৯৩২ সালের জুন মাসে, ধলঘাট গ্রামের এক গোপন আস্তানায় এই মেয়েটিকে ডেকে নিলেন মাস্টারদা। সেই গোপন কেন্দ্রে তখন নির্মল সেন, অপূর্ব সেন। হঠাৎ খবর পায় পুলিশ। দূর থেকে তারা ঘিরে ফেলে বাড়ি। তার পর ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে গুলি বিনিময়। ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন নিহত। সেই সঙ্গে শহিদ হলেন নির্মল ও অপূর্ব সেন। মাস্টারদা এবং সেই মেয়েটি কোনওক্রমে পালাতে সক্ষম হন। সে সময় চট্টগ্রামে ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপিয়ান ক্লাব। মাস্টারদা প্ল্যান করেন, আঘাত হানতে হবে সেখানে। প্রথম পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কারণ সে দিন গুড ফ্রাইডে হওয়ায় ক্লাব বন্ধ ছিল। কিন্তু এই গোপন আক্রমণের কথা ব্রিটিশরা জেনে যায়। ফলে ক্লাবে মোতায়েন হয় সশস্ত্র রক্ষী। এর পরে ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব পড়ে শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর উপরে। তরুণ বিপ্লবী ব্যর্থ। সে আত্মহত্যা করে। এ বারে মাস্টারদা দায়িত্ব দেন সেই মেয়েটিকে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ক্লাব আক্রমণের দিন ঠিক করা হয়। রাত ১০টা। সামরিক পোশাকে প্রীতিলতা ও অন্যান্য বিপ্লবী ঘিরে ফেলেন ক্লাবটিকে। ভিতরে বলড্যান্স চলছে তখন। ক্লাবের বাবুর্চি টর্চের আলোয় গোপন সঙ্কেত দিতেই প্রীতিলতার নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী রাইফেল বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিছনে ছিল বিলিয়ার্ড রুম। সে দিক থেকে আক্রমণ চালান অন্য বিপ্লবীরা। চার পাশে তখন শুধুই ধোঁয়া, আর্তনাদ... হঠাৎ গুলি লাগে প্রীতিলতার বুকের পাশে। বোমা-গুলির আওয়াজে তত ক্ষণে এগিয়ে আসছে মিলিটারি ট্রাক। সহকর্মী বিপ্লবীদের আত্মগোপন করতে বলে, প্রীতিলতা মুখে ঢেলে দেন মারাত্মক বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইড। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর মৃতদেহ তল্লাশি করতে গিয়ে খুঁজে পায় আক্রমণের প্ল্যান, শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফোটো, ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির একটি বিজ্ঞপ্তি, একটি হুইস্‌ল এবং নিজের হাতে লেখা বিবৃতি। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ প্রীতিলতা সেই বিবৃতিতে বলেছেন... ''দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমার ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না।''

গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি যোগ দিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। ১৮ বছর বয়সে স্বামীকে হারানোর পর তাঁর এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা। ১৯৩২ সাল। আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতার হলেন। এর পর ১৯৪২। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে উত্তাল মেদিনীপুর। জেলা থানা দখল করতে হবে। নেতৃত্ব দিলেন এই সাহসী মেয়ে। ৬০০০ মানুষের মিছিল এগিয়ে চলেছে। নির্বিচারে গুলি চালাল পুলিশ। পর পর তিনটি গুলি এসে লাগল তাঁর গায়ে। গুলি-যুদ্ধ যখন থামল, তখন থানার সামনে পড়ে আছে মেয়েটির নিথর দেহ। রক্তমাখা হাতে তখনও ধরা জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতার বারুদ মেয়েটিকে মরতে দেয়নি। আজও শিশুপাঠ্য কাহিনিতে রক্তের নাম... মাতঙ্গিনী হাজরা।
তখন দেশ স্বাধীন। হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাট থেকে উদ্ধার হয় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ। খবর ভেসে ওঠে কাগজের পাতায়। জানা যায়, তিনি স্বাধীনতার অগ্নিকন্যা বীণা দাস, বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য ন'বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন।

মে মাস। দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া মনোরম। লেবং রেসকোর্সের মাঠে ঘুরছিলেন গভর্নর অ্যান্ডারসন। আড়াল থেকে বিপ্লবী ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য গুলি করেন গভর্নরকে। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। ভবানী ধরা পড়েন। ফাঁসি হয় তাঁর। সেই দলেই ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য উজ্জ্বলা মজুমদার। পরে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। ১৪ বছর কারাদণ্ড। তার পরের ঠিকানা, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় জেল থেকে মুক্তি। আবার জড়িয়ে পড়েন ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। এ বার ঠিকানা প্রেসিডেন্সি জেল। ছাড়া পাওয়ার পরেও নোয়াখালি সংঘর্ষে আক্রান্তদের সেবা করেছেন, জীবন কাটিয়েছেন সমাজসেবার কাজে। তিনিই উজ্জ্বলা। এমনই আর এক জন কমলা দাশগুপ্ত। যুগান্তর দলের বিপ্লবী রসিকলাল দাসের সংস্পর্শে এসে অহিংসবাদ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল সেই কিশোরী। তার জীবনকাহিনিতে জড়িয়ে রয়েছে বিপ্লবীদের বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহের গল্প। গল্পের পাতা আপাতত এখানেই শেষ। যদিও পরিসরের কারণে স্মরণ করা গেল না অজস্র নাম না-জানা বিদ্রোহিনীকে। তবে তাঁরা কোনও দিন হারান না। তাই বিপ্লবেরও মৃত্যু হয় না।

অলঙ্করণ: কুনাল বর্মণ





শিকড়ের কাছাকাছি...

ভারতীয় কারিগরি, তথা পুরনো জিনিসের প্রতি অগাধ ভালবাসা বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর অন্দরসজ্জায়। অন্দরশিল্পী শিবানী ডোগরার ডিজ়াইন সেন্স বোঝার চেষ্টা করলেন সায়নী দাশশর্মা।



গত দশবছর ধরে ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিংয়ের পেশায় রয়েছেন। যদিও শুরুটা একেবারেই পরিকল্পিত ছিল না। সাহিত্য এবং পরবর্তীতে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে সাংবাদিকতার পথে হেঁটেছিলেন। ধীরে ধীরে অনুভব করেন, পুরনো জিনিসের রেস্টোরেশন, রিভাইভাল অনেক বেশি আকর্ষণ করছে তাঁকে। "রং, সামঞ্জস্য, কোনটার সঙ্গে কী ভাল লাগবে, ছোট থেকেই এই বিষয়গুলো বুঝতাম। বরাবরই এমন সব জিনিস ভাল লাগত আমার, যা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর নয় বা হয়তো পুরনো, সময়ের মরচে লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ সেগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেওয়া সম্ভব। এই বোধটাই আমার একমাত্র সম্বল বলতে পারেন। পুরনো স্থাপত্য, বিল্ডিংয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল প্রথম থেকেই। তাই ভেবে দেখলাম, দু'টোকে মেলানোর একমাত্র উপায় ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিং। আসলে আমার রেস্টোরেটিভ আর্কিটেক্ট হওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যে সময়ে পেশা পরিবর্তনের

◀ দেওয়াল জুড়ে বিশালাকার পেন্টিং। একনজরে ওয়ালপেপার বলে ভুল হয়। পালঙ্কের আদলে তৈরি গদিওয়ালা সোফা এবং পিতলের সেন্টার টেবল তার যোগ্য জুড়িদার।

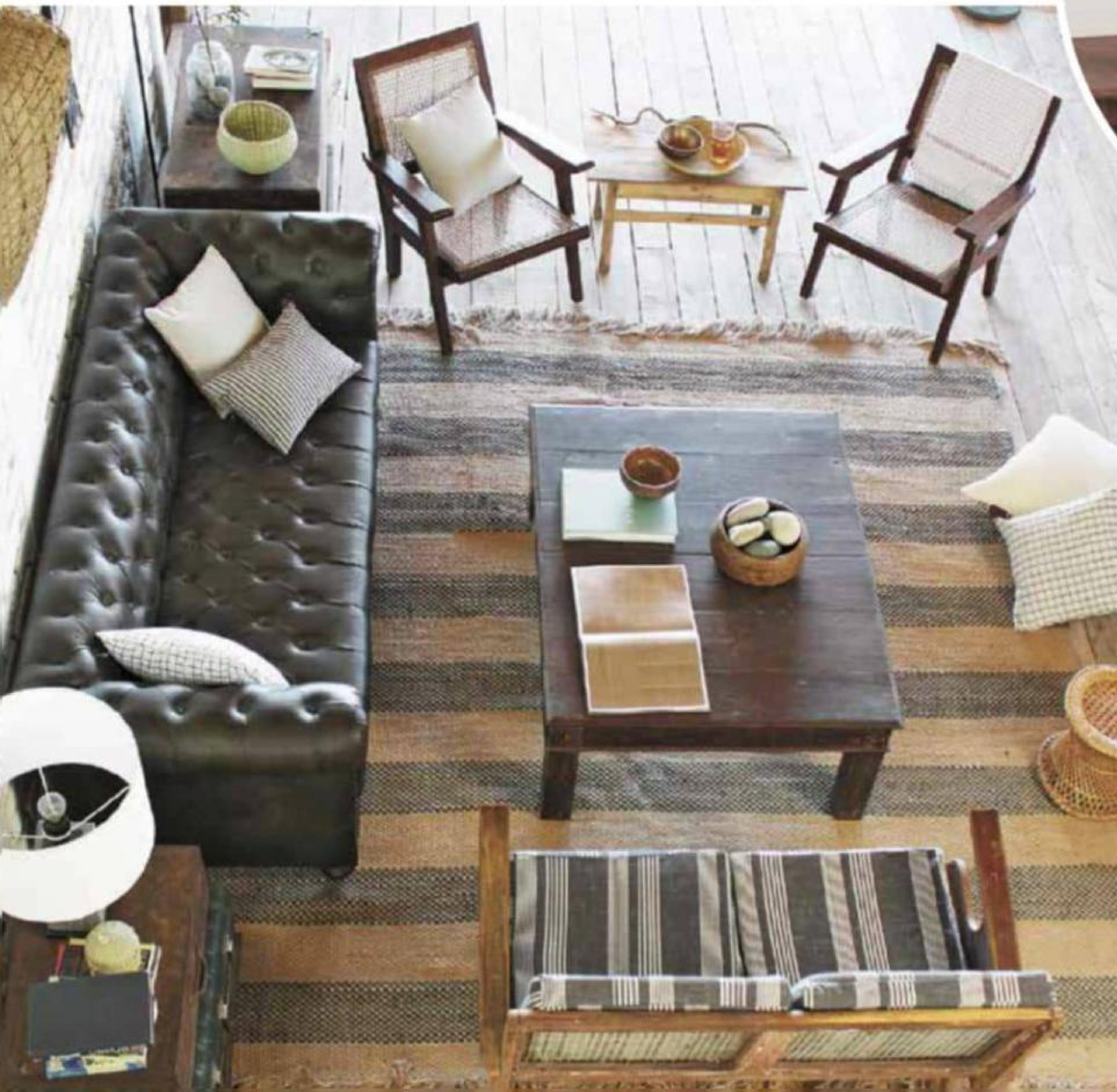


সিদ্ধান্ত নিই, তখন আরও কিছু বছর প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করা সম্ভব ছিল না। বরং ইন্টিরিয়ং ডিজ়াইনিংয়ের পেশায় থেকেও জীর্ণ শৈলী, অবনতিশীল আসবাব, পুরনো স্থাপত্যকে পুনরুদ্ধার করা বা নতুন রূপ দেওয়ার সুযোগ ছিল। গত দশ বছর ধরে সেটাই করার চেষ্টা করছি।” অ্যান্টিক ফার্নিচার, রাস্টিক সরঞ্জাম, ভারতীয় প্রিন্ট, কারিগরি, এসব নিয়েই কাজ করতে ভালবাসেন শিবানী। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করারও নেশা রয়েছে তাঁর। আর তা-ই ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে তাঁর সিগনেচার। “এই মুহূর্তে আমরা এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে আছি যে, ছোট ছোট শিল্প, যা আমাদের নিজেদের, সেগুলো ফেলে রেখে সকলে মাস প্রোডিউসড জিনিসপত্রের পিছনে ছুটছি। ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিংয়ের মান পড়ে গিয়েছে, তা বলছি না। তবে ভারতের ক্রাফ্টম্যানশিপ এই বাজারে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে। ফলে, যখনই এমন কিছু দেখি, যা

বসার ঘর। দেব-দেবীর মূর্তি, ফ্রেমে সাজানো মাস্টার ওয়াল। চোখ টানে সোফা এবং কার্পেটের উজ্জ্বল রং। কাঠের আভিজাত্যের সঙ্গে দারুণ কমপ্লিমেন্টিং!



সিঙ্গল সিটার, টেবল ল্যাম্প, উভয়েই আধুনিক। তবুও কাঠের সাইড টেবলের সঙ্গে বেমানান লাগে না। বরং তিনে মিলে অভিনব ‘হারমনি’ তৈরি করে।

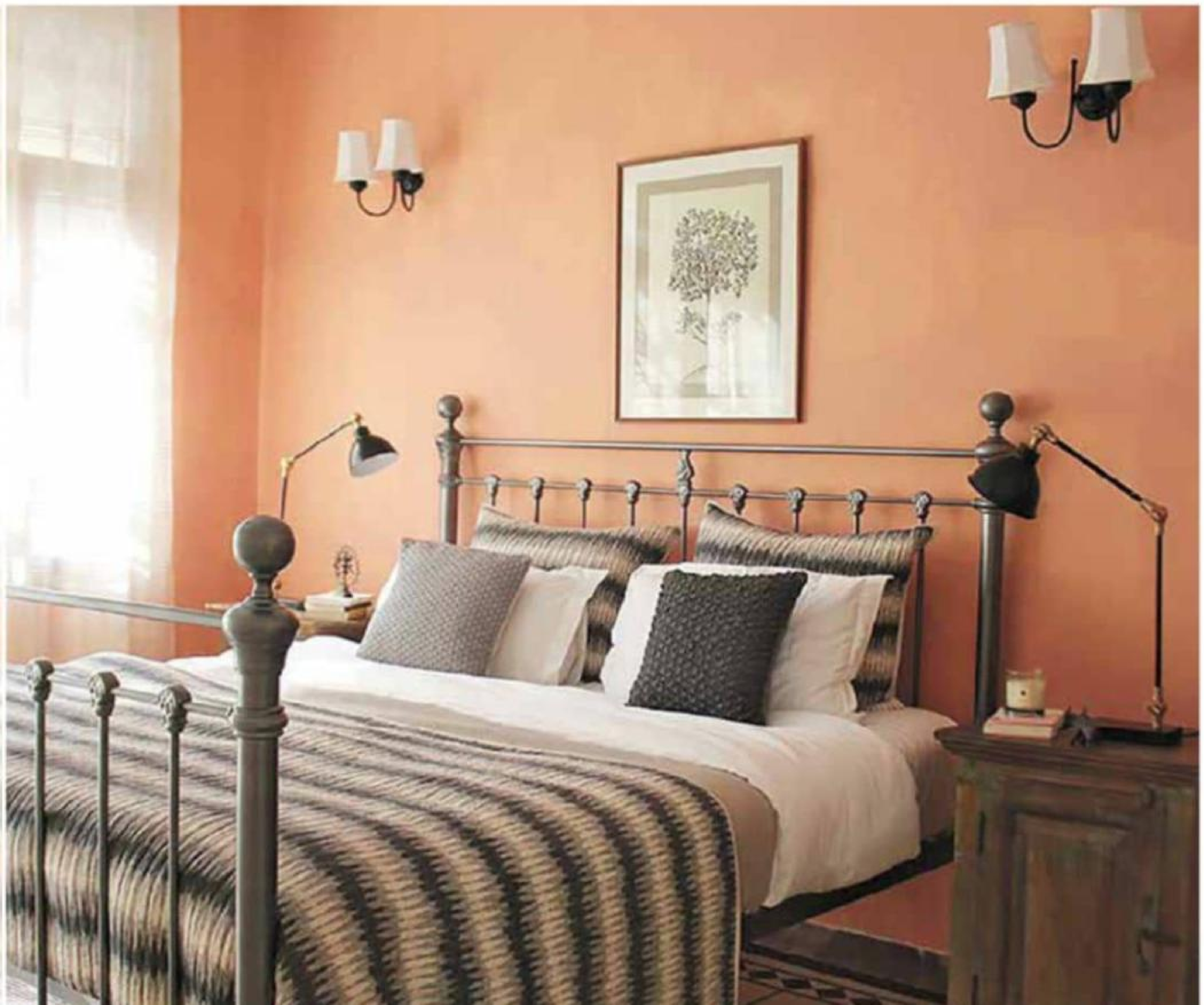


ঢাউস লেদার কাউচের সঙ্গে বেতের মোড়া, হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার, আনফার্নিশড কাঠের টেবল। কার্পেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে চিরচেনা চট।

হয়তো এই সময়ের নয়, অথচ যার পিছনে কোনও শিল্পী অনেকখানি সময়, অনেকটা শ্রম ব্যয় করেছেন, সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করি। 'কাবাড়িওয়ালা'দের কাছে পুরনো আসবাব, ছবি, বাসন দেখলেই সেগুলোকে ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে আমার। হয়তো দেখতে খুব আলাদা, অথচ পাশাপাশি রাখলে একটা গল্প তৈরি হবে, এরকম জিনিস দেখলে তা নিয়ে আসি। কিছু ক্ষেত্রে একটু মেকওভারের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও পরিষ্কার করলেই তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে আবার। আই থিঙ্ক, মোর দ্যান রেস্টোরিং আ পিস, আই অ্যাম রেস্টোরিং সামবডিজ় স্কিল। তবে এই পুরো প্রসেসটাই আমি ভিশুয়ালাইজ় করি। শুরুর দিকে



একাধিক ফ্যাব্রিক, উজ্জ্বল এবং গাঢ় রঙের ব্যবহার রয়েছে এই বেডরুমে। প্রধান দেওয়ালের ওয়ালপেপারও বেশ জমকালো। মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, সাইড টেবল, টেবল-ট্রাঙ্ক, সবের সঙ্গে মিলেমিশে অন্দরের রিচনেস বাড়িয়েছে বহুগুণ।



রট আয়রনের বিছানায় অভিনবত্ব আনতে ব্রোঞ্জের ফিনিশ দেওয়া হয়েছে। জীর্ণ সাইড টেবলেও অ্যান্টিক ছোঁয়া। বাকি সাজ-সরঞ্জাম মিলে উষ্ণ আবহ।



এক্সপার্ট'স সাজেশন

নতুন জিনিস না কিনে নিজের কাছে যা আছে, তার সঠিক প্লেসমেন্টের উপর জোর দিন। সবার বাড়িতেই কাঁসা, রুপো, পিতলের বাসন থাকে, যেগুলো ট্রাঙ্কে বন্দি হয়েই রয়ে যায় আজীবন। এই ধরনের বাসনে ফুল, প্রদীপ সাজিয়ে রাখতে পারেন। বা কোনও ডিসপ্লে ইউনিটে এই ধরনের বাসন সাজিয়ে রাখুন। হাতে বোনা কাঁথা বা কোনও পুরনো ইউনিক শাড়ি টেবল কভার বা টেবল রানার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। যদি আকারে খুব ছোট হয়, তাহলে ফ্রেম করে রাখুন। কয়েকটা আলাদা অথচ কোহেসিভ ফ্যাব্রিক এভাবে পাশাপাশি রাখলেই দেখবেন অন্দরের আমেজ বদলে গিয়েছে। মাদুর লিভিং রুমের কার্পেট হিসেবে বেশ মানানসই। বা জানলার ব্লাইন্ড হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া নকশা করা কাঠের বাক্স, পানের বাটা, জাঁতি ইত্যাদিও ডিসপ্লে করে রাখতে পারেন। অন্দরের নান্দনিকতা এবং রিচনেস, দু'টোই বাড়বে।





নানা রঙের, নানা আকারের ফ্রেম, তাতে নানা ধরনের ছবি। ফুল-পাখির নকশাকাটা হলুদ রাজস্থানি দেরাজের যোগ্য সঙ্গী।

সাধারণ কাঠের টেবল, কাঠের ফ্রেম করা আয়না, কাচের ভাস, বেতের ঝুড়ি, পিতলের ঘড়া... বাহুল্যবর্জিত কয়েকটি উপকরণও কী সুন্দর সমন্বয় তৈরি করেছে!



চিরাচরিত টেবল কভারের জায়গা নিয়েছে প্রিন্টেড কাঁথা। কাঁসার বাসন আর রঙিন ফুলের সমারোহে উৎসবের উজ্জ্বল মেজাজ।

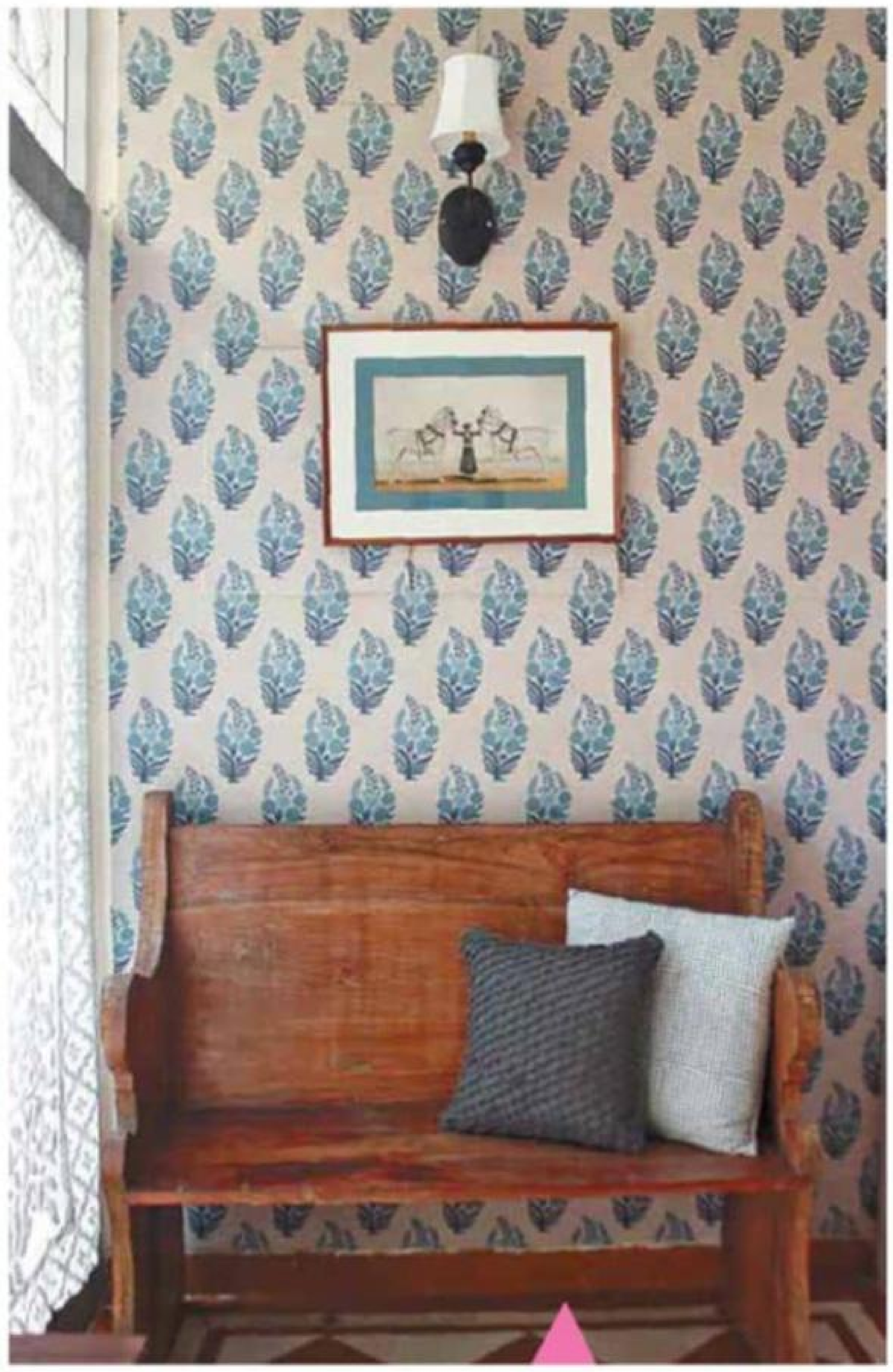
নীল-সবুজের আলাপ। একরঙা দেওয়াল আর কাঠের ডিসপ্লে ইউনিটের সঙ্গে বৈপরীত্য রেখে চেয়ারে নীল-সাদা সাঙ্গানেরি প্রিন্ট। দেওয়ালে ঝোলানো বেতের নকশা করা ঝুড়ি।



কোনও রেফারেন্স থাকত না আমার কাছে। ফলে ক্লায়েন্টদের এগুলো বোঝাতে খুব অসুবিধে হত। কেউ কেউ আমার ভাবনাগুলো ভিশুয়ালাইজ় করতে পারতেন, কেউ পুরোটাই আমার উপর ছেড়ে দিতেন, যার ফলে নিজের জায়গা তৈরি করতে পেরেছি।” তবে শুধু আসবাব বা সাজ-সরঞ্জামই অন্দরসজ্জার মূল বিষয় নয় শিবানীর কাছে। ঘরের আয়তন, বাকি জিনিসপত্র এবং সর্বোপরি ক্লায়েন্টদের নিজস্ব ভাবনার উপরও অনেকটাই নির্ভর করেন তিনি। “প্রত্যেকের নিজের বাড়ি বা ঘর সম্পর্কে কিছু ভাবনা থাকে, আইডিয়া থাকে। আমি সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমার ক্রিয়েটিভিটি দেখাই। কারওর যদি এই বেসিক ভাবনা বা আইডিয়া না থাকে, সেক্ষেত্রে কাজটা একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। সাধারণত কোনও ঘর সাজাতে গেলে এমন সরঞ্জামই ব্যবহার

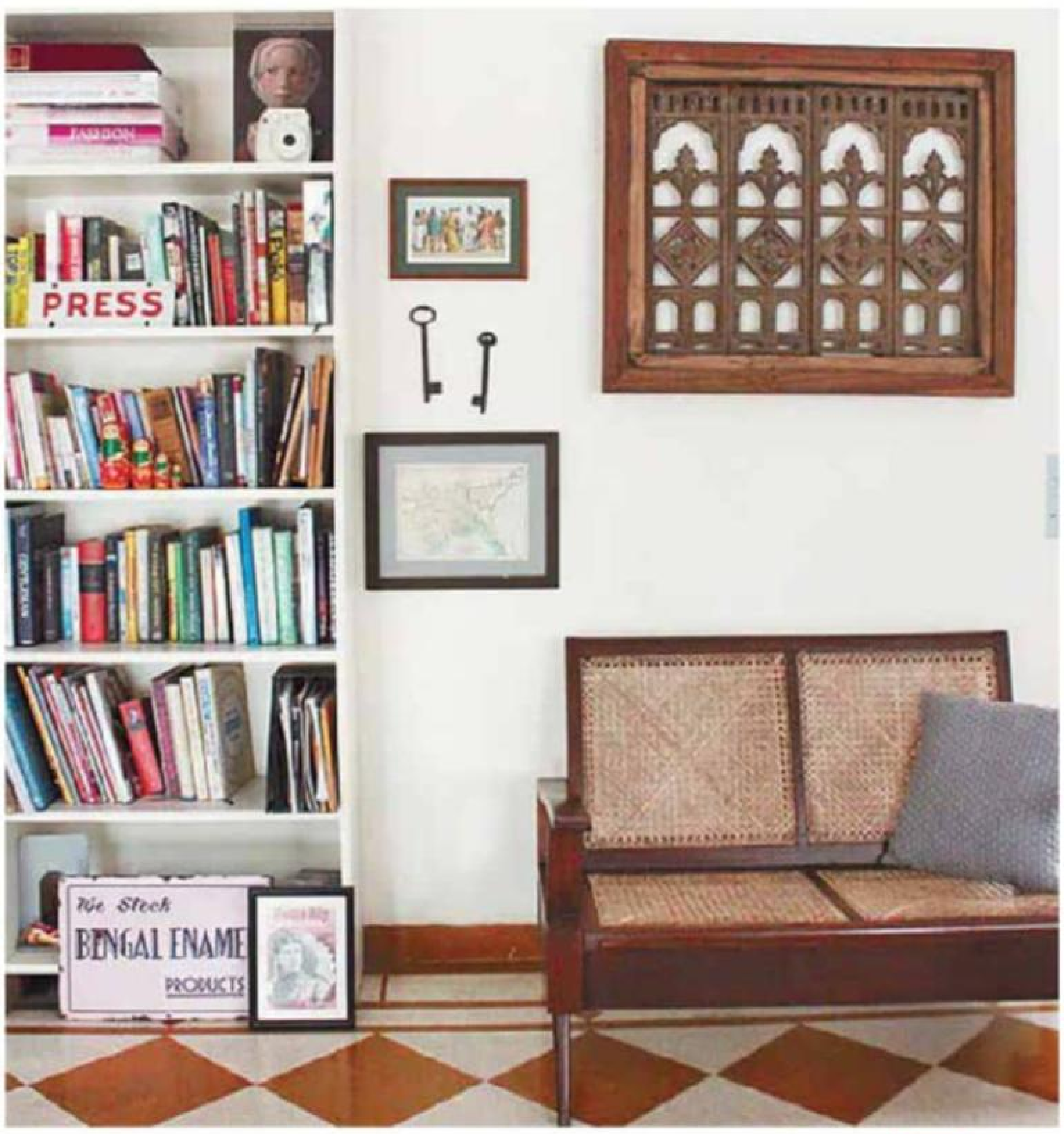


ছোট্ট স্টাডি কর্নার। সাজসরঞ্জাম বলতে স্রেফ একটা বেতের ওয়ালপ্লেট আর বয়ামে ভরা ফুল। ছিমছাম হলেও সুন্দর, আরামে ভরা।



পুরনো দিনের কাঠের বেঞ্চ। সামান্য ঘষা-মাজাতেই কোজ়ি কর্নারের যোগ্য হয়ে উঠেছে।

পুরনো রুম ডিভাইডারের খানিকটা অংশ ফ্রেম করে ওয়াল ডেকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি আসবাব এবং সাজের সঙ্গে আদর্শ।



করি, যা একই সঙ্গে এলিগ্যান্ট এবং অথেন্টিক। মাস প্রোডিউসড জিনিস আমি পছন্দ করি না, কারণ সেগুলো ঘরে কোনও ভ্যালু অ্যাড করে না। বরং, যা সেই অন্দরের বাসিন্দাদের জীবনের অঙ্গ বা যার সঙ্গে তাঁরা রিলেট করতে পারবেন, তাঁদের পরিবারের কোনও মূল্যবান জিনিস, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে ভালবাসি। এতে অন্দরের স্বতন্ত্রতাও বজায় থাকে।” শিবানীর মতে, কোন ফ্যাব্রিকের সঙ্গে কোন ফ্যাব্রিক বা কী ধরনের জিনিস মানাবে, রঙের সামঞ্জস্য, ঘরের সঙ্গে আসবাব এবং বাকি সরঞ্জামের অনুপাত, এগুলো সব অন্দরসাজের ক্ষেত্রেই বোঝা জরুরি। নিজের মাথায় যদি অন্দরের ছবিটা স্পষ্ট থাকে, তাহলে ঘর সাজানো কঠিন নয়, আর তার সৌন্দর্য নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। “এমন কোনও জিনিস, যাতে নির্দিষ্ট কোনও শৈলীর প্রদর্শন হয়েছে, তা কোনওদিনও ‘আউট অফ স্টাইল’ হওয়ার নয়। তাজমহলের জালি ওয়র্ক দেখুন। কত বছরের পুরনো নকশা, অথচ আজও ‘ইন স্টাইল’। প্রত্যেকের বাড়িতেই এরকম অনেক জিনিস থাকে, যা ঘর সাজানোর আদর্শ উপকরণ, অথচ স্রেফ পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যায়। দিদা-ঠাকুমার হাতে বোনা নকশিকাঁথা, কাঁসা বা পিতলের বাসন, মাদুর ইত্যাদি যে কতভাবে ব্যবহার করা যায়, বলে শেষ করা যাবে না। শুধু ভিশন থাকতে হবে।”



Print Parade

চিরন্তন স্ট্রাইপ, চেকসের বাইরে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, সাইকাডেলিক এমনকী ফ্লোরাল প্রিন্টও সাড়া ফেলছে পুরুষ-পোশাকে। অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্যের ফেস্টিভ স্টেটমেন্টেও ধরা পড়ল তেমনই কিছু অভিনব প্রিন্টের আধিপত্য...



নীল-সাদা ডেনিম জুড়ে পাতার মোটিফ। জমকালো বটমওয়্যারকে কমপ্লিমেন্ট করছে একরঙা ডেনিম শার্ট আর নিয়ন এভিয়েটর সানগ্লাস।

প্যান্টস: অভিষেক দত্ত

(বাঁদিকের পাতা) ডিজিট্যাল ফ্লোরাল প্রিন্টেড ব্লেজ়ার-ট্রাউজ়ার্সের জুটি। পোশাকের আর্দি কালার প্যালেট নজর কেড়েছে।

পোশাক: জিৎ সত্য
ফোন: ৮১০০০৫৪০০২



ব্লেজ়ার জুড়ে সাদা, কমলা, হলুদ, সবুজের সাইকাডেলিক প্রিন্ট। ব্লেজ়ারের নীচের অংশে ধূসর রং এবং ইলাস্টিকের ব্যবহারে স্বতন্ত্র স্টেটমেন্ট।

পোশাক: অভিষেক দত্ত
ওয়েবসাইট: www.abhishekdutta.in

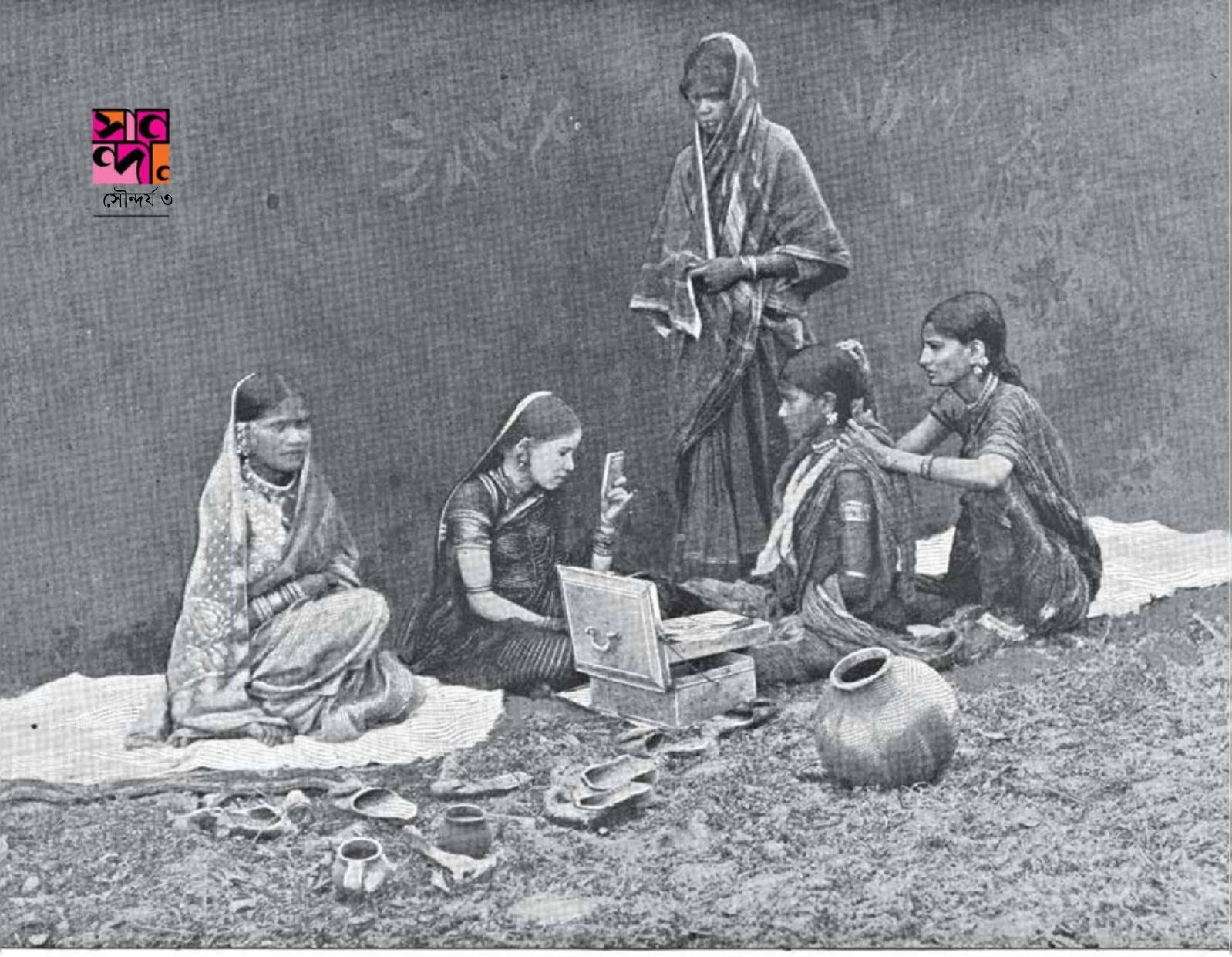


উৎসবের সকালে উজ্জ্বল উপস্থিতি। পরনে টোম্যাটো রেড বন্ধগলা জ্যাকেট। ভিন্টেজ ফ্লোরাল প্রিন্টের সঙ্গে বৈপরীত্য রাখতে ট্রাউজ়ার্স একদম সিম্পল।

প্রিন্টেড জ্যাকেট: অভিষেক দত্ত

মেক-আপ ও হেয়ার : সুরজিৎ সরকার
ফোন: ৮২৯৬৪১৮৭৬৫
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: অঙ্গনা সামন্ত
লোকেশন: দ্য পার্ক হোটেল কলকাতা
ফোন: ০৩৩ ২২৪৯৯০০০
ছবি: শিলাদিত্য দত্ত
পরিকল্পনা: সায়নী দাশশর্মা
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার
রূপায়ণে: বৈশালী সরকার

এই শুটিংয়ের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন এই QR কোডটি।



রূপচর্চার বিবর্তনে ভারতবর্ষ

এ দেশে রূপচর্চার ইতিহাস বিন্যস্ত নানা স্তরে। পুরাকালের মেয়েদের বস্ত্র, অলঙ্কারের বিবরণ, প্রসাধনী বানানোর কায়দা আধুনিক নারীদের চমকে দেবেই! গল্প শোনালেন সুস্মেলি দত্ত।

রূপচর্চা আর প্রসাধনের উৎসস্থল যে প্রাচ্যদেশই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা তা স্বীকার করেছেন। রূপচর্চার অর্থ অঙ্গরাগ অর্থাৎ অঙ্গে বা দেহে, রাগ বা রঞ্জন (উৎস রঞ্জ ধাতু) থেকেই এই কথার উৎপত্তি। সোজা বাংলায় বলতে গেলে মনে ও দেহে অনুরাগ উৎপাদন। দেহ ও মন পরস্পরের পরিপূরক, তাই বলা হয় রূপচর্চায় শুধু দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় না, পরোক্ষভাবে এ যেন মনেরও পুষ্টি ও সন্তুষ্টি সাধন করে।

পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় এও প্রমাণিত যে, সৌন্দর্যচর্চায় গন্ধদ্রব্যের উৎপাদন ও প্রয়োগে ভারতই প্রথম পথপ্রদর্শক। সে যুগে তাই বনজ প্রসাধনীর ব্যবহার যেমন – লতাপাতা, ফুলের রেণু প্রভৃতি গায়ে মাখার প্রচলন ছিল। পাখিদের নানারকম পালক তারা বেশভূষায় লাগাত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এ রকম বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায়। অঙ্গরাগের মনোরঞ্জনী ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, চণ্ডীদাসের শব্দাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় লেখা আছে, 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং ন–আকৃতীনাম' অর্থাৎ যাকে দেখতে সুন্দর, যে কোনও পোশাকই তার অলঙ্কার।

ঋগ্বেদে পাই, পাঁচরকম প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহারের কথা। (১) দেহ পরিষ্কারক (২) ত্বকের বিকৃতিনাশক ও উজ্জ্বলতাবর্ধক (৩) দেহের বিকৃতি পরিপূরক (৪) সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক এবং (৫) দুর্গন্ধনাশক ও সুগন্ধবর্ধক। যেমন– পতি সন্দর্শনে গমনেচ্ছু কন্যার বেশ বিন্যাস। 'কন্যা যেমন তার স্বামীর কাছে যাওয়ার সময়ে বেশবিন্যাস করে, আমি দেখছি এই ঘৃতধারা সেরূপ

করছে। যেখানে সোমরস অভিযুত নয় অর্থাৎ যেখানে যজ্ঞ হয় সেখানেই ঘৃত গমন করে'। (ঋক্ ৪র্থ মণ্ডল ৫৮ সূক্ত শ্লোক)।
বৈদিক যুগের পর স্ত্রীলোকের পাঁচটি অঙ্গের রূপচর্চার সূত্রপাত হলো। সিঁথিতে সিন্দূরা, মস্তকে অর্ঘ্য, গালে তিলক রচনা, কেশরের বিলেপন এবং হাত ও পায়ের নখে মেহেদি পাতার রং লাগানো। অযোধ্যাকাণ্ডের ষাট সর্গে সীতার প্রাত্যহিক আলতা ব্যবহারের উদাহরণ আছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের তিরিশ সর্গে নারীর মুখমণ্ডলে চন্দনাদি অনুলোপন ও গোরচনায় অলঙ্কৃত করার কথা উল্লেখ আছে।
রমণীদের অলঙ্কারের মধ্যে নূপুর, মুক্তাহার, কাঞ্চী, কুন্তল, মনিমালা, নীলকান্ত, হার, বলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রের স্নানের সময়ে রূপচর্চার প্রয়োজনে সুগন্ধি কেশ তেল, গহনা, সুগন্ধ ফুলের মালা, চন্দনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'স্নানানি চ অঙ্গরোগানি বস্ত্রান্যাভরনানি চ / চন্দনানি চ মাল্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ'।। (লঙ্কাকাণ্ড – ১২৩/১) অর্থাৎ হে রামচন্দ্র! আপনার অঙ্গরাগের জন্য সুগন্ধি তেল, বস্ত্র, অলংকার এবং নানারকম মালা আনা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও রূপচর্চার খামতি ছিল না। এও তথ্য মেলে যে, লঙ্কাধিপতি রাবণ সোনার সুতোয় বোনা বস্ত্র পরিধান করতেন। (লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজত বাসসম্' (সুন্দরকান্ড ১০/৭) এখানে 'মহারজত' কথার অর্থ, স্বর্ণ।
দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে কালিদাসের কাব্যে দেখতে পাই, রমণীদের কোঁকড়ানো চুলের সামনের কিছুটা কপালের দিকে ঝোলানোর রেওয়াজ ছিল (বর্তমান যুগের 'লক্স')। সেই কেশাগ্রভাগে পুষ্পরেণু লাগিয়ে সুরভিত রাখার চেষ্টা হত। রমণীদের অলকদাম, প্রিয়-সঙ্গমের সময়ে কুমকুমে রাঙানো হত। মেঘদূতে একজায়গায় বলা হয়েছে, 'ভালোদ্গীর্ণৈরূপচিত বপূঃ কেশসংস্কার ধূপৈঃ'... অর্থাৎ 'পার্বতীর সিক্ত গায়ে ধূপের ধূমে গা শুকোনো হল। সারা গায়ে অগুরু ঘ্রাণে বায়ু সুবাসিত হচ্ছে। কেশবন্ধনের পর অগুরু ধূমে কেশপাশ বন্ধ হল।'
'কেশান্তমন্তঃ কুসুমং তদীয়ম্' (মধুফুল দিয়ে মালা গেঁথে তাঁর কবরীতে জড়িয়ে দেওয়া হল। এছাড়া কালিদাস তাঁর কাব্যে বেণী রচনারও আভাস দিয়েছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গৌড়–রমণীদের বেণী রচনার প্রশংসা আছে। কালিদাসের সমসাময়িক অভিধান রচয়িতা অমর সিংহ তাঁর 'অমরকোষে' লিখেছেন সেযুগের নারীরা



গালে-কপালে-গলায় তমাল পাতা, তিলক, চিত্রক, বিশেষক, পত্রলেখা, পত্রাঙ্গুলি আঁকতেন। কপালে চন্দন, মুখে তিলক, আলতা ও মোম দিয়ে অধর রাঙাতেন। শলাকা দিয়ে কাজলও পরতেন, যদিও বাঁ চোখে আগে কাজল পরার নিয়ম ছিল। রমণীরা শ্বেত অগুরু ও কৃষ্ণ অগুরু চন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে দেহ, স্তন, কোমর, পিঠ, উরুতে লাগাতেন। এছাড়া বিশেষতঃ স্তন থেকে কোমর পর্যন্ত দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গরেণু (ফুল বিশেষ), কুমকুম, মৃগনাভিযুক্ত চন্দন (কস্তুরী চন্দন) ও ফুলের পরাগ অনুলেপন করতেন। পুরুষ সহবাসে এই সুগন্ধির ব্যবহার ছিল অবধারিত। পায়ে আলতা ছাড়াও লাক্ষারাগে রঞ্জিত করতেন। শুধুমাত্র যে নারীরা ধূপে চুল সুবাসিত করতেন তা নয়, পুরুষরাও করতেন। বুকে, হাতে হরিচন্দনের দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করতেন। বস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ বলেছেন, পুরুষেরা মধ্যদেশে উত্তরীয় হাতের উপর বিন্যস্ত করে পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন। নারীদের পরিচ্ছদ কখনও পা পর্যন্ত ঝোলানো থাকত না, খুব জোর হাঁটু পর্যন্ত। সেই সময়ে রমণীরা ব্লাউজ, শেমিজ প্রভৃতি ব্যবহার করতেন না, পরিবর্তে 'কুচবন্ধ' বা কাঁচুলি ব্যবহার করতেন। ভারতীয় প্রাচীন আর্যজাতি নানারকম প্রসাধন দ্রব্য আবিষ্কারে অগ্রণী ছিলেন।

বাৎসায়নের 'কামসূত্র', কুচুমার মুনির 'কৌচুমার তন্ত্র', কোক্কোক কবির 'রতিরহস্য' প্রভৃতি কামশাস্ত্রে বলা আছে প্রতিদিন দু'বেলা স্নান, একদিন অন্তর হলুদ, তিল, চন্দন গায়ে মেখে তৃতীয় দিনে ফেনক (সাবান) ব্যবহার, চতুর্থদিনে দাড়ি কামানোর ব্যবস্থার কথা। ঘাম মোছার জন্য কর্পট (রুমাল) ব্যবহার হত। শয্যাগৃহে রাত্রে সুগন্ধি ফুলের মালা, গোলাপজল, আতরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাতঃকৃত্যাদির পর অগুরু দিয়ে দেহ সুরভিত করে আলতা ও মোম দিয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে পুরুষেরা কাজে বেরোতেন। কামশাস্ত্রে কয়েকটি রূপচর্চার উল্লেখ আছে। যেমন:
(১) আম, ডালিমের ছাল, শাঁখের গুঁড়ো, করমচার বীজ জলে গুলে বেটে গায়ে মাখলে দুর্গন্ধ দূর হয়।
(২) হরিতকি, লোধের ছাল, নিমফল, চন্দন একসঙ্গে পিষে নারীরা গায়ে মাখলে দুর্গন্ধ দূরের পাশাপাশি সেই গন্ধে পুরুষেরাও উত্তেজিত হবে। প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদিক চক্রদত্ত বলেছেন, কুমকুম ও চন্দনের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে মাখলে মুখ উজ্জ্বল ও লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।
ভারতীয় কামশাস্ত্রের চৌষট্টি কলার আটটি কলাই রূপচর্চা বিষয়ক। সেগুলি হল –
(১) বিশোধক চ্ছেদ্য (তিলক রচনা)
(২) দশন বসনাঙ্গ রাগ (দাঁত, দেহ ও



বস্ত্রের রঞ্জন)
(৩) মালা গ্রথন বিকল্প (মালার অলঙ্কার রচনা)
(৪) শেখর বা পীড়যোজন (নানারূপ শিরোভূষণ)
(৫) গন্ধযুক্তি (সুরভি দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী)
(৬) কর্ণপত্রভঙ্গ (বিবিধ কালের অলঙ্কার রচনা)
(৭) বস্ত্রগোপন (কাপড় পরার বিচিত্র কৌশল)
(৮) কৌচুমার যোগ (কুরূপকে সুরূপ করার পদ্ধতি)

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে রমণীরা গায়ে তেল, হলুদ ও চন্দন ব্যবহার করতেন। পুরুষেরা গায়ে অগুরু ও চন্দনের প্রলেপ এবং ঠোঁট রাঙানোর জন্য তাম্বুল বা পান খেতেন। চতুর্দশ ও পঞ্চাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে 'শিসতে সিন্দূর' ও 'সিন্দূর শূর ললাটে' কথাগুলি পাই। যোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' গ্রন্থে আছে, 'পিঠালী হরিয়া লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা করিতে অঙ্গের মলা দূর'। এই গ্রন্থে স্বামীকে বশীকরণের জন্য বলা হয়েছে, 'স্বামীর সম্ভোগ চাঁদ রাখিবে যতনে / বাঘতেল সনে বামা মাখিবে বদনে'।। 'বাঘতেল' বস্তুটি কী, তার হদিশ পাওয়া যায় না। তবে 'বাকরতেল' নামক একটি তেলের কথা জানা যায়, যার অর্থ হল 'মদপ্রস্তুতের জন্য সুগন্ধ তেল'। কৃষ্ণকীর্তনে 'কানড়ী খোঁপা', গোবিন্দদাসে 'কানড়া খোঁপা', কবিকঙ্কনে 'গুয়াসুটি খোঁপা', চৈতন্যচরিতামৃতে 'ললিত খোঁপা', চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 'লোটন খোঁপা'র কথা মেলে। সুক্ষ্ম কাঠের চিরুনি দিয়ে এঁরা কেশবিন্যাস করতেন। এছাড়া ধূপের ধোঁয়া, ভ্রমর মধুর তেল (ভৃঙ্গরাজ), শীতল নারায়ণ তেল এঁরা চুলে মাখতেন। নানা রকম সূক্ষ্ম বস্ত্র যেমন পাটের পাছড়া, নেতবাস (গরদ), মেঘডুম্বুর শাড়ি, রক্তবস্ত্র, পট্টবস্ত্র (পাটের কাপড়), নীলাম্বরী, পীতবস্ত্র পরতেন। মূল রং ছিল তিনটি— লাল, নীল ও হলুদ। এগুলির নানা রকম মিশ্রণে তৈরি হত খয়েরি, কমলা, সবুজ, কালো প্রভৃতি রং। ভারতীয়রা শামুকের খোলা পুড়িয়ে দুষ্প্রাপ্য বেগুনি রং তৈরি করতেন। অজন্তার গুহাচিত্রে এসব রঙের কিছুটা ঘনঘটা দেখা যায়। এখানে কোনও নারী স্বল্পবসনা, কেউ বা পরেছেন বুটিদার ব্লাউজ, কারও বস্ত্রে ডোরা বা নকশা করা। কেউ পরেছেন স্তনপট্ট, কেউ মুকুট, রংনি পাগড়ি। কারও গলায় সাত লহর মুক্তোর মালা, কারও পেনডেন্ট, কারও খোঁপায় ফুল, কেউ বেঁধেছেন মাথার উপরচূড়া। মুসলমান শাসকরা যখন ভারতে এলেন, রাজপুত রানীদের বিবিধ রঙের পোশাক দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। নূরজাহান ভারতীয় নারীর পোশাকে এনেছিলেন নতুনত্ব। রাজপুত নারীদের পটকা, কাঁচুলি, ওড়নার সঙ্গে নিজেদের ঢঙের পোশাক মিলিয়ে এক রেনেসাঁর উদ্ভব হয়।

ইংরেজ শাসনের আমলে উচ্চবিত্ত বনেদি সমাজ সাজগোজের পরিবর্তন ঘটালেন। এর প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষদের উপরেও পড়ল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ঠাকুরবাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। জ্ঞানদানন্দিনীই প্রথম মেয়েদের আধুনিকভাবে সরল উপায়ে শাড়ি পরার প্রচলন প্রথম শুরু করেন। পোশাকের এই স্বচ্ছন্দ ভাবের জন্য মেয়েরা আধুনিকতার দিকে বুঝি ওঁর জন্যই আরও একধাপ এগিয়ে গেল। এবার বলব, ঠাকুরবাড়ি মেয়ে-বউরা কীভাবে চুল শুকোতেন। প্রথমে রোদে পিঠ দিয়ে চুল ফাঁক করে চুল শুকানো হত। তারপর ধুনুচিতে কাঠকয়লার আগুনে ধুনো দিয়ে তার উপর দেওয়া হত জালের ঢাকা। এই জালের ঢাকার উপর চুল রেখে শোকানো হত। এতে চুল যেমন সুরভিত হত, তেমনি শুকোতেও বেশি দেরি হত না। হাতে বা চিরুনি দিয়ে জট ছাড়িয়ে চুল বাঁধা চলত। মোটামুটি সন্ধের আগেই মেয়েরা নানা ধরনের খোঁপা করে গা ধুয়ে মাথায় বেলফুলের মালা লাগিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক 'অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, একবার কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, যে ওঁর চুল রেশমের মতো চকচকে কিভাবে থাকে? কবি বলেছিলেন, উনি চুলে নিয়মিত সর্ষেবাটা লাগান। আধবাটি সর্ষে ওঁর জন্যই রাখা থাকে। গায়েও মাখেন তা, ডালবাটার সঙ্গে মিশিয়ে। চুল ও চামড়া মোলায়েম থাকে। কবিগুরুর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে আমরা আরও জানতে পারি, মা তাঁকে ধরে বাদামবাটা, সর ও কমলালেবুর খোসাবাটা গায়ে মাখিয়ে দিতেন। জ্ঞানদানন্দিনীর



'পুরাতনী' থেকে জানতে পারি, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সারাদিনে অন্তত একবার স্নানের আগে দুধের সর, ময়দা মিশিয়ে গায়ে রেখে ঘষে ঘষে ময়লা তুলতেন। তারপর ভাল করে গা ধুয়ে গামছা দিয়ে গা ঘষতেন, এতে ত্বকে রোমের প্রাবল্য থাকত না। এছাড়া রোদে পোড়া ত্বককে উজ্জ্বল করতে মসুর ডালবাটার সঙ্গে কমলালেবুর খোসাবাটা মিশিয়ে মাখতেন। ইন্দিরাদেবী 'স্মৃতি সম্পূট' গ্রন্থে লিখেছেন, স্নানের সময় পাতলা হাতলওয়ালা ঝামা দিয়ে গোড়ালি, কনুই ও সারা গায়ে ঘষা হত। সর-ময়দা মেখে স্নানের পর সর্ষের তেল বা বিলেত থেকে আনানো অলিভ অয়েলও মাখতেন। রূপটান বানাতেন বাড়িতেই। সরসমেত আধ পেয়ালা দুধে দুই চা-চামচ ময়দা, দুই চা-চামচ কমলালেবুর খোসাবাটা, দু'চার ফোঁটা মধু, দুই চা-চামচ সুগন্ধি তেল, মঞ্জিষ্ঠা পাতা, লাল একধরনের লতা (বেনেদের দোকান থেকে পাওয়া যেত)— একসঙ্গে মিশিয়ে স্নানের আগে গায়ে মাখতেন। সাবানের বদলে ব্যবহার করতেন বেসন। শিশিতে গ্লিসারিন, গোলাপজল ও কয়েকফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে রাখা হত, শীতকালে স্নানের পর মাখা হত। মোমরুট বা মোমরাট নামে একরকম ঘরোয়া ক্রীম বানাতেন। মৌচাকের মোম পাথরের বাটিতে ঘষে গুঁড়ো করে, অল্প নারকেল তেল মিশিয়ে ক্রিমের মতো করে কৌটোয় ভরে রাখতেন। স্নানের আগে এই ক্রিম মাখতেন ।

ত্বকে উজ্জ্বলতা বাড়াতে কমলালেবুর খোসার গুঁড়ো, বেসন আর কাঁচা দুধ মিশিয়ে রূপটান বানাতেন। সর-ময়দার সঙ্গে লেবুর খোসা বাটা, কুসুম ফুলের বীজ বাটাও মাখতেন। রোদে পোড়া ত্বকে জেল্লা আনার জন্য আটা শুকনো করে মেখে মুখে গায়ে লাগিয়ে ঘষতেন। শসা চাকা চাকা করে কেটে আধকাপ কাঁচা দুধে খানিকক্ষণ রেখে মুখে লাগালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের কাজ করত। বসন্ত বা ব্রণর দাগ হলে নরম কাপড় বা তুলো ডাবের জলে ভিজিয়ে দাগের উপর বেশ কিছুক্ষণ লাগিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। ১০-১২টা আমন্ড বাদাম খানিকটা দুধে তিন-চার ঘণ্টা ভিজিয়ে বেটে নিয়ে, অল্প দুধ ও জাফরান মিশিয়ে রূপটান বানাতেন। কখনও মধু, বার্লিগুড়ো আর ডিমের সাদা অংশ মিশিয়েও রূপটান করতেন।

আরেকধরনের ঘরোয়া ক্রিম ছিল বি ডি ক্রিম। আধ আউন্স শক্ত প্যারাফিন, ২ আউন্স সাদা ভেজলিন, আধ চা চামচ বোরিক পাউডার, ক্যাম্ফর অয়েল, অল্প চন্দন তেল। প্যারাফিন গলিয়ে, ছেঁকে আগুনে বসিয়ে তাতে ভেসলিন, বোরিক পাউডার, ক্যাম্ফর অয়েল, চন্দন তেল মিশিয়ে রাখতেন। জমে গেলে ওই ক্রিম মুখে মেখে খানিক পরে মুছে নিতেন তাঁরা। সপ্তাহে একদিন অন্তত অন্দরমহলে নাপিতিনি আসতই। সকলের হাত, পায়ের নখ কেটে ঝামা দিয়ে পা ঘষে পরিষ্কার পায়ে আলতা পরিয়ে দিত। আলতা-পাতা ছিঁড়ে হাতে গুলি পাকিয়ে টিপে রস বের করে পরিয়ে দিত এয়োস্ত্রীদের পায়ে। অবিবাহিত মেয়েদের পায়ে আলতা দিয়ে নকশা এঁকে দেবার রেওয়াজ ছিল। হাত ও পায়ের আঙুল রাঙিয়ে দিত মেহেদি পাতা দিয়ে। মুখের প্রসাধন ছিল ভিনোলিয়া ক্রিম। কখনও তার সঙ্গে মেশানো হত গোলাপ জল। এরপর ক্রিম ভাল করে মুছে লাগাতেন চন্দনগুঁড়ো। বাড়িতে মনসাপাতায় ঘি লাগিয়ে প্রদীপের শিখার উপরে ধরে তৈরি করা হত মনসাপাতার কাজল। এতে চোখে জলকাটার সমস্যারও সমাধান হত। রুজের বদলে তাঁরা মাখতেন সিঁদুর গুঁড়ো। ঠোঁট রাঙাবার জন্য পান ব্যবহার করতেন। শিউলিফুলের পাপড়ি শুকিয়ে বেটে লোহার পাত্রে রেখে তাতে দিতেন অল্প খয়ের। খানিক পরেই সেটি কালো হয়ে যেত। যেটা দিয়ে টিপ পরতেন এঁরা। এ ছাড়া মরা কাঁচপোকার ডানা ছিঁড়ে সেটিকে গোল করে কেটে চকচকে কাঁচপোকার টিপও কপালে পরতেন। যদিও বিবাহিত মেয়েরা পরতেন সিঁদুরের টিপ।

সে যুগে অনেক বনেদি বাড়ির মেয়েরা ঠাকুরবাড়ির অনুরূপ রূপটানে অভ্যস্ত ছিলেন, বিলেত থেকে আনা 'পমেটম', 'স্নো' প্রভৃতিও ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে ম্যাক্সফ্যাক্টর কোম্পানির পাউডার, লিপস্টিক (লাল ও কমলা দুটি মাত্র রং), আইব্রো পেনসিল, রুজ... এর বেশি কিছু তাঁরা ব্যবহার করতেন না। পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলনের জেরে বিদেশি দ্রব্য বিসর্জনের হাওয়া উঠল। এই সময় কিছু কোম্পানি যেমন এইচ বোস অর্থাৎ হেমেন্দ্র মোহন বসুর 'কুন্তলীন' প্রডাক্টের কসমেটিকস জনপ্রিয় হয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজের উচ্চবিত্ত সমাজের থেকে মধ্যবিত্ত সমাজ এই সমস্ত স্বদেশি প্রডাক্টকে ভালভাবে গ্রহণ করেছিল।

বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে রাসায়নিক কিছু প্রসাধনসামগ্রী মানুষের ত্বকের নানান সমস্যাকে এমনকী বার্ধক্যকে বিলম্বিত করতে সচেষ্ট হচ্ছে। এও একটা সদর্থক দিক। সৌন্দর্যচর্চা আপনি যেভাবেই করুন না কেন, তা কিছুটা ভেবেচিন্তে করাই বাঞ্ছনীয়। শুধু খুঁজে দেখা প্রয়োজন, কোন দ্রব্য ত্বকের পক্ষে, চুলের পক্ষে উপযুক্ত। নিজেকে ভাল রাখা ও ভাল থাকার দায়িত্ব আপেক্ষিক। সেই সময়ের রোম তোলা এখন ওয়্যাক্সিং, হাত পা ঘষা এখন মেনিকিওর, পেডিকিওর, চুলে মেহেদিপাতা লাগানো বা এযুগের কালারিং, মুখে দুধ সরবাটার প্রলেপ – এ যুগের ফেশিয়াল বা মাস্ক.... এভাবেই বিবর্তন চলছে চলবে। সেই সঙ্গে পুরনোর আলোকে নতুনকে আরও সুন্দরভাবে আবিষ্কার করতে পারলেও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

তথ্যসূত্র : প্রাচীন ভারতের রূপচর্চা, শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
আবরণে আভরণে ভারতীয় নারী, চিত্রা দেব
ঠাকুরবাড়ির রূপকথা, শান্তা শ্রীমানী
সেকাল ও সেকালিনী, শ্যামলী বসু



ইচার মুড়া

বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি

পুজো মানেই ডায়েটহীন খাওয়াদাওয়া। পুজোর খাওয়াদাওয়া মানেই মিষ্টিমুখ। বাংলার কিছু বিলুপ্তপ্রায় মিষ্টির সন্ধান ও রন্ধনপ্রণালী জানালেন ফুড কলামনিস্ট রিনিমা পাল। শুনলেন দেবলীনা অধিকারী।



‘আমি সেই ভোলানাথ নই রে, সেই ভোলানাথ নই/ আমি ময়রা ভোলা হরির চেলা/ বাগবাজারে রই।’ বাগবাজারে গঙ্গার ধারে হাঁটলেই আজও মনে পড়ে যায় ভোলা ময়রা ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কিংবদন্তি কবির লড়াইয়ের ইতিহাস। অথচ ভোলা ময়রার সেই ভিয়েন আজ অতীত। বাঙালি মানেই খাদ্যরসিক। আর মিষ্টির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক তো সেই কোন কালের! প্রাচীনকালে মিষ্টির প্রধান উপকরণ ছিল গুড়, দুধ, ধান। এর মূল কারণ সহজলভ্যতা। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে কলকাতার বাবু কালচারের সূত্রপাত হল। চিত্ত পরিতৃপ্তির জন্য যেমন বসল গান-বাজনার মজলিশ, তেমনই স্বাদ কোরককে তৃপ্তি দানের উদ্দেশ্যে জমিদার বাড়িতে তৈরি হল ভিয়েন। যা ছিল মিষ্টি তৈরির গবেষণাগার। ভিয়েনের আঁচে ভিন্ন স্বাদের হরেক মিষ্টি সৃষ্টি হত। যার সঙ্গে মিশে আছে মধ্যযুগের ইতিহাস। অতিথিদের আপ্যায়নে অথবা দেবীর পুজোয় বানিয়ে ফেলুন বাংলার ঘরের সেসব হারানো মিষ্টি।

ইচার মুড়া

এই মিষ্টিটি মূলত পূর্ব বাংলার বরিশাল অঞ্চলের। পুজোর শেষে বিজয়ায় মিষ্টিমুখ করার জন্য ইচার মুড়া ছিল সুপ্রচলিত। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় চিংড়িকে ‘ইচা’ বলা হয়ে থাকে। চিংড়ির আদলে তৈরি হওয়ায় এমন নামকরণ। রইল এই হারানো মিষ্টির স্বাদ ফিরে পাওয়ার উপায়।

উপকরণ: ডাব ১টা, চিনি ৫০০ গ্রাম, ময়দা অথবা আটা ২৫০ গ্রাম, নুন ১/২ চা-চামচ, কেশর ১/২ চা-চামচ, সাদা বা কালোতিল অল্প (সাজানোর জন্য), সাদাতেল ২৫০-৩০০ লিটার (ভাজার জন্য)।

প্রণালী: ডাবের শাঁস একটু মোটা ও লম্বা করে কেটে নিন। কেটে নেওয়া ডাবের শাঁসের সঙ্গে ৪ টেবলচামচ চিনি দিন। একটা ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে মিশ্রণটিকে ঢেলে জ্বাল দিতে থাকুন, যতক্ষণ না মিশ্রণটি শুকিয়ে আসে। শুকিয়ে এলে ও শাঁস শক্ত হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে এলে হাত দিয়ে চেপে চেপে মিশ্রণটিকে লম্বা লম্বা আকার দিন। নুন সহযোগে ময়দা বা আটা ভাল করে মেখে একটা ব্যাটার তৈরি করুন। ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করুন। তেল ভাল করে গরম হয়ে এলে তৈরি করে রাখা পুরটিকে ময়দা বা আটার ব্যাটারে চুবিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। সেটি লাল হয়ে গেলে তুলে নিন। ভাজার সময় আর-একটি ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে বাকি চিনি গলিয়ে চিনির রস তৈরি করুন। এবার ভেজে রাখা নারকেলের পুরগুলিকে এই চিনির রসে ডুবিয়ে তুলে নিন। শেষে সাদা বা কালো তিল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ইচার মুড়া।



মনোহরা

শোনা যায় জনাইয়ের জমিদার কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান। এই সময় তাঁর বাড়িতে আগমন ঘটে এক ইংরেজ সাহেবের। খোঁজ পড়ে এক নতুন ধরনের মিষ্টি—যার ধাঁচ হবে শুকনো অথচ থাকবে রসের বাঁধন। খোঁজ পড়ল ন্যাড়া ময়রার, তিনি বানিয়ে ফেললেন মনোহরা।

উপকরণ: দুধ ১ লিটার, লেবু ২টো (মাঝারি মাপের), ঘি ১ টেবলচামচ, থেঁতো করা এলাচ ১টা, চিনি ১/২ কাপ, মিহি করে কুচনো পেস্তা ১ চা-চামচ, চিনি ১ কাপ, জল ১ কাপ।

প্রণালী: প্রথমে দুধ ফুটিয়ে তাতে লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটিয়ে নিন। ছানাকে ছাঁকনির উপর রেখে লেবুর টক ভাব কাটানোর জন্য ঠান্ডা জল ঢেলে দিন। ফ্রাইং প্যান নিয়ে তাতে ভাল করে ঘি মাখিয়ে নিন। এলাচ দিয়ে ৪০ সেকেন্ডের জন্য একটু নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে ছানা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এরপর দিন চিনি। গলে এলে মিহি করে কেটে রাখা পেস্তা ভাল করে মিশিয়ে

জনাইয়ের জমিদার কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান। এই সময় তাঁর বাড়িতে আগমন ঘটে এক ইংরেজ সাহেবের। খোঁজ পড়ে এক নতুন ধরনের মিষ্টির— যার ধাঁচ হবে শুকনো, অথচ থাকবে রসের বাঁধন।



মনোহরা

নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে এলে হাতের তালু দিয়ে মেখে মিশ্রণটিকে মসৃণ করে নিন। এবার মণ্ডটি থেকে একটু করে নিয়ে বলের আকার দিন। চিনি ও জল একসঙ্গে ঘন না হওয়া অবধি ফোটাতে থাকুন। তারপর মিষ্টিগুলোকে রসে ফেলে একটু নাড়াচাড়া করে তুলে নিলেই তৈরি বাঙালির প্রিয় মনোহরা।

মুকুন্দ

কয়েকবছর আগেও গ্রাম বাংলার ভাঁড়ারঘরের বয়ামে তোলা থাকত এই ধরনের মোয়া। যার নাম আজ অচেনা। নিম্নের প্রণালীর সাহায্যে পেয়ে যাবেন এই নাম না জানা বাংলার হারানো মোয়া।

উপকরণ: নারকেল ১টা (কুরনো), খই ৩৫০ গ্রাম, গোলমরিচ ১/৪ টেবলচামচ, আদাবাটা ১/২ টেবলচামচ, খোয়াক্ষীর ১ কাপ, চিনিগুঁড়ো ১/২ কাপ।

প্রণালী: নারকেলগুঁড়ো ও চিনিগুঁড়ো একসঙ্গে



মুকুন্দ



ক্ষীরের যোশি

মিশিয়ে মেখে নিন। একটি ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে মাখা মিশ্রণটি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন। এবার খোয়াক্ষীর, আদাবাটা ও গোলমরিচ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে তাতে খই দিয়ে নামিয়ে নিন। মিশ্রণ ঠান্ডা হয়ে এলে অল্প-অল্প করে নিয়ে হাতের তালু দিয়ে চেপে পছন্দমতো মোয়ার বা চৌকো আকার দিন। পরিবেশন করুন বাংলার হারানো মুকুন্দ।

ক্ষীরের যোশি

মঙ্গলকাব্যে এই মিষ্টির উল্লেখ রয়েছে। আজ এর স্বাদ আর পাওয়া যায় না।

উপকরণ: দুধ ১ লিটার, চিনি ২ কাপ, থেঁতো করা এলাচ ৫টা, আমন্ড (মিহি কুচি) ১টা, কাজু (মিহি কুচি) ১টা, পেস্তা (মিহি কুচি) ১টা, কেশর ১চা-চামচ, ময়দা ১ কাপ, খোয়াক্ষীর ১/২ কাপ, ঘি ২ ১/২ কা প।

প্রণালী: একটি প্যানের মধ্যে দুধ নিন। ছোট এলাচ দিয়ে তা ঘন করে ফোটান। ময়দা ও খোয়াক্ষীর, ঘি বা জলের সাহায্যে ভাল করে মেখে মণ্ড তৈরি করুন। এবার মণ্ড থেকে অল্প অল্প করে কেটে নিয়ে তাকে চৌকো অথবা লম্বা-লম্বা আকার দিন। ফোটানো দুধ আরও ঘন হয়ে এলে চিনি দিয়ে তাতে মিহি করে কেটে রাখা আমন্ড, পেস্তার টুকরোগুলোকে হালকা করে ভেজে নিন। তৈরি করা ক্ষীর গ্যাস থেকে নামিয়ে গরম অবস্থায় তার মধ্যে টুকরোগুলি ফেলে দিন। তার উপর কেশর ছড়িয়ে দিলেই তৈরি জিভে জল আনা ক্ষীরের যোশি।



বারবসা

শোনা যায় এক সাহেবের নাম-অনুসারে ক্ষীরপাইয়ের কারিগরদের দ্বারা সৃষ্টি হয় বারবসা। এডওয়ার্ড বারোবশ নামে এক সাহেবের সহায়তায় বর্গিদের হারানো সম্ভব হয়। তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যই মিষ্টির নাম হয় বারবসা। জিভে জল আনা হারানো এই মিষ্টির খোঁজ রইল নিচের রেসিপিতে।

উপকরণ: সুজি ২৫০ গ্রাম, চিনিগুঁড়ো ৬০ গ্রাম, মাখন ৮০ মিলি লিটার, নারকেলগুঁড়ো ১/২ কাপ, গুঁড়োদুধ ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ টেবলচামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ টেবলচামচ, কফি পাউডার ১ টেবলচামচ, চিনি ১ কাপ, জল ১/২ কাপ, গোলাপজল ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: সুজি, চিনিগুঁড়ো, মাখন একসঙ্গে স্প্যাচুলা দিয়ে ভাল করে মাখুন যাতে মিশ্রণটিতে কোনও ডেলা না থেকে যায়। তার মধ্যে নারকেলগুঁড়ো ও দুধ মিশিয়ে



বারবসা

নিন। এবার বেকিং পাউডার, ভ্যানিলা এসেন্স, কফি পাউডার দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে রেখে দিন যাতে মিশ্রণটি ফুলে ওঠে। এবার একটি ট্রে নিয়ে তাতে একটু মাখন বুলিয়ে নিন ও কিছুটা সুজি ছড়িয়ে দিন। মাইক্রোওয়েভ আভেনে ২০ থেকে ২৫ মিনিট ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মিশ্রণটিকে বেক করে নিন। আভেন না থাকলে প্রেশার কুকার গরম করে তার মধ্যে বালি দিয়ে ভিতরে টিফিন কৌটো বসিয়ে তেল বুলিয়ে একই পদ্ধতিতে বেক করুন। মিশ্রণটিকে ৫ মিনিট মতো বাইরে রেখে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। আর-একটা পাত্রে সুজি ও একটু জল নিয়ে ফুটিয়ে তার মধ্যে গোলাপজল দিয়ে নামিয়ে রাখুন। এরপর এটি বেক করে রাখা মিশ্রণটিতে সম্পূর্ণ ঢেলে দিন। তৈরি বাংলার বিলুপ্তপ্রায় মিষ্টি বারবসা।



গঙ্গাজলি

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সনকার দ্বারা যে বিপুল পরিমাণে খাদ্য পরিবেশিত হয়েছিল, সেখানে মিষ্টি বলতে ছিল 'উত্তম ক্ষীরসা দিয়ে গঙ্গাজলী লাড়ু'। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচৈরিতামৃত'-তেও এই মিষ্টির খোঁজ মেলে। জানা যায় গৌরভক্তরা চৈতন্যের জন্য যে সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল 'নারিকেল খণ্ড ও নাড়ু গঙ্গাজল'। শোনা যায় এককালে কৃষ্ণনগরে এই নাড়ুর ব্যাপক প্রচলন ছিল। নিম্নের প্রণালীর মাধ্যমে নিজের রান্নাঘরেই বানিয়ে



ফেলুন প্রাচীন বাংলার স্বাদ।

উপকরণ: মিহি করে কুরনো নারকেল ২টো, চিনিগুঁড়ো ৩৫০ গ্রাম, কর্পূর ১/৪ চা-চামচ, কাঠের ছাঁচ।

প্রণালী: নারকেলকোরা ভাল করে চেপে তার থেকে দুধ বের করে শুকনো শুকনো করে নিন। এবার একটি ফ্রাইং প্যানে হালকা আঁচে নারকেলকোরা দিয়ে নাড়ুন। শুকিয়ে এলে কর্পূর ও গুঁড়োচিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না আঠালো হয়ে যায়। এরপর মিশ্রণটি থেকে পুর নিয়ে কাঠের ছাঁচের সাহায্যে গোল গোল আকার দিয়ে রেখে দিন। ঘরের হাওয়ায় শক্ত হয়ে এলে এই লাড্ডুর উপর অবশিষ্ট নারকেলগুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। তৈরি বাংলার মধ্যযুগের বিলুপ্তপ্রায় মিষ্টি গঙ্গাজলি।

খইচুর

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে উল্লেখ আছে যে হুগলি জেলার ধনেখালিতে প্রচুর খইচুর পাওয়া যায়। হাওড়া জেলার মাজুও বিখ্যাত এই মিষ্টির জন্য। যদিও নানা মিষ্টির স্বাদ ও গন্ধের প্রতিযোগিতায় বাংলার এই নিজস্ব স্বাদ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। রইল এই স্বাদকে পুনরায় ফেরানোর উপায়।

উপকরণ: খই ৫০০ গ্রাম, চিনি ৩০০ গ্রাম, এলাচের গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ঘি ১/২ চা-চামচ।

প্রণালী: চিনি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। এবার একটি ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে চিনিগুঁড়ো দিন। যতক্ষণ না তা গলে বাদামি রঙের হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি নাড়তে থাকুন। এবার খই দিয়ে অল্প একটু নেড়ে ঘি, ছোট এলাচের গুঁড়ো দিয়ে আর একটু নাড়িয়ে নামিয়ে নিন। হালকা গরম অবস্থায় মিশ্রণটিকে অল্প অল্প করে নিয়ে হাতের চাপে মোয়ার আকার দিন। তৈরি বাংলার হারিয়ে যাওয়া মিষ্টি খইচুড়।

কস্তার লাড্ডু

এই মিষ্টির উদ্ভবের কারণটি বেশ রাজকীয়। শোনা যায়, মানভূম কাশীপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহকে সন্তুষ্ট করতে কারিগররা সৃষ্টি করল এক ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি। বলা হয়, এ মিষ্টি রাজারও বেশ পছন্দের ছিল। শোনা যায় এটি মানভূম তথা পঞ্চকোট রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি।

উপকরণ: ময়দা ২৫০ গ্রাম, চিনি ২০০ গ্রাম (গুঁড়ো করা), মশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ (জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি,

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার দ্বারা যে বিপুল পরিমাণে খাদ্য পরিবেশিত হয়েছিল সেখানে মিষ্টি বলতে ছিল ‘উত্তম ক্ষীরসা দিয়ে গঙ্গাজলি লাড়ু।’ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-তেও এই মিষ্টির খোঁজ মেলে চৈতন্যের জন্য নিয়ে যাওয়া মিষ্টির প্রসঙ্গে।



গঙ্গাজলি



খইচুর



এই মিষ্টির উদ্ভবের কারণটি বেশ রাজকীয়। মানভূম কাশীপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহকে সন্তুষ্ট করতে কারিগররা সৃষ্টি করল এক ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি। রাজারও বেশ পছন্দের মিষ্টি কস্তার লাড্ডু।

কেশর মিশিয়ে গুঁড়ো করা)।

প্রণালী: অল্প আঁচে একটি ফ্রাইং প্যানে খোয়াক্ষীর দিয়ে তার উপর ময়দা দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন যাতে কোনও রকম ডেলা না থেকে থাকে। তার মধ্যে চিনির গুঁড়ো দিয়ে নাড়তে থাকুন পাক দেওয়ার মতো ঘন না হওয়া অবধি। ঘন হয়ে এলে জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, কেশরের গুঁড়ো করা মশলা মিশিয়ে দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার হাতের তালুর সাহায্যে গোল গোল আকার দিয়ে পরিবেশন করুন কস্তার লাড্ডু।

কানসাট

বিজয় সাহা ও তাঁর পূর্বপুরুষের জন্মস্থান ছিল বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে কানসাট নামক এক প্রাচীন জনপদ। এই জনপদের নামানুসারে এই মিষ্টির নাম বিজয় সাহা রাখেন কানসাট।

উপকরণ: দুধ ১ লিটার, ভিনিগার ১/২ কাপ



কস্তার লাড্ডু

অথবা পাতিলেবু ২টো (রস), সুজি ১/২ কাপ, চিনি ২ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, জল ২ কাপ, ছোট এলাচ ২টো (থেঁতো করা), খোয়াক্ষীর ৩৫০-৪০০ গ্রাম, ঘি ১/২ কাপ।

প্রণালী: দুধ ফুটিয়ে তাতে লেবুর রস বা ভিনিগার দিয়ে ছানা কাটিয়ে নিন। ছানাকে মসৃণ কাপড়ের মধ্যে রেখে ছেঁকে নিন। লেবুর টকভাব কাটানোর জন্য তাতে ঠান্ডা জল ঢালুন। কাপড়টিকে ভাল করে চেপে ছানা থেকে সমস্ত জল বার করে নিন। এরপর সুজি, বেকিং পাউডার মিশিয়ে ভাল করে মেখে ছোট ছোট করে কেটে নিন। হাতে মাখন মাখিয়ে ছোট ছোট করে কেটে নেওয়া লেচিগুলোকে লম্বা আকার দিন। আর-একটি পাত্রে ৪ কাপ জল ও চিনি ফোটান। চিনির রস ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে কেটে রাখা লেচি দিন। ঢাকনা দিয়ে সেটিকে ফুটতে দিন। কিছুক্ষণ পর মিষ্টি ফুলে উঠবে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর ১ কাপ করে গরম জল ঢেলে দিন। দেড়ঘণ্টা ধরে এই ভাবেই করতে থাকুন যতক্ষণ না মিষ্টিগুলো লালচে বাদামি হয়ে ওঠে ও চিনির রস কমে যায়। খোয়াক্ষীরকে হাত দিয়ে মেখে মসৃণ করে তাকে অর্ধেক ডিমের মতো আকার দিন ও তার মধ্যে চমচমগুলো ঠান্ডা করে পুর ভরে দিন। এবার একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে তাতে ভাল করে ঘি মাখিয়ে তাতে মিষ্টি চমচম দিয়ে একটু এদিক-ওদিক করে নামিয়ে নিন।

আনন্দনাড়ু

সাধারণত এই মিষ্টি বিয়ে অথবা পুজো উপলক্ষে ব্যবহার হত। তার জন্যই মিষ্টির এই নামকরণ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই নাড়ুর প্রচলন আজও থাকলেও বাড়িতে বানানোর চল ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। রইল এই মিষ্টির সন্ধান।

উপকরণ: ময়দা ১/২ কাপ, তেল ৫০ গ্রাম, চিনিগুঁড়ো ১ কাপ, চালগুঁড়ো ১ ১/২ কাপ, ঘি ১ টেবলচামচ, সাদা তেল ৩৫০ গ্রাম।

প্রণালী: একটি পাত্রে ময়দা, চালগুঁড়ো ও চিনিগুঁড়ো একসঙ্গে অল্প অল্প জল দিয়ে ভাল করে মেখে একটা মণ্ড তৈরি করুন। মণ্ড থেকে ছোট ছোট করে টুকরো কেটে নিন। হাতের তালুতে ঘি লাগিয়ে টুকরোগুলিকে নাড়ুর আকার দিন। ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়ুর দু'পিঠ বাদামি করে ভেজে নিন। তৈরি বাংলার আনন্দনাড়ু।

দশমীর দিন এভাবেই দোকানের মিষ্টির পরিবর্তে বাড়িতে তৈরি করে ফেলুন বাংলার হারানো মিষ্টি। উৎসবের মরশুমে অথবা বিজয়ার ঐতিহ্যে ফিরে আসুক বাংলার হারানো ঐতিহ্য ও গৌরব। রেডিও-তে শোনা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়ার মতো বাংলার এই মিষ্টিগুলোও হয়ে উঠুক বাঙালির নস্টালজিয়ার প্রতীক। রসগোল্লা, সন্দেশের মতো বেঁচে থাক বাংলার মোয়া, আনন্দনাড়ুরা। গ্লোবালাইজ়েশনের যুগে স্ট্রবেরি ও পুডিং-কে পাল্লা দিয়ে বাংলার মডিউলার কিচেন ভরপুর হয়ে উঠুক প্রাচীন ভিয়েনের স্বাদে-গন্ধে।

যোগাযোগ: ৮৯৬১৮৩৫০৯৫
ছবি: শুভদীপ ধর




কানসাট


আনন্দনাড়ু











ফোকাসে বাংলাদেশ

গত দু'-তিনবছরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সৌজন্যে উল্কাসম উত্থান হয়েছে বাংলাদেশের কনটেন্টের। পরের পর সিরিজ় জনপ্রিয়তা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। দু'বাংলার জনপ্রিয় কিছু ওয়েব সিরিজের পাঁচ কলাকুশলীদের সাক্ষাৎকারে 'সানন্দা'।













ভাষাগত মিল থাকার কারণে এপার বাংলা-ওপার বাংলার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ যে সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়ে এসেছে, ওটিটি মারফত আবারও সেই আদানপ্রদানের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছে, দুই বাংলার কাছেই তা আনন্দের। এপার বাংলার দর্শকরা যে অকুণ্ঠ ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন 'কারাগার', 'মহানগর' কিংবা 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান'-এর মতো সিরিজ়কে, তাও তো দুই বাংলার সম্প্রীতিরই সম্প্রসারণমাত্র। আর এই সৌহার্দ্য এপার বাংলার কাছে যতটা কাঙ্ক্ষিত, ওপার বাংলার শিল্পীদের কাছেও এই ভালবাসা ততটাই গৌরবের। তেমনটাই প্রকাশ পেল সাম্প্রতিককালে ওটিটি-র সূত্রে খ্যাতির শীর্ষে ওঠা পাঁচ কুশীলবের বয়ানে...



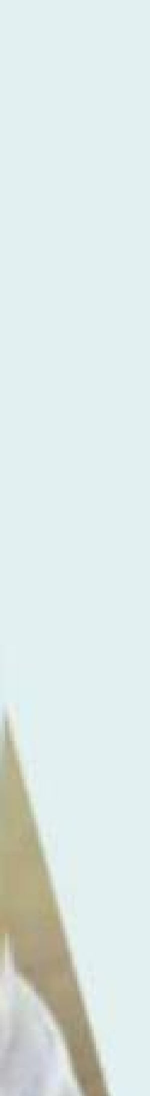


চঞ্চল চৌধুরী

চঞ্চল চৌধুরী, *অভিনেতা*
উল্লেখযোগ্য কাজ: *কারাগার, লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান, তকদির ইত্যাদি*

> "কলকাতার দর্শকদের ভালবাসা পাওয়ার অনুভূতি অনেকটাই আলাদা। সিরিজ়ের সাফল্যের আনন্দ তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে এদেশেও যে আমাদের মতো শিল্পীদের একটা ফ্যানবেস তৈরি হচ্ছে, এদেশের পত্র-পত্রিকায় আমাদের কথা লেখা হচ্ছে, এগুলো আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।"

এই বাংলায় ওপার বাংলার শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাম অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর। এদেশের মানুষের কাছে তাঁর প্রথম ওটিটি-তে আত্মপ্রকাশ 'তকদির'-এ। অভিনেতা হিসেবে নজর কেড়েছিলেন তখনই, তবে 'কারাগার'-এর অভূতপূর্ব সাফল্য ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী সব পারফরম্যান্সকে। সেই প্রসঙ্গ তুলতেই বিনয়ী কণ্ঠে বললেন, কলকাতার দর্শকদের ভালবাসা তাঁর বিরাট প্রাপ্তি। "দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করছি, প্রথমদিকে প্রচুর 'পাসিং ক্যারেক্টার' করেছি। তারপর একটা-দুটো সংলাপ, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মুখ্য চরিত্র... এই গোটা জার্নিটাই খুব স্পেশ্যাল আমার কাছে। তবে বাংলাদেশের মানুষ আমার কাজ বহুদিন ধরে দেখছেন, তাঁরা আমায় চেনেন। ফলে কোথাও গিয়ে তাঁদের ভাললাগাটাও আমার কাছে চেনা। কলকাতার দর্শকদের ভালবাসা পাওয়ার অনুভূতি অনেকটাই আলাদা। সিরিজ়ের সাফল্যের আনন্দ তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে এদেশেও যে আমাদের মতো শিল্পীদের একটা ফ্যানবেস তৈরি হচ্ছে, এদেশের পত্র-পত্রিকায় আমাদের কথা লেখা হচ্ছে, এগুলো আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।" এর আগে জ়ি ফাইভে 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান' এবং হইচই-তে 'তকদির'-এ দেখা গিয়েছে তাঁকে। সিরিজ় হিসেবে সে দু'টিও বেশ সফল। বলাই বাহুল্য, জনপ্রিয়তায় 'কারাগার' সেই তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। প্রসঙ্গত জানালেন, এতদিনের অভিনয়জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং চরিত্র ছিল এটি। "আসলে 'কারাগার'-এর গল্পটাই একদম আলাদা। এরকম গল্প নিয়ে এর আগে কাজ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমিও দর্শকদের কাছে নতুনভাবে পৌঁছতে চাইছিলাম, যে সুযোগটা 'কারাগার' আমায় দিয়েছে। এর আগে 'তকদির'-এ কাজ করেছিলাম পরিচালক সৈয়দ আহমেদ শওকির সঙ্গে। ওঁরই দ্বিতীয় প্রজেক্ট এটা। চরিত্রটাও বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। এর আগে যে ক'টা চরিত্রে অভিনয় করেছি, সবেতেই সংলাপ ছিল। 'কারাগর'-এ আমার কোনও সংলাপ নেই। আমার চরিত্র পুরোপুরি কমিনিউকেট করেছে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজে, যেটা আমি জানতাম না। আলাদা করে শিখতে হয়েছে, প্রায় তিনমাস ধরে। আমার মনে হয়, গল্পের এই স্বাতন্ত্র্যতাগুলো দর্শকদের চোখেও ধরা পড়েছে। আর সেটা আমাদেরও ভাললাগার জায়গা। যে নতুন ধরনের গল্প বা চরিত্র উপস্থাপিত করতে চাইছিলাম, সেই কাজটা সফলভাবে করতে পেরেছি।" এপার বাংলা তথা বাংলাদেশের বাইরে তাঁর আজ যা পরিচিতি, তার অনেকটা কৃতিত্বই ওটিটি-কে দেন চঞ্চল চৌধুরী। মনে করেন, দুই বাংলার নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও অনেকাংশে সম্ভব করে তুলেছে এই নতুন বিনোদনমাধ্যম। যদিও ওটিটি-কে সিনেমার বিকল্প বলে মানতে নারাজ তিনি। "সব অভিনেতারই লক্ষ্য থাকে বড় পর্দা। কিন্তু অতিমারির পর থেকে সেই ধারা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে 'হাওয়া' বলে আমার একটি ছবি চলছে, পঞ্চম সপ্তাহ। দর্শকরা হলে গিয়ে ছবি নিশ্চয়ই দেখছেন, তবে এখনও তা অতিমারি-পূর্ববর্তী পর্যায়ে পৌঁছয়নি। ফলে





'তকদির'-এর দৃশ্য



সব অভিনেতা-পরিচালকদের কাছেই এরকম সময়ে দাঁড়িয়ে মাধ্যমের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দর্শকদের কাছে পৌঁছনো। ওটিটি না থাকলে অতিমারির পর বিনোদন জগতের ঘুরে দাঁড়ানোই হয়তো সম্ভব হত না। তাছাড়া এই যে এত সহজে দেশ-ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারছি, অভিনেতা হিসেবে এটাও তো কম সৌভাগ্যের নয়! বিশেষ করে যদি দুই বাংলার কথা বলি, সেই সাদা-কালো সময় থেকে, যখন দুই বাংলা এক ছিল, তখন থেকে কলকাতার চলচ্চিত্র দেখছি। আমাদের কাজও কলকাতার মানুষ দেখে আসছেন। দুই বাংলার শিল্পীরা একসঙ্গে কাজও করেছেন আগে। মাঝে বিভিন্ন কারণে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওটিটি-র কারণে এখন আর কোনও বাধা নেই। সেটাও নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। তবে ওটিটি কখনওই সিনেমার বিকল্প হতে পারে বলে আমি মনে করি না। বড় পর্দার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, যেটা মোবাইল বা টিভির পর্দায় পাওয়া যায় না। ওটিটি-র কনভিনিয়েন্স অবশ্যই বেশি, তবে বড় পর্দার অনুভূতিও একেবারেই আলাদা।” ছোট পর্দা, বড় পর্দা, ওটিটি-র আগে দীর্ঘদিন থিয়েটারে কাজ করেছেন তিনি। জানালেন, প্রত্যেক মাধ্যমের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কাজের ধরন, অভিনয়ের কৌশলেও তফাত রয়েছে এবং এই প্রতিটা মাধ্যমে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন তিনি। “মাধ্যম-নির্বিশেষে কিছু বিষয়, তেমন চরিত্রে ঢোকা বা বেরনো, ইত্যাদি বেসিকগুলো হয়তো একই। তবে সব মাধ্যমের আলাদা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মঞ্চে অভিনয় করার সময় যে কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়, যেমন লাউড এক্সপ্রেশন, উচ্চস্বরে কথা বলা, যাতে হলের সব দর্শকের কাছে পৌঁছনো যায়, ক্যামেরার সামনে সেগুলো করা সম্ভব নয়। ক্যামেরায় সামান্য কিছু বেশি হলেই, তা স্পষ্ট ধরা পড়ে দর্শকদের চোখে। ক্যামেরার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ অত্যন্ত জরুরি বিষয়। মঞ্চ থেকে যখন ক্যামেরার সামনে অভিনয় করা শুরু করি, এই কৌশলগুলো নতুন করে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। ওটিটি ছোট পর্দা হলেও, কাজের ধরনে কিন্তু অনেকটাই বড় পর্দার সমকক্ষ। সিনেমার ক্ষেত্রে যেমন এক-একটা প্রজেক্টে প্রায় ছ’মাস সময় লাগে বা গল্প, স্ক্রিপ্টিং, প্রি-প্রডাকশনের উপর জোর দেওয়া হয়, ওটিটি-তেও সবকিছুর উপর সেরকমই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ সিরিজ হলেও, দর্শকরা কিন্তু ফিল্মের মতোই গ্রহণ করছেন ওটিটি-র বিভিন্ন প্রজেক্ট। দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন যে, তুলনাটা সিনেমার সঙ্গেই করা হয়। উপরন্তু, অভিনেতা হিসেবে যা যা চাহিদা থাকে প্রজেক্ট ঘিরে, সবই পূরণ করছে ওটিটি। চরিত্র, গল্প ধরে ধরে নির্মাণ করা হচ্ছে, নির্মাণের মধ্যে আধুনিকতা রয়েছে এবং দর্শকরাও সাগ্রহে গ্রহণ করছেন কাজগুলো। ফলে বড় পর্দার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও, বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি এই নতুন মাধ্যমে।” অভিনেতা হিসেবে বরাবরই নিজের সেরাটুকু দর্শকদের দিয়ে এসেছেন চঞ্চল চৌধুরী। তবুও, সফল অভিনেতা হিসেবে তাঁর কাজের পরিমাণ বাকিদের তুলনায় অনেকটাই কম। কারণ হিসেবে বললেন, স্ক্রিপ্ট বাছার ক্ষেত্রে তিনি নাকি একটু বেশিই সতর্ক থাকেন। গল্প, চরিত্র, নির্মাতা, সহ-অভিনেতা, টেকনিক্যাল টিম, বাজেট... তাঁর মতে কোনওটার সঙ্গেই আপস করে ভাল কাজ সম্ভব নয়। জীবনঘনিষ্ঠ গল্প, চ্যালেঞ্জিং চরিত্র, যেখানে নিজের ব্যক্তিগত ইমেজ ভেঙে বেরনোর অবকাশ থাকে, এমন চরিত্র তাঁকে মানসিক পরিতৃপ্তি দেয়। দর্শকদের চোখে সেই চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যে বাড়তি এফর্ট দিতে হয়, সেই স্ট্রাগলও বেশ উপভোগ করেন তিনি। অভিনয়ের বাইরে বেশিরভাগ সময়টাই কাটান পরিবারের সঙ্গে। ছেলেকে নিয়মিত সময় দেওয়া, গান শোনা, গান গাওয়া, সিনেমা দেখা ইত্যাদি তাঁর রোজনামচার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। আপাতত বাংলাদেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’-র বেশ কিছু নতুন প্রজেক্ট সামনে রয়েছে তাঁর, কিছু প্রজেক্ট আলোচনাপর্বে রয়েছে। পাশাপাশি চলছে টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপনের নিয়মিত কাজ। “আসলে আমি খুব কম কাজ করি। একটা প্রজেক্ট শেষ হলে, পরবর্তী কাজ বাছতে অন্তত মাসদুয়েক সময় নিই।” টলিউডে কাজ করার বিষয়েও তিনি আগ্রহী, প্রসঙ্গত জানালেন সেকথাও। “গত দু’মাসে টলিউড থেকে বেশ কিছু প্রজেক্টের প্রস্তাব এসেছে। একটু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে বা দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি। তাছাড়া বাংলাদেশে অনেক নির্মাতা-পরিচালকদের সঙ্গেই কাজ করেছি বা তাঁদের কাজ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে আমার। কলকাতার ইন্ডাস্ট্রি সেই তুলনায় আমার কাছে একেবারেই নতুন। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় লাগছে। অনেকের কাজই বেশ ভাল লাগে। ভাল প্রজেক্ট পেলে অবশ্যই করব, সেটা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আসুক না কেন।”

সাক্ষাৎকার: সায়নী দাশশর্মা

আশফাক নিপুন, *পরিচালক*

উল্লেখযোগ্য কাজ: *মহানগর, কষ্টনীড়, সাবরিনা ইত্যাদি*



‘মহানগর’

টেলিভিশন দিয়েই মূলত কেরিয়ার শুরু করেছিলেন পরিচালক আশফাক নিপুন। কিন্তু গত কয়েকবছরে একাধিক ওয়েব সিরিজের দৌলতে দু’বাংলাতেই জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে একলাফে বহুগুণ। তবে পরিচালনায় আসাটা একেবারেই আকস্মিক ছিল তাঁর কাছে। “আমার পরিবারে কেউ কখনও টিভি, সিনেমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

না। আমারও কোনও পরিকল্পনা ছিল না। আমি ঢাকায় বড়ও হইনি, চট্টগ্রামে বড় হয়েছি। কিন্তু ছোট থেকেই প্রচুর সিনেমা দেখতাম। সেখান থেকেই গল্প বলার আনন্দ ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম। মাস্টার্স করার সময়েই মোস্তাফা সরয়ার ফারুকির সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি চট্টগ্রামে আসছিলেন একটি ছবির শুটিংয়ে, ২০০৩-০৪ সালের কথা। আমি ভাবলাম ওঁকে লোকেশন ইত্যাদি নিয়ে সাহায্য করতে পারব। এভাবেই ওঁর প্রোডাকশন টিমে ঢুকে গেলাম। এর আগে ওঁর সঙ্গে একটি ওয়র্কশপে আলাপ হয়েছিল প্রাথমিকভাবে, ২০০৩ সালে। কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও বললাম আমি ফিল্মমেকিং করতে চাই। ২০০৫-এ ফারুকি ভাইয়ের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু। এরপরে ফার্স্ট এডি, সেকেন্ড এডি এভাবে এগোতে থাকলাম আর শিখতে লাগলাম। ২০০৬-এ আমি নিজের পরিচালনায় নাটক বানাই। নিজের প্রোডাকশন কোম্পানি খুললাম, 'প্যাক আপ ফিল্মস' বলে। শুরুটা এভাবেই,'' জানালেন আশফাক। তাহসান খান ও রাফিয়াত রাশিদ মিথিলাকে নিয়ে ২০১৩-তে 'ল্যান্ডফোনের দিনগুলোতে প্রেম' বলে একটি টেলিভিশন ফিকশন করেন তিনি। বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে ওটাই ছিল তাঁর প্রথম বড় ব্রেক। সাম্প্রতিককালে তিনটি ওয়েব সিরিজ় দু'বাংলাতেই জনপ্রিয় হয়েছে আশফাকের: 'সাবরিনা', 'কষ্টনীড়' ও 'মহানগর'। ''২০১৯-এর শেষের দিকে সংশ্লিষ্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্মের তরফ থেকে বাংলাদেশে কনটেন্ট প্ল্যানিংয়ের জন্য যিনি এসেছিলেন (অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে খেলাধুলো, খাদ্যাভ্যাস, সাহিত্য সব নিয়ে কথা হল...কিন্তু কাজের গল্প বলা হল না। এই অকাজের গল্পই আসলে কাজে দিল। দিন দুয়েক পরে উনি আমায় ফোন করলেন, আমি 'সাবরিনা'র সিনপসিস দিলাম। উনি বললেন স্ক্রিপ্ট পাঠাতে। কিন্তু আমি কখনওই আগে থেকে স্ক্রিপ্ট বা সংলাপ লিখতে পারি না। ওগুলো সব শুটিং স্পটে বসে হয়। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল, কাজটা হল না। দু'মাস পরে উনি আবার ৯০ মিনিটের কনটেন্ট চাইছিলেন। ওভাবেই 'কষ্টনীড়'-এর জন্ম। এরপরে ওঁদের 'মহানগর'-এর গল্প দিই। থানার এক রাতকে কেন্দ্র করে আট পর্বের গল্প। ২০২১-এ কোভিডের মাঝখানেই 'মহানগর'-এর শুটিং করি। সিদ্ধান্ত নিলাম, ঢাকার বাইরে চলে যাব। ওখানেই থানার সেট তৈরি করে ২০ দিন থাকব ইউনিটের সবাই মিলে। কোথাও বেরব না। ওই সিরিজ় দু'বাংলাতেই বিশাল হিট হয়! এরপরে দর্শকদের বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও

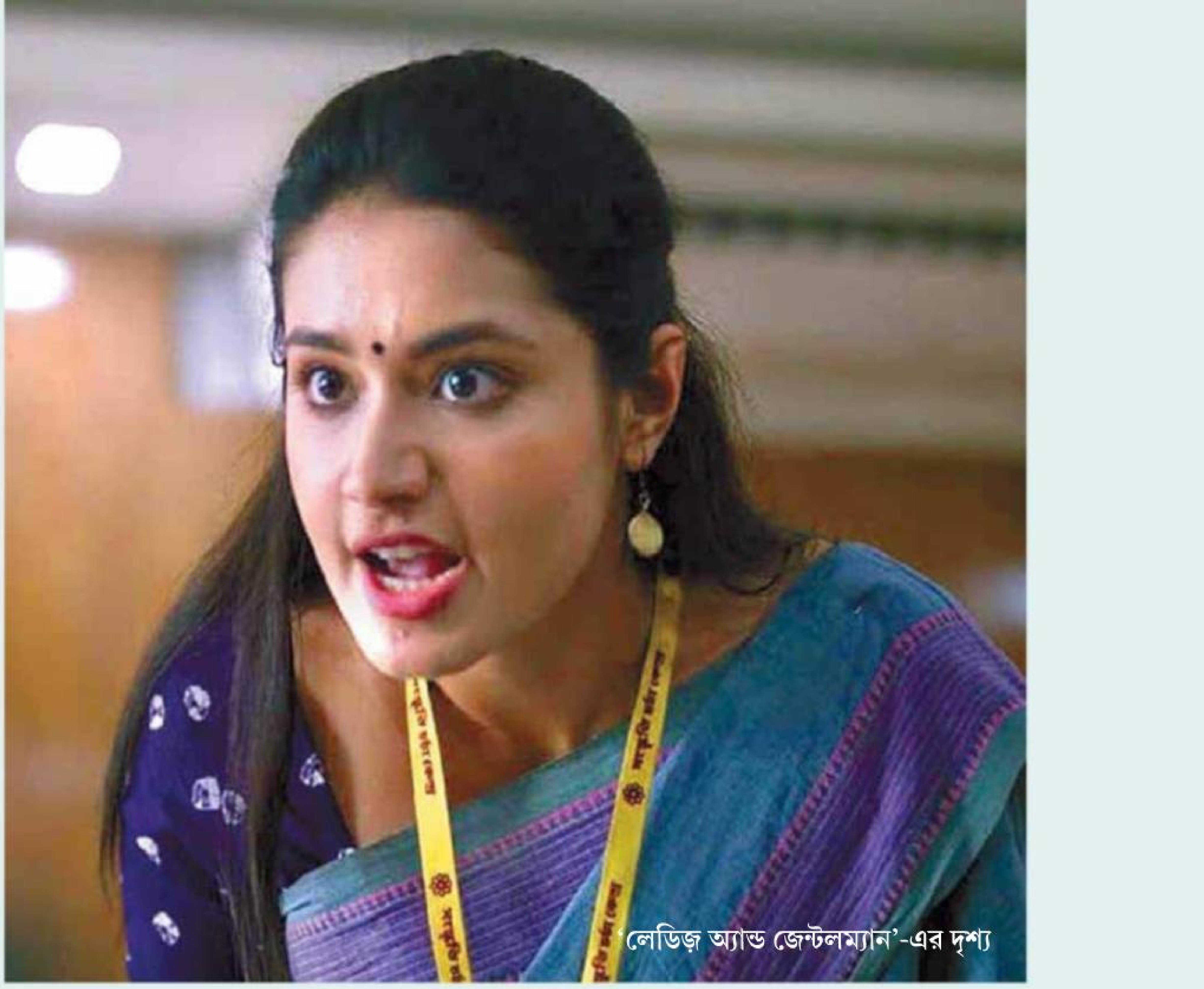

আশফাক নিপুন

''দু'বাংলার মানুষ টিভি বা সিনেমার কাজ দেখতে পান না, পলিসিগত কারণে। ওটিটি এসে এই বাধা মুছে দিল। 'মহানগর' দেখার পরে প্রসেনজিৎদা (চট্টোপাধ্যায়) ও অনির্বাণ (চট্টোপাধ্যায়) ফোন করেন। আমাদের কনটেন্ট এত মানুষ পছন্দ করছেন, খুব গ্র্যাটিফায়িং অভিজ্ঞতা।''

'মহানগর টু' নয়, অন্য ধাঁচের 'সাবরিনা' করতে চাইলাম। 'সাবরিনা'র কেন্দ্রে দুই নারী। এই প্রসঙ্গে বলি, বাংলাদেশে একজন পরিচালকের শুরুটা হয় টেলিভিশনের মাধ্যমে নয় বিজ্ঞাপনে। আমি টেলিভিশন দিয়েই শুরু করেছিলাম। কিন্তু ওটিটি-তে কাজের প্রস্তাব পাওয়ার পরে টেলিভিশনে কাজ করা পুরো বন্ধ করে দিই। এরপরে ওটিটি-তে অবশ্যই আরও কাজ করতে চাইব, কারণ গল্প বলার একটা বিশালতা আছে এই মাধ্যমে। বাংলাদেশের সিনেমা কলকাতায় মুক্তি পায় না। দু'বাংলার মানুষ টিভি বা সিনেমার কাজ দেখতে পান না, পলিসিগত কারণে। ওটিটি এসে এই বাধা মুছে দিল। 'মহানগর' দেখার পরে প্রসেনজিৎদা (চট্টোপাধ্যায়) ও অনির্বাণ (চট্টোপাধ্যায়) ফোন করেন। আমাদের কনটেন্ট এত মানুষ পছন্দ করছেন, খুব গ্র্যাটিফায়িং,'' বললেন আশফাক। তাঁর সিরিজ়ে মোশাররফ করিম (মহানগর), মেহ্জাবিন চৌধুরি (সাবরিনা), জ়াকিয়া বারি মম (মহানগর)-এর মতো পাওয়ারফুল অভিনেতারা কাজ করেছেন। কাস্টিংয়ের পদ্ধতিটা কীরকম? ''সবসময় আমি ভাল অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। কারণ, আমি তো আগেভাগে স্ক্রিপ্ট করি না। অন সেট সিন তৈরি করি, সংলাপ লিখি। এটা সঠিক কিনা জানি না, কিন্তু এটাই আমার পদ্ধতি। তাই, খুব দক্ষ অভিনেতা নাহলে মুশকিল। আমি কোনও অভিনেতাকে মাথায় রেখে চরিত্র বা গল্প ভাবি না। 'মহানগর' আগে লেখা হল, তারপর বুঝলাম মোশাররফ করিম ছাড়া ওরকম ডার্ক হিউমর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। চরিত্রগুলো চিন্তা করলে কাকে চোখের সামনে দেখতে পাই,

তাঁকেই আমি কাস্ট করি। আর অভিনেতারা যেন আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন, এটা নিশ্চিত করি'' বললেন পরিচালক। কলকাতায় একাধিকবার এসেছেন। একা বা স্ত্রীকে নিয়ে কাজের সূত্রে বা ঘুরতে এসেছেন বহুবার। ''কলকাতাকে ভালবাসার একটি দিক হল ভাষাগত সাযুজ্য। কলকাতার স্ট্রিট ফুড খুব পছন্দ। কলকাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের শহর। ওই ফ্যাসিনেশন সবসময় কাজ করে। এখনও অবধি কলকাতায় কখনও বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়নি,'' বলে থামলেন তিনি।

সাক্ষাৎকার: মধুরিমা সিংহ রায়


'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান'-এর দৃশ্য

তসনিয়া ফরিন, *অভিনেত্রী*
উল্লেখযোগ্য কাজ: *লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান, কারাগার ইত্যাদি*

অভিনেত্রী হওয়ার পরিকল্পনা ছিল না তসনিয়ার। বিজ়নেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে পড়ছিলেন। ভেবেছিলেন ব্যবসা করবেন, অন্ত্রপ্রনর হবেন। জানালেন, মূলত মায়ের উৎসাহেই তাঁর অভিনয় জগতে আসা। ২০১৭ সাল থেকে কাজ শুরু করেন, একটা বিলবোর্ড দিয়ে। ''তখন সবে ভর্তি হয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। টুকটাক টিভিসি করতাম, পড়াশোনার ফাঁকে। আমার কাছে ওটা ছিল পকেটমানি রোজগার করার উপায়। ওই বছরই একটা নাটকেও কাজ করেছিলাম, 'আমরা ফিরব কবে' নামে। ভাল প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে নাটকে আর মন দিইনি, টিভিসি-ই করছিলাম। ২০১৯ সালে আমার গ্র্যাজুয়েশন হয়। ওই বছরই 'এক্স বয়ফ্রেন্ড' নামে একটা ড্রামায় অভিনয় করেছিলাম। সেটার মুক্তির পর থেকেই যেন রাতারাতি আমি অনেক বেশি পরিচিত হয়ে গেলাম দর্শকের কাছে। তখন থেকেই নাটকে কাজ করা শুরু করি ধীরে ধীরে। এটাকে আমার অভিনয়জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারেন। আর একটা মোড়-ঘোরানো ঘটনা হল, 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান'এ কাজ করা। অভিনেতা হিসেবে যে পরিচিতি ওখান থেকে পেয়েছিলাম, তার আগে অতটা পাইনি। এরপর আর খুব বেশি পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।'' 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান'এর মতো কাজ আরও বেশি হওয়া উচিত বলে মনে করেন তসনিয়া। ''আমার মনে হয় এই ধরনের ইসুভিত্তিক কনটেন্টের জন্য ওটিটি একদম সঠিক মাধ্যম। ছবিতে হয়তো আমরা সব ধরনের গল্প বলে উঠতে পারি না সেন্সরশিপের কারণে। ওটিটি-তে সেই পরিসরটা পাই, যেখানে সমসাময়িক এবং সময়োপযোগী গল্পগুলোকে পৌঁছে দেওয়া যায় দর্শকের কাছে। 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান' খুবই সাহসী প্রচেষ্টা ছিল। নিপুন ভাইয়ের (আশফাক নিপুন, পরিচালক) 'মহানগর'এও আমার মনে হয়েছে, সামাজিক ইস্যুগুলোকে নিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের কনটেন্টের সঙ্গেদর্শক যেমন একাত্মবোধ করেন, তেমনই তাঁদের মধ্যে চারপাশের পরিস্থিতি, সমাজ নিয়ে বোধেরও উদয় হয়।'' 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান'এর পাশাপাশি 'কারাগার'ও দুই বাংলাতেই দর্শকের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছে। এই বিষয়টা, তসনিয়ার কাছে যাকে বলে 'প্লেজ়্যান্ট সারপ্রাইজ়'!

''আমার মনে হয় এই ধরনের ইসুভিত্তিক কনটেন্টের জন্য ওটিটি একদম সঠিক মাধ্যম। ছবিতে হয়তো আমরা সব ধরনের গল্প বলে উঠতে পারি না সেন্সরশিপের কারণে। ওটিটি-তে সেই পরিসরটা পাই, যেখানে সমসাময়িক এবং সময়োপযোগী গল্পগুলোকে পৌঁছে দেওয়া যায় দর্শকের কাছে।''

''মে মাসে যখন কলকাতায় আসি, তখন বুঝতে পারি মানুষ কতটা ভালবেসে, মন দিয়ে আমার কাজ দেখেছেন। এমনও হয়েছে, শপিংমলে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তাঁরা আমার অভিনীত নাটকের নাম, পরিচালকের নাম সহ বলে দিয়েছেন। বিশেষ করে 'লেডিজ় অ্যান্ড জেন্টলম্যান'এর কথা তো আমি বহু মানুষের কাছে শুনেছি। আমরা দুই বাংলার মানুষরা যে কনটেন্টের মাধ্যমে এভাবে জুড়ে থাকতে পারছি, এই অনুভূতিটাই তো দারুণ!'' অতনু ঘোষের পরিচালনায় কলকাতার একটি ছবিতে কাজ করছেন তসনিয়া। সেই সুত্রে চলতি বছরে অনেকবার কলকাতায় এসেছেন। জানালেন, একটা ওয়েব সিরিজ় নিয়েও কথা চলছে। এখানকার খাবারদাবার, শপিং করা খুব ভাল লাগে তাঁর। বললেন, ''ওয়েব সিরিজ়ের কথাবার্তা যদি ব্যাটে-বলে মিলে যায়, তা হলে কলকাতায় তিন-চার মাস থাকা হবে।'' পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও পরিচালক আছেন, যাঁর ছবিতে কাজ করা রয়েছে উইশলিস্টে? ''ওভাবে ভাবি না আসলে। আমার কাছে বিষয় আর গল্পই হল আসল,'' বয়ান তসনিয়ার।

সাক্ষাৎকার: সংবেত্তা চক্রবর্তী


তসনিয়া ফারিন

সৈয়দ আহমেদ শওকি, *পরিচালক*
উল্লেখযোগ্য কাজ: *কারাগার, তকদির ইত্যাদি*

কিছুদিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কারাগার' অসম্ভব প্রশংসিত হয়েছে দুই বাংলাতেই। কলাকুশলীরা তো বটেই, ছবির পরিচালক সৈয়দ আহমেদ শওকি এপার বাংলায় নতুন করে আবিষ্কার করেছেন তাঁর জনপ্রিয়তা। পরিচালক হিসেবে 'কারাগার'-এর নেপথ্যের চিন্তাভাবনার কথা জানাতে গিয়ে শওকি বললেন, ''আমরা ভাবতে পারিনি এরকম একটা গল্প এগজ়িকিউট করতে পারব। একটা আগে না দেখা পৃথিবী...কোথায় শুট করব তাও ঠিক ছিল না। কারণ, এরকম একটা সিরিজ়ের শুটিং কৃত্রিম সেট তৈরি করে করা সম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে, একটি পরিত্যক্ত জেল পাই। অনেক কষ্টে সেখানে অনুমতি নিয়ে শুটিং শুরু করি। ওই জেল না পেলে হয়তো গল্পটাই বলা হত না! তবে লোকেশন একবার পেয়ে যাওয়ার পরে সংশয়ের জায়গাটা দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সিরিজ়ে যদি কেউ একটি দৃশ্যেও অভিনয় করেন, তাঁকেও পুরো গল্প জেনে এই সিরিজ়ের সমান অংশ হতে হত। এটাই শর্ত ছিল, যেন প্রত্যেক অভিনেতাকে গল্পটা এক্সাইট করে! ৫০০ পাতার স্ক্রিপ্ট, তাকে এক মাসের মধ্যে শুটিং করা সম্ভবই হত না সকলের তরফে এই এক্সাইটমেন্ট না থাকলে।'' চঞ্চল চৌধুরির সঙ্গে এর আগেও কাজ করেছেন শওকি। তবে নতুন করে জুটি বাঁধার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। ''প্রথমবার যখন কাজ করেছিলাম, আমি তখন নতুন। আর এবারে একদিন শুটিং করার পরেই বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উনিও বুঝে গিয়েছিলেন আমি কীভাবে পরিচালনা করব। এখন কমফর্ট লেভেল এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যে অন ক্যামেরা বা অফ ক্যামেরা কথা না বললেও একে অপরকে বুঝে যাই আমরা (হাসি)! অভিনেতাদের ইগো বাইরে রেখে সেটে আসতে হবে, এটাই শর্ত ছিল কাস্টিংয়ের। সত্যি বলতে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তা সে আফজ়ল হোসেনের মতো সিনিয়র অভিনেতা বা নবাগত কেউ, প্রত্যেকেই নতুন ভাবনা বা পরীক্ষানিরীক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। এটাই বোধহয় কাজটাকে আরও সহজ করে দিয়েছিল,'' মত শওকির। এই সিরিজ়ের পোস্ট প্রোডাকশনের কিছু কাজ কলকাতায় হয়েছিল। রিলিজ়ের আগে কলকাতায় এসে পরিচালক কিছুটা বুঝতে পারেন যে এপার বাংলাতেও বেশ এক্সাইটমেন্টের আঁচ যথেষ্টই। ''তবে রিলিজ় হওয়ার পরে একটু টেনশনে ছিলাম এধরনের গল্প লোকে গ্রহণ করবেন কিনা। কিন্তু যা রেসপন্স পেয়েছি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের থেকে, তা এককথায় অসামান্য।'' ওটিটি-র দৌলতে এখন ভৌগোলিক গণ্ডি বা প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলা ভাষার মানুষদের কাছে পৌঁছনো। আর অবশ্যই নিজস্বতা বজায় রাখা। 'হইচই'-এর অফিসে প্রথম যে গল্প নিয়ে যাই, তা রিজেক্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে বুঝলাম এমন গল্প দরকার যা বাংলাদেশকে রিপ্রেজ়েন্ট করবে, আমাদের সংস্কৃতির ফ্লেভার থাকবে তাতে। তখনই তা ইউনিক হবে, সকলের ভাল লাগবে। অন্য দেশের সংস্কৃতি দেখতে মানুষ ভালবাসেন, পৃথিবীটা অনেক রিয়েলিস্টিক হয়ে ওঠে। এটা হয়তো কলকাতায় জনপ্রিয়তা



'কারাগার'-এর দৃশ্য বোঝাচ্ছেন

> ''আমার ইচ্ছে ছিল সারাদিন সিনেমা দেখব, সিনেমা দেখার জন্য কেউ আমাকে টাকা দেবেন (হাসি)! ২০০৯ নাগাদ তনিম নূরের একটি ছবিতে সহকারী ছিলাম। তারপর ২০১৬-১৭ থেকে ফিকশন বানাতে শুরু করি। আমরা যে কজন সহকারী ছিলাম, মোটামুটি সেই টিমটাই এখন কাজ করছি।''

ভাষার বিভেদ পেরনো সহজ হচ্ছে বলেই মনে করেন তিনি, ''আমাদের দেশে ইউটিউবে ফ্রি কনটেন্ট দেখতে পান মানুষ। সেখানে কোনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে সাবস্ক্রিপশন মডেলে যেতে হয়। তাই এমন কিছু কনটেন্ট বানাতে হত যা মানুষ পয়সা দিয়েও দেখতে চাইবেন। ওই সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গোয়েজ, ওই সিনেম্যাটিক ট্রিটমেন্টটা দরকার ছিল। ৩০ কোটি বাংলাভাষী মানুষের জন্য আমরা গল্প বলছি, এটায় মাথায় রাখতে হবে। ওটিটি ইজ় আ বিগ মার্কেট। অবাঙালি মানুষের মধ্যে হয়তো এখনও অতটা পৌঁছতে পারিনি, যদিও সেটা ধীরে ধীরে হবে। কিন্তু আমাদের পাওয়ার অন্যতম কারণ। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বাংলাদেশের প্রতি আলাদা ভালবাসা আছে।'' অ্যাক্সিডেন্টালি পরিচালনায় এসেছিলেন শওকি, ''আমার ইচ্ছে ছিল সারাদিন সিনেমা দেখব, সিনেমা দেখার জন্য কেউ আমাকে টাকা দেবেন (হাসি)! ২০০৯ নাগাদ তনিম নূরের একটি ছবিতে সহকারী ছিলাম। তারপর ২০১৬-১৭ থেকে ফিকশন বানাতে শুরু করি। আমরা যে ক'জন সহকারী ছিলাম, মোটামুটি সেই টিমটাই এখনও কাজ করি।'' সুখবরও দিলেন তিনি, 'কারাগার' সিজ়ন টু আসতে চলেছে। আর কলকাতাতেও যদি কাজের অফার পান, তিনি আগ্রহী গল্প বলতে। ভারতে কখনও শুটিং করেননি তিনি। কলকাতায় বরাবর গরম কালে এসেছেন, তাই দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সুখস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তাঁর। কিন্তু কলকাতার মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা অফুরান...

সাক্ষাৎকার: মধুরিমা সিংহ রায়



সৈয়দ আহমেদ শওকি

তনিম নূর, পরিচালক-প্রযোজক
উল্লেখযোগ্য কাজ: *কাইজ়ার, একাত্তর, কনট্র্যাক্ট, মানি হানি ইত্যাদি*

‘কাইজ়ার’, ‘একাত্তর’-এর দৌলতে দুই বাংলাতেই সমান সমাদৃত পরিচালক-প্রযোজক তনিম নূর। নিজের গল্প বলছিলেন তিনি, ‘‘আমার জন্ম এবং পড়াশোনা ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগের দৌলতে ছবির প্রতি আগ্রহ বাড়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি বানানোর পরিকল্পনা করি।’’ সেই ছবির নাম, ‘ফিরে এসো বেহুলা’। মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনিকেই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন তনিম তাঁর এই থ্রিলারে। ‘‘এই ছবিতেই একসঙ্গে কাজ করেছিলাম শওকির (সৈয়দ আহমেদ শওকি, ‘কারাগার’এর পরিচালক) সঙ্গে। তারপর থেকে বন্ধুত্বও হয়ে গেল। সেই বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর হয়েছে। আমাদের প্রডাকশন হাউস আলাদা, কিন্তু যে কোনও কাজেই একে অপরের পাশে থাকি আমরা। আমরা দু’জন এবং আরও কয়েকজন মিলে একটা সংস্থা করেছি, ফিল্ম সিন্ডিকেট নাম। ‘কাইজ়ার’, ‘কারাগার’, তা ছাড়া ‘উনলৌকিক’ নামে একটা সিরিজ়— এগুলো ওখান থেকেই প্রযোজনা করেছি আমরা।’’ এই সময় থেকেই ছবি করাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেন তনিম। টিভি কমার্শিয়াল, ডকুমেন্টারি ইত্যাদির কাজও করতে থাকেন। ‘ইতি তোমারই ঢাকা’ নামে ঢাকার উপরে একটি অ্যান্থোলজি ফিল্মের অন্যতম পরিচালক ছিলেন তিনি। বুসান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল ছবিটি। একে একে বানান ‘মানি হানি’, ‘একাত্তর’, ‘কনট্রাক্ট’ এবং ‘কাইজ়ার’ (‘মানি হানি’ এবং ‘কনট্র্যাক্ট’এর যৌথ পরিচালক কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়)। প্রতিটি সিরিজ়ই সমাদৃত, তবে ‘একাত্তর’ এবং ‘কাইজ়ার’ রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এ ছাড়াও ‘তকদির’, ‘উনলৌকিক’ এবং ‘কারাগার’এর প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তনিম। তবে চিত্রনাট্য লেখা এবং নির্দেশনার কাজই বেশি প্রিয় তাঁর। ওটিটি কনটেন্ট যে দুই বাংলার মধ্যে সেতুর কাজ করছে, কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে তিনি কীভাবে দেখছেন বিষয়টাকে? ‘‘খুব ভাল লাগে। আমরা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষ, সকলের ছবি দেখে বড় হয়েছি। ‘সানন্দা’, ‘আনন্দলোক’ বাসায় রাখা হত। ফেলুদা বলুন বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সবই তো পড়েছি ছোট থেকে! এখনও পশ্চিমবাংলার সমসাময়িক পরিচালকদের ছবি দেখি, তবে বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস বা ছবির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতটাও জানতেন না। ওটিটি-ও তো ছিল না তখন! এখন ওটিটি-র দৌলতে দুই বাংলার কনটেন্টই পৌঁছে যাচ্ছে সকলের কাছে। দেখুন, আসলে তো আমরা সকলেই বাঙালি! কাঁটাতারের বেড়ার কারণে হয়তো এক দেশের কনটেন্ট অন্য দেশের মানুষের কাছে পৌঁছতে সময় নিয়েছে একটু। কিন্তু আমি যখন সিরিজ় বা ছবি বানাই, তখন সকলেই আমার দর্শক। কাঁটাতার সেখানে কোনও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। খেয়াল করে দেখবেন, শুধু সিরিজ় বা ছবি নয়, বাংলাদেশের বই বা গানও এখন পশ্চিমবঙ্গে আগের তুলনায় বেশি পরিচিত পাচ্ছে।’’ পশ্চিমবঙ্গে এসে কাজ করার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে? ‘‘পরিকল্পনা সে রকম কিছু নেই এখনও। তবে ইচ্ছে তো রয়েছেই, দুই বাংলার— কলকাতা ও ঢাকার প্রেক্ষিতে কোনও গল্পকে ফেলে যদি কাজ করা যায়। সুযোগও আগের চেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে।’’ তনিম আপাতত ব্যস্ত ছবি লেখার কাজ নিয়ে। শেক্সপিয়রের এক ট্র্যাজেডির অ্যাডাপ্টেশন। ‘‘অনেক থ্রিলার বানিয়েছি, আর ভাল লাগছে না,’’ হাসিমুখে বললেন তিনি।


‘কাইজ়ার’-এর দৃশ্য

‘‘বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস বা ছবির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতটাও জানতেন না। ওটিটি-ও তো ছিল না তখন! এখন ওটিটি-র দৌলতে দুই বাংলার কনটেন্টই পৌঁছে যাচ্ছে সকলের কাছে। দেখুন, আসলে তো আমরা সকলেই বাঙালি! আমি যখন সিরিজ় বা ছবি বানাই, তখন সকলেই আমার দর্শক।’’


তনিম নূর

সাক্ষাৎকার: সংবেত্তা চক্রবর্তী



অলঙ্করণ: কুনাল বর্মণ

দুর্গাপুজো ও আন্তর্জাতিকতা

‘কোম্পানির পুজো’ থেকে ‘সর্বজনীনতা’, বাঙালির অতিপ্রিয় উৎসব আজ পৌঁছেছে সর্বজনসম্মত ভাবে বিশ্বের দরবারে, ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতিতে। এই যাত্রাপথ তৈরি হল কী ভাবে? কোন সম্ভাবনারই বা দরজা খুলে গেল এতে? লিখেছেন পায়েল সেনগুপ্ত।

এ*সেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে/*
মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে....

পাশ্চাত্য আধুনিকতায় আপাদমস্তক স্নাত হয়েও ‘আশ্বিন মাস’ কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিন্তু উমার প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন একেবারে ট্র্যাডিশনাল স্টাইলে। হয়তো তিনি পার্থিব শরীরে বাঙালির পূজার আজকের এই আন্তর্জাতিকতায় খুশি হতেন, কারণ বাংলা ও বিশ্বের মধ্যে সাহিত্যে অন্তত তিনি এক সুদৃঢ় সেতু, সংস্কৃতিতেও বটে। বাঙালির মননের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই পূজার রূপকে তুলে ধরে তিনি সম্মান জানিয়েছেন বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যকে। কিন্তু মা হোন বা উমা, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঘটেছে সমাজে তাঁর আবাহনের পরিবর্তন। পার্বতী, অর্থাৎ হিমালয়ের কন্যা থেকে



সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে অসুরের বুকে ত্রিশূল বিঁধিয়ে এবং সঙ্গে পুত্রকন্যাদের নিয়ে তাঁর রূপ পরিবর্তনের যেমন একটি জার্নি রয়েছে, তেমনই শুধুমাত্র পূজার উপচার থেকে ধার্মিকতাকে অতিক্রম করে এক বিপুল সর্বজনীনতার স্বীকৃতি এবং একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের এক উৎসবে দুর্গাপূজার এই পৌঁছে যাওয়াও যেন মায়ের শরীরে একই অঙ্গে এত রূপের মতোই প্রাসঙ্গিক। কীভাবে তা সম্ভব হল বোঝার আগে একবার ইতিহাস বইয়ে যেমন লেখা থাকে, তেমন কিছু তথ্যে চোখ বুলিয়ে নিলে বোধ হয় সুবিধে হবে।

বাংলায় দুর্গাপূজার আবির্ভাব হিসেবে দেখা যেতে পারে মুঘল যুগের শেষ ভাগকে। অবিভক্ত বাংলার রাজশাহি জেলার তাহিরপুরের রাজা উদয়নারায়ণ প্রায় অশ্বমেধের মতোই শক্তিপ্রদ কোনও অনুষ্ঠান হিসেবে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কংসনারায়ণ বাবার সেই ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন। শোনা যায়, তখনই নাকি এই পুজোর খরচ হয়েছিল আনুমানিক প্রায় আট লক্ষ টাকা। ১৬০০ সালে নদিয়ার রাজা ভবানন্দ মজুমদার (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) দুর্গাপুজো করেছিলেন। কলকাতার বুকে প্রথম পুজো করেছিলেন বলে মনে করা হয় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে, যিনি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন। এরা দু'জনেই প্রাধান্য পেয়েছিলেন আকবরের প্রধান সেনাপতি ও পরে অম্বরের রাজা মানসিংহের দৌলতে। এর পর থেকেই গৌড়, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং কৃষ্ণনগরে দুর্গাপুজো হয়ে উঠল বাঙালির বাৎসরিক উৎসব। তা ছাড়া এটি তখন অনেকটাই অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের একটি উৎসব ছিল। বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই নাকি সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পূজার আয়োজন করেছিলেন। উল্টো রথের দিন খুঁটিপুজো করে সূচনা হত পূজার। ১০৮টা ঢাক বাজত। ১০৮টি পালকি যেত জলঙ্গিতে, বিসর্জনের সময়। তিনিই প্রথম একটা বিলাসবহুল ব্যাপার নিয়ে এলেন পুজোয়। সেই সঙ্গে অধীনস্থ জমিদারদেরও উৎসাহ দিতেন। তিনিই নাকি প্রথম নচ্ পারফরম্যান্সের আয়োজন করেছিলেন পুজোয়। তাঁর পথ অনুসরণ করে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতেও শুরু হল দুর্গাপুজোর ব্যাপক আয়োজন। কিন্তু ইংরেজকে তোষামোদ করা ও সম্পদ প্রদর্শনের খাতিরে প্রতিমার মুখ হয়ে গেল রানি ভিক্টোরিয়ার আদলে। তাদের বাড়িতে ইংরেজদের আনাগোনা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রমরমা ও আদবকায়দা এত বেশি ছিল যে, কিছুটা নামই হয়ে গেল 'কোম্পানির পুজো।' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় এই সব নব্য বাবু কালচারের পুজোর অনেক ব্যাঙ্গাত্মক বর্ণনা আছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ, স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ, স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিঘাত এসে বদলে দিল পূজার রূপ। দুর্গাপুজো হয়ে উঠল একতা ও সংঘবদ্ধতার প্রতিরূপ। এখান থেকেই যথার্থ সর্বজনীনতার শুরু। সকলে মিলে একত্র হয়ে পূজা। এর পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের একটা বিশাল অবদান আছে।



তপতী গুহঠাকুরতা

সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশ্যাল সায়েন্স, কলকাতার অধ্যাপক তপতী গুহঠাকুরতা, তাঁর In the Name of the Goddess নামক দীর্ঘ গবেষণাধর্মী বইয়ে দুর্গাপূজার আধুনিক যাত্রাপথের একটি সফল চিত্রাঙ্কন করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেও সংক্ষেপে শোনা গেল এই ইভলিউশনের বিভিন্ন ধাপ, যাকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

কলকাতায় শুরু

"বারোয়ারি পুজো মানে বারো জন মিলে পুজো। কিন্তু সেটাকে ঠিক সর্বজনীন বলা যায় না। সর্বজনীন বলতে সকলে মিলেমিশে



পুজো করার একটা ব্যাপার আছে। সর্বজনীন দুর্গোৎসব ১৯২০ সাল নাগাদ একটা শিব মন্দির চত্বরে হয়েছিল, এ রকম বলা হয়। এখনকার মতো খোলা মাঠে, ক্লাবে বা পার্কের পুজো তখন ছিল না। বিংশ শতকের পুজো মানে সর্বজনীন পুজো। এই পুজো বাগবাজার প্রথম শুরু করেছিল, নাকি কুমোরটুলি না সিমলা ব্যায়াম সমিতি, এই নিয়ে বিতর্ক আছে। মোটামুটি ১৯২০-৩০ এর দশকে উত্তর কলকাতায় কুমোরটুলি, হাতিবাগানের মতো জায়গায় এই পুজোগুলো উঠে আসে। সাধারণত এগুলো কোনও ক্লাব বা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হত। ওই পুজোগুলোর সঙ্গে জুড়ে ছিল জাতীয়তাবাদ। কারণ এই পুজোগুলোয় স্বদেশি মেলা, শারীরিক কসরতের খেলা হত। এই পুজোগুলো স্বাধীনতার আগে থেকেই হচ্ছে। পুঁটিয়ারির একটা ক্লাবের পুজো যেমন এ বছর ৭৫ বছরে পা দেবে। দক্ষিণ কলকাতায় ১৯৩০-৪০ এর দশকে কিছু পুজো শুরু হয়েছিল, ভবানীপুরের বনেদি বাড়ির পাড়ার ক্লাবে, কালীঘাটে পটুয়াপাড়ায় পুজো হত। সে সময়ও পুজোয় নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হত। কিছু শিল্পী ওরিয়েন্টাল স্টাইলে মূর্তি বানাতেন। গোপেশ্বর পাল আবার বানাতেন রিয়্যালিস্টিক ঠাকুর। নতুন-নতুন কাজ করতেন অনেকে।

দক্ষিণ কলকাতার এখনকার অনেক বড় পুজোই খুব পুরনো পুজো নয়। কিন্তু একডালিয়া, সিংহী পার্ক, এরা অনেক আগে থেকেই অনেক বড় পুজো। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পুজোর চেয়েও পুরনো কলেজ স্কোয়্যারের পুজো, মহম্মদ আলি পার্কের পুজো। বালিগঞ্জ কালচারাল, চেতলা অগ্রণী, ত্রিধারা এই পুজোগুলো এক সময় খুব ছোট আকারে হত। চেতলায় কালীপুজো বড় করে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছোট ছোট কলোনিতে ছোট আকারের দুর্গাপুজো তৈরি হয়। উদ্বাস্তু মানুষদের কাছে সেগুলোই ছিল নতুন সামাজিক বন্ধনে জড়ানোর একটা সুযোগ। ১৯৭০-৮০ সাল নাগাদ বিশেষ করে বাঙালি ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে দুর্গাপুজো শুরু হয়। আমার মা বড় হয়েছেন নিউ আলিপুরে। সেখানে ছোট একটা পার্কে পুজো হত। দিদিমাদের পুজোর পাঁচ দিন কাটত পুজো প্রাঙ্গণেই, পাড়ার সকলের সঙ্গে হইহই করে আনন্দ-আয়োজনে। এখন পুজো অনেক অন্য রকম। বড় মাপের পুজোগুলোয় পাড়ার লোকেদের উদ্যোগে ও অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় হয় না বললেই চলে।”

পুজো ও পরিক্রমণ

“এখন নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে পুজো দেখার যে চল, কলকাতায় তা শুরু হয়েছিল সাতের দশকে। তার আগে সবাই নিজের নিজের পাড়ার পুজোতেই আনন্দ করত। কলকাতার বাইরেও এখন বাংলার সর্বত্রই ঘুরে-ঘুরে পুজো দেখেন সবাই। এই অভ্যেসের শুরু কলকাতাতেই। প্রবাসের পুজোতেও কিন্তু অনেকে এক জায়গায়





একত্রিত হয়ে একটিই পুজোয় আনন্দ করেন। দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্কে বাঙালিরা একত্রিত হয়ে ৫-৬টা পুজো করেন। কিন্তু শহরের এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের পুজো দেখতে যাচ্ছেন, এই পাবলিক এগজিবিশনের জায়গায় দুর্গাপুজো পৌঁছেছে গত কয়েক দশকে। দেবী পুজোয় বিশ্বের নানা প্রান্তের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন পুজোয় ফুটে উঠছে— এই মিলমিশে কলকাতার মানুষ কখনওই আপত্তি করেননি। বরং এর পিছনের শিল্পভাবনাকে তাঁরা সমাদর করেছেন। পুজোকে কেন্দ্র করে তাঁরা প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে ঘুরে বিশ্বদর্শন সেরে ফেলেন এক প্রকার। কলকাতার পুজো তাই শুধুই দেবীপুজো নয়। বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এই পুজোর আয়োজন করেন, পুজোয় আনন্দ করেন, উপভোগ করেন। এক-একটা পুজো প্যান্ডেলে বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন ধরনের শিল্পী একত্রিত হন। ”

শিল্পের প্রাধান্য ও অর্থনীতি

“আমি ২০০২-০৩ সাল থেকে কাজ করছি। সে সময় আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা এক দল আর্টিস্ট চেষ্টা করছিলেন পুজোর মধ্যে একটা অন্য আমেজ আনার। এখন পুজোগুলোয় পাড়ার সকলের সাগ্রহ অবদান দেখা যায় না। কিন্তু মানুষ এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ার পুজো দেখতে যান। কিছু আর্টিস্ট এখনও আছেন, যাঁরা পুজোর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হয়েছেন। পুজোর সময় প্রচুর মানুষের রোজগারের কিছু উপায় তৈরি হয়। ১০০ দিনের কাজের কথা আমরা শুনি, কিন্তু একটু ভাবলেই খেয়াল হবে, দুর্গাপুজোর সময়ও তো কত ক্লাবে গ্রাম মফস্‌সল থেকে কত মানুষ পুজোর আয়োজন করতে শহরে আসেন এবং মাসতিনেক এখানেই থেকে যান। পুজোর আনন্দযজ্ঞে সে-ই তাঁদের ১০০ দিনের কাজ। পুজোকে কেন্দ্র করে তাই অর্থনীতিও আবর্তিত হয়। যে রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট প্রায় নেই, তার অর্থনীতিকে এ ধরনের উৎসবের উপর নির্ভর করতেই হয়। ছৌ নাচের শিল্পীরা যেমন এখন বড় পুজোর র‍্যালিতে থাকেন। ক্রাফ্ট ইকোনমিকে এই ভাবে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেয় পুজো। এক-একটা পুজোয় যে বিপুল খরচ হয়, তার কতটুকু শিল্পীরা পান— সে নিয়ে তর্ক হতেই পারে। কিন্তু এই তর্কের অবকাশ তৈরি করে দেয় দুর্গাপুজোই— এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যের প্রচুর হারিয়ে যাওয়া বা প্রান্তিক শিল্প কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ক্রাফ্টসম্যানশিপের এই বিরাট প্রদর্শনী শিল্পকেও একটি অনন্য পর্যায়ে উন্নীত করেছে।”

স্বীকৃতি ও সম্ভাবনা

“কলকাতার পুজো ইউনেস্কোর যে আন্তর্জাতিক সম্মান পেল, তার সদ্ব্যবহার করতে গেলে কলকাতার পুজোর একটা আন্তর্জাতির ব্র্যান্ডিং করতে হবে। সেটা করতে গেলে কলকাতার পুজোকে স্থানীয় পুজোর ক্লাব পলিটিক্সের উর্ধ্বে উঠতে হবে। কেউ বলেন, অত্যধিক কমার্শিয়ালাইজেশন পুজোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা একটা অদ্ভুত প্যারাডক্স কারণ বড় স্পনসর না পেলে বড় পুজো হবে না। পুজোর নেপথ্যের কারিগরদের আর্থিক উন্নতিও হবে না। কেবল মাত্র পাড়ার চাঁদা থেকে বড় পুজোর আয়োজন করা এখন সম্ভবই না। ফলে পুজোর থেকে কমার্শিয়ালাইজেশনকে আলাদা করা যাবে না। এক বছর আগে থেকেই পরের পুজোর জন্য কমার্শিয়াল একটা ইকোনমিক প্ল্যানিং তাই এখন খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে, এই কমার্শিয়ালাইজেশন যেন আমাদের পুজোর নিজস্ব চরিত্রকে ধ্বংস না করে ফেলে। ক্রাউড কন্ট্রোল, নয়েজ় কন্ট্রোল, পরিবেশের স্বাস্থ্য রক্ষা— এই দিকগুলোয় মনে হয় আগামী দিনে আমাদের বেশি করে নজর দিতে হবে। তবে বিপণন বা বিজ্ঞাপনকে এত ভয় পাওয়ার কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ, পুজোকে কেন্দ্র করে এমন অনেক বিজ্ঞাপন তৈরি হয়েছে যেখানে মা দুর্গাও এবং তাঁর পরিবারও এক-একটি চরিত্র। কোনও টেকনিক্যাল গ্যাজেটের বিজ্ঞাপনে হয়তো আমরা পাচ্ছি দশভুজা এক মেয়ে বা নতুন মোবাইল হাতে কার্তিক বা গণেশ... দুর্গা চিরদিনই আমাদের কাছে আমাদের মধ্যেই আমাদের মতোই



যেন সাধারণ এক মানুষ। কখনও একতার পূজা, কখনও শক্তির আরাধনা, কখনও অর্থনীতর কেন্দ্র...সব মিলিয়ে দুর্গাপুজো বহুকাল থেকেই সমস্ত ধার্মিকতাকে অতিক্রম করে এক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। সাজগোজ, ফ্যাশন থেকে অনুষ্ঠান, বিনোদন এমনকী সাহিত্য পর্যন্ত এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কত ধর্মেপ মানুয এতে অংশগ্রহণ করে, কত বিপুল পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় হয় এই সময়। সেই কারণেই উৎসব অন্যান্য সব রাজ্যের ধর্মীয় উৎসবের চেয়ে আলাদা।''

ঐতিহ্য সচেতনতা

''এ বছর ইউনেস্কোর সদস্যরা কলকাতার পুজো দেখতে আসবেন। মহালয়ার পর পরই কিছু ক্লাবে তাঁরা পুজো দেখবেন। সেই কিছু ক্লাবের তালিকায় কারা থাকবেন আর কারা থাকবেন না, সেই নিয়েও জোর মন্ত্রণা চলছে। বিদেশি এই অতিথিদের সামনে আমাদের উচিত, পুজোর নেপথ্যের কারিগরদের তুলে ধরা। তাঁদের সামনে এনে বসানো। হাজার-হাজার মানুষ পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে। বহু মানুষের কাছে পুজোটাই বছরের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। তাঁদের জীবনের কেন্দ্রেই আছে পুজো। পুজো বছরে এক বার হোক, কিন্তু তা থেকেই যেন ওই মানুষগুলোর সারা বছরটা চলে যায়, সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক সময় কলকাতা একটা গ্লোবাল সিটি ছিল। তার একটা সাংঘাতিক আন্তর্জাতিক পরিচিতি ছিল। সত্যজিৎ রায় সারা জীবন কলকাতায় বসেই আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র বানিয়েছেন। কলকাতার পুজোকেও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে গেলে নিজেকে অনেক বদলাতে হবে। আজকাল প্যাকেজিংয়ের, প্রেজেন্টেশনের যুগ। ফলে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বের সামনে কলকাতা শহরের পুজোর একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে হবে আমাদের। পুজোয় ধর্মের প্রভাব আগের চেয়ে অনেক কমেছে। কিন্তু প্রভাবটা আছে। আমাদের পুজোর এক জন দর্শক মা দুর্গাও। তিনি তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তিনিও দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের পুজোর আয়োজন দেখছেন। এক সময় বনেদি বাড়ির পুজোয় বিনোদনের একটা বড় জায়গা ছিল। এই বাড়িগুলোয় পুজোর সময় নাচ, গান, নাটকের আয়োজন হত। সাধারণ মানুষ পুজোর দিনগুলোয় সেই অনুষ্ঠান দেখতে আসতেন, বনেদি বাড়িতে ঢোকার সুযোগ পেতেন। বস্ত্রদান, ভোগ বিতরণ— কত আন্তরিক ভাবে হত এক সময়।

দুর্গাপুজোয় মা তাঁর সন্তানদের নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন, এই আন্তরিকতাটা আমরা কিন্তু আজও ধরে রেখেছি অনেক জায়গাতেই। দুর্গাকে আমরা বরাবরই নিজেদের মতো করে ভেবেছি, যে ভাবনায় ধর্ম, রাজনীতি খুব বেশি নাক গলানোর বা মাথা ঘামানোর সুযোগ পায়নি।''

রাজ্যসরকারের ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারি শান্তনু বসুর মতে, এই আন্তর্জাতিকতা এই রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নতির একটি সম্ভাবনা খুলে দিতে পারে। এর ফলে বহু বিদেশি টুরিস্টের ঠাকুর দেখতে আসার সম্ভাবনা বাড়বে এবং সেইসঙ্গে বিদেশেও আরও বেশি করে দুর্গাপূজার খ্যাতি ও প্রসার বাড়বে, যা বাঙালির সংস্কৃতির জন্য ভাল।

''এই শক্তির প্রসন্নমুখ মাতা। এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী।'', লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কখনও সর্ববাধা প্রশমনং দেবী, কখনও গিরিরাজ নন্দিনী উমা, কখনও মাতৃরূপেণ সংস্থিতা স্নেহময়ী... দেবী দুর্গার নানা পরিবর্তনশীল চিত্রকল্পের মতোই যদি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একটি সাংস্কৃতিক জীবনের, একটি শহরের ইতিহাসের, তার শরীরের অলিগলি আনাচকানাতের পালাবদল ঘটায়, তাতে অসুবিধে কোথায়!

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ

বিনুনি-বৃত্তান্ত

লম্বা চুলের সৌন্দর্যায়নের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ধরা হয় বিনুনিকে। পাশ্চাত্য বা এথনিক, যে কোনও পোশাকের সঙ্গে বিনুনিকে স্টাইলাইজ় করতে পারেন নিজের মতো করে। ওয়াটারফল ব্রেড বা ফিশটেল ব্রেড, সাবেক ব্রেডেড বান বা লম্বা খেজুর বিনুনি...সঙ্গে অ্যাকসেসরি হিসেবে কখনও ফুল বা গয়না। সঙ্গে মানানসই সাজ। অবশ্য চুল ছোট হলেও হেয়ার এক্সটেনশন ব্যবহার করে বিনুনি বাঁধতেই পারেন। পুজোর আগে বিনুনি-বিন্যাসে অভিজিৎ পাল। সহায়তায় সানন্দা লাহা। পরিকল্পনায় মধুরিমা সিংহ রায়।





মিড পার্টিং করে মাঝখানের চুলের কিছুটা অংশ নিয়ে লো পনিটেল করুন। সামনের অংশের অর্ধেক চুল নিয়ে দু'পাশে সমান মাপের দু'টি বিনুনি বেঁধে নিন। লো পনিটেলকে হাতখোঁপার মতো করে তার উপরে বিনুনি পিন আপ করে দিন। ব্রেডেড বানের সঙ্গে কোল-আইজ় আর হালকা গোলাপি লিপস্টিকের সাজ।



মাথার মাঝখানের অংশের খানিকটা চুল বুফঁ করে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিন। সামনের অংশের চুল নিয়ে বিনুনি করে বুফঁর নীচে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিন। সাইড পার্টিংয়ের পরে বাকি অল্প চুল টেনে বিনুনি করে বেঁধে ক্লিপের সাহায্যে পিছনের দিকে আটকান। নীচের দিকের অংশের চুল পাশ থেকে খেজুর বিনুনি করে নিন। অ্যাকসেসরি হিসেবে ব্যাঙ্গালোর জিপসি ব্যবহার করা হয়েছে।







মাঝখানের কিছুটা অংশের চুল নিয়ে খেজুর বিনুনি করে নিন। সামনের অংশে সাইড পার্টিং করে কিছুটা চুল নিয়ে বিনুনি করুন, চুলের ডগা অবধি। ওই বিনুনিটাকেই মাথার পিছনে ক্লিপ করে নিন। উল্টোদিকের অংশের চুল নিয়েও একইভাবে বিনুনি করে মাথার পিছন ক্লিপ করুন। অ্যাকসেসরি হিসেবে রিবন আর লাইনার লুক...ব্যস!



মিডল পার্টিং করে চুল দু’টো অংশে ভাগ করে নিন। একদিকটা ক্লিপের সাহায্যে আটকে, অন্য খোলা চুলের অংশ থেকে অল্প অল্প চুল নিয়ে বিনুনি করুন চুলের ডগা অবধি। অপর অংশেও একইভাবে খেজুর বিনুনির মতো করে বেঁধে নিন। শেষের দিকের বিনুনির অংশটুকু বেড়া বিনুনির মতো করে বেঁধে উপরের অংশের ভিতর ঢুকিয়ে দিন। হেয়ার এক্সটেনশন ব্যবহার করতে পারেন।



সামনের কিছু অংশের চুল নিয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিন। দু'দিক থেকে সমানভাবে চুল নিয়ে টুইস্ট করে ক্লিপের সাহায্যে মাথার পিছনের দিকে আটকে নিন। এভাবে বিনুনি করতে করতে ডগা অবধি পৌঁছন। টুইস্টেড ব্রেডের সঙ্গে মানানসই হেয়ার অ্যাকসেসরিজ় আর হালকা মেক-আপ।



হাই পনিটেল করে সেখান থেকে চুলের ডগা অবধি বিনুনি বাঁধা হয়েছে। একেবারে ট্র্যাডিশনাল বিনুনি। সাবেকি ফিল দিতে জুঁইফুলের মালা ক্রিস-ক্রস করে বাঁধা হয়েছে বিনুনিতে। মেক-আপে কাজল, আই লাইনার আর উজ্জ্বল গোলাপি লিপস্টিক।

এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি

মডেল: অনন্যা, কোয়েল
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
সহকারী: সানন্দা লাহা
পোশাক ও গয়না: বম্বে বাই আয়েশা দেশমুখ
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩৯৯০০
ছবি: শুভদীপ ধর

রূপায়ণে: অসীম হালদার ও পিয়ালী বালা



রানি কাহিনির অন্তিম অধ্যায়

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এসে পৌঁছল চিরকুট, থেমে গেল কাজ। মুহূর্তে সুনসান ব্যস্ততম কাজের জায়গা। রানি নেই। কিন্তু এতদিন সশরীরে থেকেও ঠিক কোথায় ছিলেন তিনি? এও কি তবে একধরনের অস্তিত্ব-সংকট? লিখেছেন তিলোত্তমা মজুমদার।

তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রানি এলিজাবেথ দ্বিতীয়। দীর্ঘতম রাজত্বকালের নিরিখে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের পরে ইনি স্থান করে নিয়েছেন। ব্রিটেনে শোক পালিত হচ্ছে। সাধারণ নয় অবশ্য। রাজকীয় শোক। যেখানে সাধারণ প্রজা প্রাসাদের সামনে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষায় নীরবে দুখু-দুখু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে, চরম মুহূর্তে শোনা যায় আভিজাত্যপূর্ণ সংযত শোকসংবাদ, তিনি এখন শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। প্রাসাদে রাজকীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়ে আসে। সঠিক অর্থে পতাকা রাজকীয় নয় অবশ্য। গণতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক স্বাধীন ইউনাইটেড কিংডমের পতাকা।

আবার এমনও হতে পারে, দেশের পতাকা যখন দেশের শাসনতন্ত্রের চূড়ায় অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনের ছাতে রক্ষিত হয় তখন তাকে রাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দেশের পতাকা বলাই সঠিক।

সে যাই হোক না কেন, পতাকা প্রতীক মাত্র। একটি দণ্ড ও এক টুকরো কাপড় বই কিছু তো নয়। লোকে যে অর্থ ও সম্মান তার ওপর আরোপ করে, সে সেই প্রতীকায়িত অবস্থান, ক্ষমতা ও দার্শনিক অভিব্যক্তি ও সম্যক মানের আসাবরদার হয়ে দণ্ডায়মান থাকে। সে নিজে যেমন নিজস্ব সত্তার ব্যাখ্যাকর্ত্রী নয়, তেমনই তার দুঃখ শোক আনন্দ উল্লাস সকলই অনুপস্থিত। রানির মৃত্যুতে যে তাকে নমিত করে দেওয়া হল, শোকের প্রকাশ রূপে, সেই প্রতীকসর্বস্ব পরিস্থিতি এখন গণমাধ্যমে অন্যতম আলোচ্য।

যে সে ব্যক্তি তো নয়, রানি প্রয়াত হয়েছেন। রানি। জলজ্যান্ত রূপকথা। একদা ভারতের সম্পদ ছিল সেই কোহিনূর বসানো মুকুট পরে সোনার সিংহাসনে রূপোর বেদিতে পা রেখে রুপোর বাটিতে সোনার চামচ দিয়ে স্যুপ খেয়ে বেশ কয়েকটি মহামূল্য বিলাসবহুল প্রাসাদের মালিকানা ও বহুলক্ষকোটি পাউণ্ডের অধিকারিণী অজানিত পরিমাণ ধনরত্নের সম্ভারবাহিনী, গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক অধিশ্বরী কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রতীকী প্রধানা ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে মানুষ করে সময়োচিত কালে সময়োচিত ধামে গমন করেছেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কিন্তু সেই মৌহূর্তিক খবরের জন্য জনগণ প্রাসাদের সামনে ভিড় করেছিল কেন? খবর তো এখন সংবাদ মাধ্যমেই ঝটিতি মেলে। তাহলে কি গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের গণজন আজও গণজনের ব্যয়ে রাজারানিদের বিলাসবহুল পরিপোষণ করে যেতে চায়? রাজানুগত্য প্রদর্শন কি তারা গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মানে? তাহলে কি দেশটা আদৌ গণতান্ত্রিক? নাকি ডাইনোসরের ফসিল যেভাবে সাজিয়ে রাখা হয় জাদুঘরে আর সেইসব দেখে আহ্লাদে বিস্ময়ে আমরা ভাবতে থাকি, উফফফ, কী বিশাল, সেই বিরাটের প্রতি মোহ আমাদের রোজকার জীবনে জীবিকা ও আনন্দ আহরণের সংগ্রামে লুকোন অহং সরবরাহ করে যায়, সেই রসদটুকুর লোভে ব্রিটিশ জনগণ আজও রাজারানি নিয়ে জীবনের খেলা খেলে চলে?



প্রতিভা পাতিলের সঙ্গে

যদি খেলে, আপত্তির কী? কোন নীতিতে দেশ চলছে সেটি মূল, নাকি যে নীতিতেই চলুক, সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে আছে কিনা, সেটাই দেখা উদ্দেশ্য? প্রশ্ন অনেক। কিন্তু উত্তর পাওয়া সহজ নয়। প্রাসাদের অর্ধনমিত পতাকা এক রীতি বটে। সব দেশেই এর প্রচলন আছে। মাননীয়া রানির মৃত্যুতে সেই পতাকার অর্ধনমন সঠিক কর্মই হয়েছে। কিন্তু যে রানির জন্য এত শোকছল, দেশে ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর ইতিবাচক ভূমিকা ঠিক কতখানি বা কী কী, ভেবে দেখতে চায় ইতিহাস।

৭০ বছরের রাজত্ব। একজন মানুষের গড় জীবদ্দশার চেয়ে বেশি। ১৯৫২ সালে রানি হওয়ার আগে তিনি দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেখেছেন ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশের খাদ্য কুক্ষিগত রাখার জঘন্য নীতির ফলে ভারতের দুর্ভিক্ষ ও হাজার হাজার মৃত্যু, দেখেছেন ভারতবর্ষ খণ্ডন ও স্বাধীনতার জন্য মানুষের নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান। তাঁর নিশ্চয় সেই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডগুলি প্রশংসনীয় মনে হয়নি। ঔপনিবেশিক দখলদারি, শোষণতন্ত্র ও উপনিবেশ ধ্বংস করে আত্মপোষণের যে নীতি নিয়ে ব্রিটিশ প্রত্যেক মহাদেশে রাজত্ব করেছিল তিন শতকের বেশি সময়, তা সভ্যতার পক্ষে



রাজপথে জুড়িগাড়িতে

প্রশংসনীয় কিনা, ন্যায্য কিনা, উপনিবেশ উৎখাতে ব্রিটেনের তৎপরতা জরুরি কিনা , এই নিয়ে তাকে বিশেষ কিছু বলতে শোনা যায়নি। ব্রিটেনের অধীশ্বরী হয়ে তিনি বরং নীরবেই দেখেছেন আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপগুলি থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশের অপসারণ। কমনওয়েলথে সেইসব দেশের অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে সামান্য হলেও দখলিপনা জারি রাখার প্রয়াস দেখা গিয়েছে বরং। ব্রিটেনের রানি হিসেবে, কমনওয়েলথ প্রধান হিসেবে নব্য স্বাধীন দেশগুলিতে তিনি রাজকীয় মর্যাদা উপভোগ করেছেন। কমনওয়েলথ বিষয়টি নিজেই বিতর্কসাপেক্ষ আজকের পরিস্থিতিতে। রাজত্ব অন্যায় নয় যদি সেই রাজত্ব হয় সমদর্শী ও ন্যায়িক, যা ব্রিটিশরা কোনও দেশে প্রদর্শন করেনি। ত্রিশতাধিক বর্ষ রাজত্বের পরেও ব্রিটিশ কোনও দেশে নিজের লোক হয়ে উঠতে পারেনি এই কারণেই। আজও, ব্রিটেনের রানি বা রাজা বিষয়ে অবশিষ্ট পৃথিবী ভ্রূ কুঞ্চিত করে, যার মধ্যে সম্ভ্রম থাকে না, বরং প্রশ্ন ওঠে রাজকীয় বিলাসবহুল জীবনাতিপাত ছাড়া এই রাজতন্ত্রের ভূমিকা ঠিক কী। রাজতন্ত্র সাংবিধানিক প্রাধান্য সমেত টিকিয়ে রেখে ব্রিটেন কি রাজশক্তি কবলিত বিপুল সম্পদ কোনও গোপন উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখতে যায়?

ব্রিটেনের সংবিধানের আদলে ভারতে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা আছে, কিন্তু সেই পদাভিষেকের পদ্ধতি গণতন্ত্রর পরিপন্থী নয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যকাল কখনও মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে না। সদ্য স্বাধীন ভারত বরং গোড়াতেই রাজতান্ত্রিকতার যে অস্তিত্ব তখনও বজায় ছিল, সেগুলির মূলোচ্ছেদ করে।

দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্বাধীন ভারতে এসেছেন তিনবার। ভারতের প্রত্যাশা ছিল, ঔপনিবেশিক শোষণ ও নিপীড়নের জন্য আজকের আধুনিক রানি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এত কুকীর্তি ব্রিটিশের, নির্যাতন লুণ্ঠন ও একদেশদর্শী প্রশাসনের যে বিপুল ইতিহাস, তার সবটার জন্য না হোক, অন্তত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিরস্ত্র জনতার ওপর অন্যায়ভাবে গুলি চালানোর যত ইতিহাস পৃথিবীতে আছে, তার মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ অন্যতম। শুধু ভারত নয়, সারা জগৎ সেই অমানুষিক কর্মকাণ্ড মনে রেখেছে। রানি যদি সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, ব্রিটিশ জাতির মর্যাদা নিশ্চয় অক্ষুণ্ণ থাকত, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তিনি নিজেও গৌরবান্বিত হতেন। কিন্তু তিনবার ভারতে এসে বিপুল রাজকীয় সংবর্ধনা ও মর্যাদা গ্রহণ করে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়েছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে বলেছেন ঘটনাটি দুঃখজনক, কিন্তু ক্ষমা চাননি।

তাঁর ৭০ বছরের রাজত্বের ইতিহাসে ব্রিটেনে অনেক প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, প্রতিটি নব্য আইনসভার সাপেক্ষে সারা বিশ্বে বার বার এই প্রশ্ন উঠেছে, বাকিংহাম



রানি এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপ



রানি ও মাদার টেরেসা



ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রানি



রানি ও ওবামার সাক্ষাৎ



বুশ দম্পতি ও রানি

প্যালেস ও রাজসিংহাসন থাকা ব্রিটেনের পক্ষে কতখানি জরুরি, যদি সেই সিংহাসনে যিনি বসেছেন তাঁর মধ্যে গণতান্ত্রিক নৈতিকতার আদর্শ না থাকে? সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি মর্যাদাবোধ বজায় না রাখেন? গণতান্ত্রিক দেশের মৌলিক নীতি কি এতে অসম্মানিত হয় না?

হয়তো এত প্রশ্ন উঠতই না যদি বাকিংহাম প্যালেসে লেডি ডায়ানা উপস্থিত না হতেন। বর্তমান ব্রিটেন অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম প্রগতিশীল, আশ্রয়প্রার্থীর প্রতি সংবেদনশীল, শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহী, কিন্তু সভ্য দেশের পরিসরে আদিম কন্দরের মতো সেখানে থেকে গেছে এক রাজপ্রাসাদ। যে প্রাসাদকে রূপকথার নজরে দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু সেখানে যদি কেউ হঠাৎ শতাব্দীপ্রাচীন রীতি রেওয়াজ মান্য করতে রাজি না হয়, এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের স্বাধীন নারীর মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে কী হয়? ডায়ানা ওইটুকু চেয়েছিলেন। প্রাসাদের শেকলে বাঁধা দুঃখী কিন্তু ফরমায়েশি গান গাওয়া পাখিটি হয়ে থাকতে চাননি। সেই সময় বাকিংহাম প্যালেসের মানসিকতা সারা বিশ্বের কাছে প্রকাশ পায়। দেখা যায়, মর্যাদাবোধের কৃত্রিমতা কত ব্যাপ্ত, কতখানি ভারী ও অর্থহীন তার বিলাসবৈভবপূর্ণ শৃঙ্খল। সেখানে প্রেম বাধ্যতামূলক, সেখানে



তাঁর প্রিয় পোষ্যের সঙ্গে

নিজস্ব স্বপ্নের কোনও জায়গা নেই। স্বাধীনভাবে, নিজের মর্যাদায় বাঁচতে চেয়ে ডায়ানা রাজকীয় ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্রিটেনে রাজারানির অলিখিত নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ্য করেছিলেন। সারা বিশ্ব তাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করেছিল। কারও হৃদয়ে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ এতটুকু জায়গা করতে পারেননি, কিন্তু ডায়ানা একক যুদ্ধ ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠেছিলেন। ৭০ বছর ক্ষমতার তুঙ্গে থেকে দ্বিতীয় এলিজাবেথ যা ভাবতেও পারেননি, সেই নারীশক্তির অজেয় দিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডায়ানা। নিজের জীবন দিয়ে তিনি নারীকে এবং জগতে এই বার্তা দিয়েছেন, বিলাসী শয্যায় স্বাধীনতাহীন স্বপ্নহীন জীবনের চেয়ে একটি স্বাধীন প্রেমময় জীবন মানুষের পক্ষে আদরণীয়।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। সাধারণত প্রয়াণের পর গুণকীর্তন করাই রীতি। কিন্তু অনেক খুঁজেও কি রানির বৈভবোজ্জ্বল জীবনযাপন ব্যতীত, প্যালেসীয় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার রাজনীতি ব্যতীত অন্য কোনও উল্লেখ্য বা অনুসরণযোগ্য নীতির সন্ধান পাবে গণতান্ত্রিক ভারত?











ফোক-ঘরানার তারকারা

লোকসঙ্গীতকে আধার করে এঁরা কেউ গেয়েছেন মেনস্ট্রিম সিনেমায়। কেউ আবার ফোক ফিউশনের জঁরে দেশ-বিদেশে কনসার্ট করে অকুণ্ঠ হাততালি কুড়িয়েছেন। আবার লোকসঙ্গীত সংরক্ষণের কাজও চলছে পুরোদমে। এমনই পাঁচ শিল্পীর মুখোমুখি মধুরিমা সিংহ রায়।

রঘু দীক্ষিত

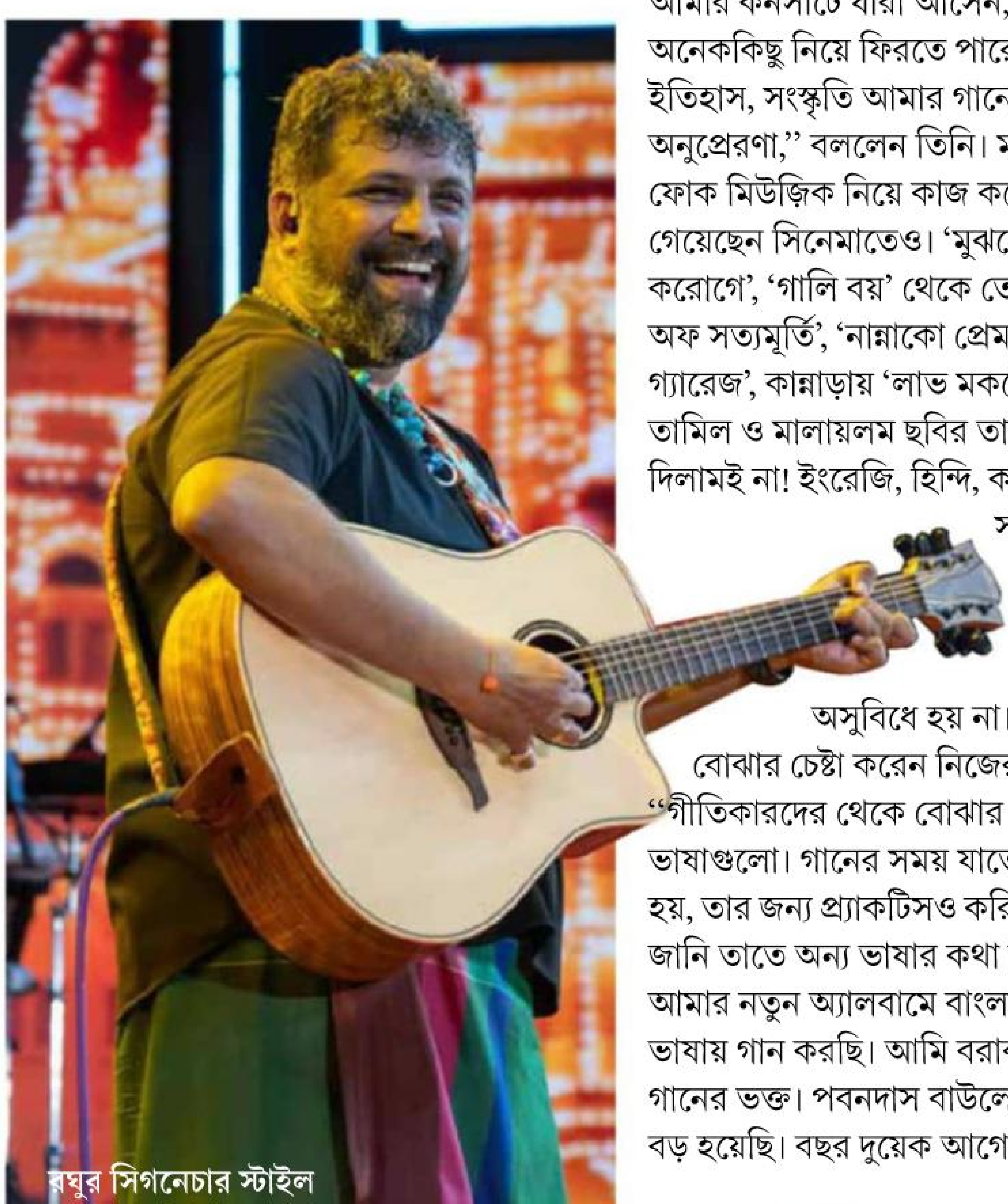
এক্সপেরিমেন্টাল, আর্দি আবার আধুনিক... রঘু দীক্ষিতের গান মানেই অভিনব সাউন্ডস্কেপ। ফোক-ফিউশনের জঁরে মঞ্চে এমন স্বতঃস্ফূর্ত পারফরম্যান্স দেন তিনি, যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। এর সঙ্গে যোগ করুন রঘুর সিগনেচার স্টাইল—লুঙ্গি আর ঘুঙুরুর যুগলবন্দি। 'হে ভগওয়ান' (হিন্দি), 'গুড়গুড়িয়া সেরি নোদো' (কান্নাড়া), বা 'জগ চাঙ্গা' (হিন্দি ও কান্নাড়া)...তিনি যে ভাষাতেই গান না কেন তাঁর গানের আবেদন কমে না এতটুকু। ফোকের সঙ্গে রকের মিশেল, সঙ্গে এক অভিনব সাউন্ডস্কেপ। তাঁর সৃষ্টির অনুপ্রেরণার কথা দিয়েই শুরু হল আলাপচারিতা। রঘু জানালেন, ''গানে আসাটাই আমার কাছে অ্যাক্সিডেন্টাল। কোনও পরিকল্পনা ছিল না (হাসি)। মাই সাউন্ড হ্যাজ় বিন ভেরি মাচ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাকাওস্টিক গিটার, ভায়োলিন আর আমার কণ্ঠ...এই তিনটি মিলিয়েই আমার 'কোর' সাউন্ড

গড়ে উঠেছে। ইলেকট্রিক গিটারও ব্যবহার করেছি। সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা ঘোরার ফলে নতুন নতুন যন্ত্রকে আমার সাউন্ডস্কেপে যুক্ত করতে পেরেছি। সারা বিশ্বের বিভিন্ন মিউজ়িক ফেস্টিভ্যালে আমার ব্যান্ড নিয়ে পারফর্ম করেছি। কত অচেনা মিউজ়িশিয়ান বন্ধু হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ আমাকে হয়তো কোনও বিশেষ যন্ত্র কিনিয়েছেন। গিটারের বাইরেও স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট যুক্ত হয়েছে। আমি বলব, অনেকটা ওয়র্ল্ড ফোক মিউজ়িকের সুর আমার সাউন্ডস্কেপে পাবেন। ইলেকট্রিক গিটার বা ড্রামের মতো যন্ত্র আরও বেশি এনার্জি কোশেন্ট বাড়িয়েছে সুরের।'' তবে শুধু বিশ্ব-ভ্রমণ যে তাঁকে সুরের খোরাক জুগিয়েছে তেমনটা নয়, এক্সপেরিমেন্টাল ফোক মিউজ়িকের পিছনে রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্নতাও। ''ইটস ভেরি ফরচুনেট ফর অ্যান আর্টিস্ট টু বি বর্ন ইন ইন্ডিয়া। অন্য কোনও দেশের শিল্পীদের এই সুবিধে নেই। এত গল্প, মিথোলজি, ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে... তা বলে শেষ করা যাবে না। এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ইউ এক্সপিরিয়েন্স ক্যান বিকাম আ সোর্স অফ ইন্সপিরেশন। কবীর, মীরাবাঈ বা আমির খুসরোর ২০০-৩০০ বছর আগের সৃষ্টি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এখনকার প্রজন্মের জন্য পরিবেশন করা আমার লক্ষ্য। আধুনিক সাউন্ডস্কেপের সঙ্গে অরিজিনাল সৃষ্টিকে


রঘু দীক্ষিত পারফর্ম

''ইটস ভেরি ফরচুনেট ফর অ্যান আর্টিস্ট টু বি বর্ন ইন ইন্ডিয়া। অন্য কোনও দেশের শিল্পীদের এই সুবিধে নেই। এত গল্প, মিথোলজি, ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে...তা বলে শেষ করা যাবে না।''

মেশানোর প্রয়াস থাকে সবসময়। পুরনো আর নতুনের মধ্যেকার সেতুবন্ধন করার উদ্দেশ্য থাকে। ইটস গ্র্যাটিফায়িং ফর মি। আমার ব্যান্ডের লক্ষ্যই হল মানুষকে আনন্দ দেওয়া। আমার কনসার্টে যাঁরা আসেন, তাঁরা যেন অনেককিছু নিয়ে ফিরতে পারেন। ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি আমার গানের অন্যতম বড় অনুপ্রেরণা,'' বললেন তিনি। মাল্টিলিঙ্গুয়াল ফোক মিউজ়িক নিয়ে কাজ করেন রঘু। গেয়েছেন সিনেমাতেও। 'মুঝসে ফ্রেন্ডশিপ করোগে', 'গালি বয়' থেকে তেলুগুর 'সান অফ সত্যমূর্তি', 'নান্নাকো প্রেমাথু', 'জনতা গ্যারেজ', কান্নাড়ায় 'লাভ মকটেল', সমহারা'... তামিল ও মালায়লম ছবির তালিকা নাহয় দিলামই না! ইংরেজি, হিন্দি, কান্নাড়াতে সাবলীল, কিন্তু বাকি ভাষা না জানলেও গানের ক্ষেত্রে অসুবিধে হয় না। অন্য ভাষাকে বোঝার চেষ্টা করেন নিজের ভাষাতেই। ''গীতিকারদের থেকে বোঝার চেষ্টা করি অন্য ভাষাগুলো। গানের সময় যাতে সঠিক উচ্চারণ হয়, তার জন্য প্র্যাকটিসও করি। যে ভাষাগুলো জানি তাতে অন্য ভাষার কথা লিখে নিই। আমার নতুন অ্যালবামে বাংলা আর মরাঠি ভাষায় গান করছি। আমি বরাবর বাউল গানের ভক্ত। পবনদাস বাউলের গান শুনে বড় হয়েছি। বছর দুয়েক আগে কলকাতার এক মিউজ়িশিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সেটাও একটা মজার ঘটনা। জন পল বলে এই ভদ্রলোক রোজই আমায় ডেমো পাঠাতেন সোশ্যাল মিডিয়ায়! রোজই বলতেন, আমার সঙ্গে কাজ করতে চান। এতটাই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে একদিন বললাম আপনাকে ফ্লাইট টিকিট দিচ্ছি, চলে আসুন। উনি প্রায় ১৪ দিন ধরে ছিলেন, ৪০টা গান তৈরি করেছি আমরা। এসবই আমার পরের অ্যালবামে থাকছে। উনি যেহেতু কলকাতার, তাই বাংলার লোকসঙ্গীতকে কীভাবে বাদ দিতাম বলুন! একটি গান আছে 'প্রিয়তমা' বলে, প্রেমের গান। অক্টোবরে আসছি মিউজ়িক ভিডিও শুট করতে,'' জানালেন রঘু। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞার্থ তাঁর কাছে একটু আলাদা। ''যিনি মন থেকে গান করেন, কোনও নির্দিষ্ট ঘরানার গানের দ্বারা প্রভাবিত নন, তিনিই আমার কাছে ফোক মিউজ়িশিয়ান। গ্রামের কোনও চাষি যদি নিজের মতো করে গান করেন...তা বিয়ের গান, ভগবানকে ডাকার গান, সন্তান জন্মের সেলিব্রেশন, নতুন ধান কাটার গান... যা-ই হোক না কেন সেটাই লোকসঙ্গীত। ইটস বিন মিউজ়িক অফ হিউম্যান, ইন ইটস ট্রুয়েস্ট ফর্ম। আমি শহুরে পরিবেশে বড় হয়েছি ঠিকই, কিন্তু প্রথাগত তালিম কখনওই ছিল না গানে। তাই বোধহয় কোনটা কী রাগ, কী স্কেল, কী নোট এসব বলতে পারব না। পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত। গিটার বাজাই যখন তখনও তা প্রথাগত শিক্ষা থেকে বাজাই না।


রঘুর সিগনেচার স্টাইল



দ্য রঘু দীক্ষিত প্রজেক্ট

"আমি তো ভূপেন হাজারিকার জায়গার মেয়ে। উনি যে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা করেছিলেন, সেই ভাবনা কি ভোজপুরি গানে আছে? সেই অনুসন্ধান থেকেই নতুন যাত্রা শুরু হল। নাট্যকার ভিখারি ঠাকুরকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম।"

হয়তো অনেকেই হাসবেন শুনে! কোনও বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ স্টাইলের গান আমি গাই না। কিন্তু যেহেতু পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত, সো ইট ন্যাচরালি সাউন্ডস ফোক," বললেন রঘু। মাইক্রোবায়োলজিস্ট হতে হতে গায়ক হয়ে যান। আবার ট্রেনড ভারতনাট্যম ডান্সারও তিনি! নাচ, মাইক্রোবায়োলজি থেকে গান—সবটাই তাঁর কাছে অ্যাক্সিডেন্ট। "আমার জীবনে কিছুই প্ল্যান করে হয়নি। সামহাও আই অ্যাম আ ডেস্টিনিজ়চাইল্ড, তাই বোধহয় খুব ভাল ভাল কিছু ঘটনা ঘটেছে। গানের কেরিয়ারের কয়েকটা ঘটনার কথা বলি। প্রথমবার ইউকে-তে গিয়েছিলাম এক ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করতে। ২০০৯-এর কথা। ভারতের অপরিচিত ব্যান্ড তখন আমরা। ছোট্ট একটা স্টেজে পারফর্ম করতে দেওয়া হয়েছিল, তাও দুপুর দুটোয়! যখন গাইতে শুরু করি, একজন মাত্র শ্রোতা ছিলেন! কিন্তু একটু পরেই দেখি, অন্য স্টেজ থেকে শ্রোতারা ছুটে আসছেন আমাদের দিকে। ৪০ মিনিটের পারফরম্যান্সে প্রায় ৪০০০ শ্রোতা জড়ো হয়েছিলেন। তখন মনে হয়েছিল, আমার গান লোকে শুনতে চান। লন্ডনের সাউথ ব্যাঙ্ক সেন্টারে, গ্লাস্টনবেরিতে (দুবার) পারফর্ম করেছি। বিবিসি লন্ডনের টিভি শো-তে আমাদের ফিচার করা হয়। তারপরেই আমার একটি গান খুব জনপ্রিয় হয় ওদেশে। ২০১২-তে কুইন এলিজ়াবেথের সিংহাসনে ৬০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে ওঁর সামনে পারফর্ম করি," আনন্দিত শোনায় তাঁর গলা। প্রচুর নতুন প্রতিভাকে প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে তাঁর ব্যান্ড, দ্য রঘু দীক্ষিত প্রজেক্ট। বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত শিল্পীরা গাইবার সুযোগ পেয়েছেন। 'শঙ্কর' বলে একটি অ্যালবাম নিয়ে আপাতত ব্যস্ত তিনি। প্রায় দশবছর পরে অ্যালবাম আসছে রঘুর। আন্তর্জাতিক একাধিক মিউজ়িশিয়ানরা কোলাবরেট করছেন এই অ্যালবামে।

কল্পনা পটওয়ারি

মাত্র চার বছর বয়সে গানবাজনার সঙ্গে পরিচয়। সৌজন্যে কল্পনার বাবা বিপিন পটওয়ারি। বাবার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন তিনি, "আপনি প্রথমেই আমাকে বাবার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। কী অদ্ভুত দেখুন! কয়েকদিন আগেই উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন...বাবার থেকেই সঙ্গীতের প্রবহমান ধারা আমার মধ্যেও বয়ে চলেছে। তিন-সাড়ে তিনবছর বয়স থেকেই আমি গুনগুন করতাম। বাবা মূলত লোকসঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, থিয়েটারের গানেও সুর দিতেন। ওঁর থেকে কামরূপী লোকগায়নে আমার হাতেখড়ি। মা সবসময় বলতেন, 'মেয়ে হয়েছ, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। স্বামীর কাছে হাত পাততে যেন না হয়।' মা নিজেও প্রচুর স্ট্রাগল করে পড়াশোনা করেছেন, চাকরি করেছেন। আমি কটন কলেজে পড়তাম, অসমের অন্যতম সেরা কলেজ। ইংরেজি অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে এদিক ওদিক থেকে বিভিন্ন গানের গ্রুপ অনুষ্ঠানের জন্য ডাকতে থাকেন। আলাদা আলাদা ভাষায় গাইতাম, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। আমি তো সিভিল সার্ভিস নিয়ে এগোতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে গায়ক হয়ে গেলাম! নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছি। সাইকেলে চাপিয়ে বাবা নিয়ে যেতেন গানের অনুষ্ঠানে। মনে আছে, এত ছোট ছিলাম সামনের মানুষ দেখতে পেতেন না। টেবলের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন!" লোকসঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা কল্পনার জীবনে বরাবরই। সে প্রসঙ্গে বললেন, "অসমে কলেজে পড়ার সময়ে হুইটনি হাউস্টন, মারিয়া ক্যারি আমাকে প্রভাবিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতে ওঁরা যে অক্টেভে গাইতেন, আমি তার দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম। ওঁর অ্যালবাম 'স্টুডিও বক্স'-এর অনুকরণে আমি আমার স্টুডিওর নাম রাখি। বলিউডেও গান গেয়েছি। আসলে, শুরু থেকেই সব ধরনের গান শুনতাম। দক্ষিণের ইলায়া রাজা-র মিউজ়িক খুব শুনতাম। অসম থেকে অনেকেই ভেলোর বা চেন্নাই যেতেন। ওখান থেকে ক্যাসেট এনে দিতেন। আবার ঊষা উত্থুপ, আলিশা চিনয়ের ডিস্কো মিউজ়িকও শুনতাম। গান শোনা খুব জরুরি। কিন্তু যখন ভোজপুরি গান গাইতে শুরু করলাম, মুম্বই গেলাম... এক সম্পূর্ণ সংস্কৃতির দরজা আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। ছটপুজোর গান, হোলির গান, দেবীর ভজন সব আলাদা আলাদা। মনে হল, সকলেই তো বলিউডে গাইতে চান। লোকগানে শিল্পীর সংখ্যা তুলনায় কম, অত সম্মানও দেওয়া হয় না হয়তো! শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে যতটা সম্মান দেওয়া হয়, ফোক মিউজ়িশিয়ানদের হয় না। সাধারণ পোশাক পরে গানবাজনা করাটা দুর্বলতা নয়, ওটাই পরিচয় আমাদের। আমি যদি আমার গ্রামের চপ্পল পরে মঞ্চে গাই, তাহলে সেটাও আমার নিজস্বতা। মনে হল, এভাবেই গাইব। ভাষার ক্ষেত্রে উচ্চারণের পাশাপাশি, সেই ভাষার সুরটুকুও ধরতে পারা জরুরি। মুম্বইতে যখন এলাম, তখন নানা ভাষার গান গাইতাম। তবে ভোজপুরি বা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি আমার টান বরাবরই একটু বেশি। বাংলার বাউল, ভাটিয়ালিও গেয়েছি। বাবার সঙ্গীতে বাংলার প্রভাব খুব বেশি ছিল। উনি নিজেও

দোতারা বাজাতেন। তবে এখনও অনেক আঞ্চলিক গানই গেয়ে উঠতে পারিনি। যেমন জম্মুর ফোক, ঝাড়খণ্ডের কিছু অঞ্চলের গান...তবে সব তো এক জন্মে গেয়ে ফেলা সম্ভব নয়।'' ভোজপুরি গানে তাঁর সুদীর্ঘ কেরিয়ার নিয়ে উত্তর দিতে গিয়ে কল্পনা বললেন, ''ভোজপুরি গানে প্রায় ২০ বছর কাটিয়ে দিলাম, জীবনের অর্ধেকটা সময় বলতে পারেন। দু'ভাগে ভাগ করি সময়টাকে: বিনয় বিহারীজি আমাকে গাওয়াতেন প্রথমদিকে। হাজার-হাজার গান গাইতাম, একটাও ছাড়তাম না। কারণ, একটি সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে অনেক গান গাওয়া জরুরি। আইটেম সং, নৌটঙ্কি সব গাইতাম। দ্বিতীয় ভাগে, ২০১০ নাগাদ মনে হল, আমি তো ভূপেন হাজ়ারিকার জায়গার মেয়ে। উনি যে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা করেছিলেন, সেই ভাবনা কি ভোজপুরি গানে আছে? সেই অনুসন্ধান থেকেই নতুন যাত্রা শুরু হল। নাট্যকার ভিখারি ঠাকুরকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম। 'দ্য লেগাসি অফ ভিখারি ঠাকুর' আমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। একাধিক আন্তর্জাতিক শিল্পী ও বিদেশের এক জনপ্রিয় লেবেলের মাধ্যমে এই প্রজেক্ট মুক্তি পায়। আমার স্বামী পারভেজ় খানও ছিলেন অন্যতম সহায়ক। গর্ব হত বিদেশের শিল্পীদের পাশে ভিখারি ঠাকুরকে নিয়ে কাজও স্থান পেয়েছে। এই প্রজেক্টের তিন নম্বর পার্ট 'গঙ্গাস্নান' নিয়ে কাজ করছি এখন।'' তাঁর সুবাদেই জনপ্রিয় হয়েছে 'খড়ি বিরহা'। কাজ করছেন লোকঙ্গীত সংরক্ষণ নিয়েও, ''বিরহা গায়ন উত্তরপ্রদেশের একটি লোক-সাহিত্য, যদুবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোক স্টুডিওতে একবার পাপন-এর সঙ্গে গেয়েছিলাম। কিন্তু মনে হয়েছিল এখানে ভোজপুরি গান নিয়ে আসতেই হবে! পরের বছর 'খড়ি বিরহা' গেয়েছিলাম। ভোজপুরি সঙ্গীতকে সংরক্ষণের কাজ তো করিই, তার সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ট্রাইবাল ডায়লেক্টস ও ফোক মিউজ়িকের কথাও বলব। ওরাল ট্র্যাডিশনে লোকসঙ্গীত বরাবরই আছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রজন্মান্তরে তা হয়তো কিছুটা অবলুপ্ত। এখন তো ডিজিট্যালি প্রিজ়ার্ভেশন সম্ভব। সরকারের তরফ থেকেও সাহায্য পাচ্ছি। অ্যান্থোলজি অফ বিরহা বলে একটি প্রজেক্টেও কাজ করছি। অসম, বাংলা আর উত্তর-পূর্ব ভারত, এই তিন জায়গা নিয়েই মূলত কাজ করছি।'' 'খট্টা মিঠা', 'বেগম জান', 'বিল্লু বারবার'-সহ অনেক ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন কল্পনা। বলিউডের গানে ভোজপুরির ব্যবহার সম্পর্কে বললেন,


কল্পনা পটওয়ারি

''খুব একটা খুশি নই আমি। একটা সময়ে 'খাইকে পান বনারসওয়ালা', 'চলত মুসাফির' ভাল ছিল। কিন্তু হোলির গান 'বলম পিচকারি'-র মতো একাধিক গানে ভোজপুরি মিউজ়িকের মূল সুরকে হয়তো বলিউড ধার করেছে। কিন্তু এখনকার বলিউডের ছবিতে ছট গান, বিরহা, নৌটঙ্কি, বিদাই গীত দেখানো হয়নি। ভোজপুরি গানকে শুধু ধমাকেদার ভাবলেই হবে না।'' লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। এই নিয়ে গানও বাঁধেন। আলাপচারিতার মাঝেই বললেন, তাঁর সাপোর্ট সিস্টেমের কথাও। বাবা-মা তো বটেই, তিন বোন, মামা (যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী), স্বামীর কথা বললেন তিনি। ''ভূপেন হাজ়ারিকাজিকে অসমের মতোই বাংলা প্রচুর সম্মান দিয়েছে। আমার বাবার কথাও বলব। তাই বাংলার কাছে আমি সবসময় নতমস্তক। ভিখারি ঠাকুরও কিন্তু ছাপড়া থেকে খড়গপুর, কলকাতায় এসেছিলেন। বাংলায় একাধিক ছবিতেও গেয়েছি। জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সমিধের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু এখনও বাংলার অনেক ফোক গান গাওয়া বাকি...''বলে শেষ করলেন তিনি।

স্বরূপ খান

তরুণ লোক-আঙ্গিকের গায়কদের মধ্যে খুব দ্রুতই নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন রাজস্থানের শিল্পী স্বরূপ খান। রিয়েলিটি শো থেকে জার্নির শুরু, তারপর স্বতন্ত্র কাজের পাশাপাশি বলিউডেও রীতিমতো হিট প্লেব্যাক গায়ক স্বরূপ! 'পিকে'-র 'ঠরকি ছোকরো' বা 'পদ্মাবত'-এর 'ঘুমর'-এর নেপথ্য কণ্ঠ তাঁরই। ঝুলিতে রয়েছে আরও একাধিক হিট গান, তবে সেসব গানেই লেগে রয়েছে রাজস্থানের মাটির টান। 'ধনক', 'মুক্কেবাজ়', '৭৭৭ চার্লি'র মতো ছবিতেও গান গেয়েছেন বছর ৩১-এর এই যুবক। খুব কম বয়সে গানের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া স্বরূপের। সে প্রসঙ্গে বললেন, ''গানই বোধহয় প্রথম ভাষা যা আমরা শিখি। আমাদের পরিবারে, রক্তে, সংস্কৃতিতে সঙ্গীত আছে। তাই ঠিক কত কম বয়স থেকে গান গাইতে শুরু করেছি বলতে পারব না। জন্মের প্রথম দিন থেকেই বোধহয় গান আমার সঙ্গে ছিল। তবে আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারেন, একটি সর্বভারতীয় রিয়েলিটি শো-তে নির্বাচিত হওয়া। জীবন একদম ৩৬০ ডিগ্রি বদলে গিয়েছিল তারপর থেকে।'' ফোক মিউজ়িকের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা। মাটির গানের অনুপ্রেরণা পান কোত্থেকে? উত্তরে জানালেন, ''আসলে গানের সুরেলা নির্যাস বোধহয় আমার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করে। আর গানই আমাকে আরও গান তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্যি বলতে, কম্পোজ় করার আগে আমি বিশেষ ভাবনাচিন্তা করি না। ইট জাস্ট ফ্লোজ়। কিন্তু যেহেতু আমার মন-শরীর-আত্মাজুড়ে লোকগান রয়েছে, তাই আমার সৃষ্টিতেও লোকসঙ্গীতের প্রভাব দেখতে পাবেন বেশি। আমার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গেই সঙ্গীত জড়িয়ে। তাই প্রথাগত শিক্ষা সেভাবে নিই নি।'' আমির খানের লিপে 'ঠরকি ছোকরো'র অফার তাঁর কাছে এসেছিল রিয়েলিটি শোয়ের প্রতিযোগী হওয়ার সুবাদেই। শোয়ের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজকুমার হিরানি। তিনি স্বরূপের গান শুনে তাঁকে অফার করেন গানটি। আমির খান, সঞ্জয় দত্তর মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করা স্বরূপের কাছে বিশাল প্রাপ্তি, স্বীকার করলেন তিনি। '''পদ্মাবত'-এর 'ঘুমর' কিন্তু রেগুলার ফোক নাম্বার ছিল। তা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের কত অসংখ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছিল এই গান! বলিউড যেভাবে নিজের



'পিকে'-র গানের দৃশ্য

শিকড়ের কাছে ফিরছে, লোকসঙ্গীতকে ব্যবহার করছে তাতে আমি সত্যিই আনন্দিত,'' জানালেন তিনি। রাজস্থানি লোকসঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন মামে খানের মতো একাধিক বড় নাম। একই মাটি থেকে এতজন শিল্পী উঠে আসার রহস্যটা কী? হাসতে হাসতে জানালেন, ''হয়তো আমাদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ডই ফোক সঙ্গীতের, কিন্তু প্রত্যেকে নিজস্বতা বজায় রেখে কাজ করেন। আমিও যেমন প্রতিদিন শিখি, সবধরনের গানের প্রতি নিজেকে ওপন রেখেছি।'' কলকাতা নিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরূপ! ''কলকাতা হ্যাজ় মাই হার্ট। আমাদের মাঙ্গনিয়ার গোষ্ঠীর যেমন রক্তে সঙ্গীত, তেমনই কলকাতার মানুষদেরও। ওঁরা মিউজ়িক্যালি এতটাই সমৃদ্ধ যে ভাল গান মন দিয়ে শোনেন। কলকাতায় পারফর্ম করতে গিয়ে ওঁদের ভালবাসায় আমি আপ্লুত হয়েছি,'' বলে থামলেন তিনি।

দীপান্বিতা আচার্য

মুর্শিদি, মারিফতি বা মহাজনি গানের পাশাপাশি বিহু, কামরূপি লোকগান, কালবেলিয়া, রাস গরবা...লোকসঙ্গীতের নানা আঙ্গিকে দীর্ঘদিন ধরেই সাবলীল বিচরণ দীপান্বিতা আচার্যর। দেশ-বিদেশে একাধিক কনসার্ট, মিউজ়িক ফেস্টিভ্যাল, কোলাবরেশনের পাশাপাশি সিনেমাতেও গান গেয়েছেন। কিছুদিন আগে রণবীর সিংহের মিউজ়িক লেবেলের হয়ে স্লো চিতা-র সঙ্গে তাঁর কোলাবরেশন রীতিমতো শিরোনামে ছিল। 'ফোক ফাউন্ডেশন' আর 'ফিডলারস গ্রিন'-এর লিড ভোকালিস্টও তিনি। ছোটবেলায় লোকসঙ্গীতের প্রতি ভালবাসার কথা জানাতে গিয়ে বললেন, ''বাড়িতে মনসামঙ্গল পাঠের চলন আছে। ছোটবেলায় দেখতাম, জেঠিমা-কাকিমারা গাইতেন। আর আমরা ছোটরা বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কোরাস গাইতাম। আমার পরিবার চট্টগ্রামের মানুষ, এটা ওখানকারই রীতি। আমার ছোটবেলা কেটেছে মধ্যমগ্রামে। তখন মনসামঙ্গলের গান করতাম বটে, কিন্তু কখনওই সচেতনভাবে বুঝিনি ওটা লোকগান বা কিছু। আর পাঁচজনের মতোই ছোটবেলায় গান শিখতাম, ক্যাসেট শুনে শুনে লোকগান তুলতাম। ভাল লাগত। হয়তো দশটা অন্য গান গাইলে তিনটে লোক গান গাইতাম। দেখতাম, মানুষ বেশ ভালভাবে গ্রহণ করছেন। ক্লাস টুয়েলভের সিরিয়াসলি গানবাজনা করব ভাবি। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একসঙ্গে শিখতে শুরু করি। এঁরা কেউই লোকগানের মানুষ নন। গজ়ল, ভজন, নজরুলগীতি, আধুনিক গান শিখতাম। হঠাৎ একদিন একজন ফুচকা বিক্রেতার কথা পড়ি। বারাসতে থাকতেন উনি, দোতারা বাজিয়ে গান করতেন। ওঁর কাছে চলে গেলাম একদিন। উনি শেখাতে শুরু করলেন। আমার উচ্চারণ ভাল ছিল না, পড়াশোনাও ছিল না। উনি প্রথমে বললেন, আমি কিছুই পারছি না! কয়েকদিন পরে আর শেখালেন না, লোকসঙ্গীত শেখা বন্ধ হয়ে গেল। এরপরে অভিজিৎ বসুর কাছে নানা অঞ্চলের গান ১৩ বছর মতো শিখেছি। আমি নানা ভাষায় গাইতে শুরু করলাম। রাজস্থানি, গুজরাতি ভাষায় বেশি গাইতাম। ওই দুই ভাষার বন্ধুদের থেকে শিখেছি প্রচুর। পার্বতী মা (বাউল)-কে দেখে মুগ্ধ হলাম। উনি আমাকে খুব সাহস দিয়েছিলেন।'' আরও যোগ করলেন, ''আমার বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। আমি গান করব শুনে উনি বলেছিলেন 'নিজের হাতখরচা নিজেই চালাবে।' প্রথম থেকেই শো করার তাগিদ ছিল। প্রথম শুরু করেছিলাম রাজস্থানি ওয়েডিং দিয়ে। কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞতা অতটা ভাল লাগে নি। এখন আমি এমন কিছু মিউজ়িশিয়ানদের সঙ্গে কাজ করি, যাঁদের সূত্রে রাজস্থানের বার্নোয়া জাগিরে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে থেকে গান তৈরি করছি। রাজস্থানের এই গ্রামে সকলেই মিউজ়িশিয়ান। এমনকি সকালে ঘুম থেকে উঠেও ওঁরা গানবাজনা নিয়েই ঝগড়া করেন! আমি সবসময় চাইতাম, ওখানকার মাঙ্গনিয়ার গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করব। এছাড়া আমার 'ফোক ফাউন্ডেশন'-এর হয়ে গাজ়ি খান ও তলব খানের সঙ্গে একটি কোলাবরেশন প্রজেক্ট করছি। কচ্ছের এক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মোরালালা মারওয়াড়ার সঙ্গে একটি প্রজেক্ট করছি। কলকাতায় 'ফোক ফাউন্ডেশন'-এর তরফ থেকে আমি অহমিয়া গানের সঙ্গে ওঁর গানের কোলাবরেশন করি। সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। আমি 'ফিডলারস গ্রিন'-এও ভোকালিস্ট। বাসুদেব বাউলের সঙ্গে কোলাবরেট করে একটি অ্যালবাম করছি।'' লকডাউনে তাঁর হাতে এসেছিল একটি উল্লেখযোগ্য প্রজেক্ট। যাঁর নেপথ্যে স্বয়ং রণবীর সিংহ! সে কথা বলতে গিয়ে দীপান্বিতা বললেন, ''রণবীর সিংহের মিউজ়িক লেবেলেও কাজ করেছি। লকডাউনে একদিন হঠাৎই ফোন আসে, রণবীর সিংহের অফিস থেকে বলছি! ওঁরা প্রথমেই বললেন, একটি হিপ হপ ট্র্যাক আছে। তার সঙ্গে একটি বাংলা গানের রেফারেন্স দিলেন ওঁরা। এই দু'টোর ফিউশন ভাবছিলেন তাঁরা। 'শাওন রাতে যদি...' এই গানটির উপরে কিছু একটা বানাতে বললেন। কিন্তু আমার ছেলে বলল, যে শিল্পীর সঙ্গে কাজের কথা হচ্ছে, সেই স্লো চিতা খুব নামী শিল্পী! তারপরে একটু একটু করে কম্পোজ় করতে শুরু করি। পরে কাজটা ওঁদের এতই পছন্দ হয় যে রণবীর নিজেও শেয়ার করেছিল।'' দীপান্বিতার স্বামী একজন শিক্ষক। উনি সবসময় স্ত্রীকে সাপোর্ট করেছেন। ''আর ছেলে (আরিয়ান আচার্য) এখন ক্লাস এইটে পড়ে, ও-ও মিউজ়িশিয়ান। ড্রামস, ভায়োলিন, কর্ণাটকি তাল, ক্লাসিকাল ভোকাল, শ্রীখোল সব শিখছে। আমাদের বাড়িতে সর্বক্ষণ গান নিয়েই কথা হয়। যখন গান নিয়ে আলোচনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমরা পড়াশোনা করি'' হাসতে হাসতে



স্বরূপ খান

জানালেন দীপান্বিতা।

দেব চৌধুরী

লোকসঙ্গীতের সংরক্ষণ নিয়ে অনেকদিন ধরেই কাজ করছেন দেব চৌধুরী। অবশ্য দেবের পরিচয় তিনি 'সহজিয়া' ব্যান্ডের ভোকালিস্ট। সেই সূত্রেই দেশে-বিদেশে পারফর্ম করেছেন। শ্রোতাদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। শুরুর কথা বলতে গিয়ে দেব জানালেন, ''আমার প্রথম গুরু, যাঁকে দেখে আমি জীবনযাপন ও সঙ্গীত-যাপনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম তিনি গৌতম চট্টোপাধ্যায় ('মহীনের ঘোড়াগুলি' ব্যান্ডের ভোকালিস্ট)। ওঁর কাছেই প্রথম গিটারে হাতেখড়ি আমার। গৌতমদা বাংলা ব্যান্ড-সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলার লোকায়ত ধারাতেও অনায়াসে বিচরণ করতেন। নয়ের দশকে তাঁর হাত ধরেই আমার গৌরক্ষ্যাপা, পবনদাস বাউলের মতো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। লোকসঙ্গীতের কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছিল না আমার। পুরোটাই জীবন থেকে পাওয়া। ২০০৮ সালে মা মারা যান। তারপর ধূপগুড়ির কালাচাঁদ দরবেশের কাছে সঙ্গীত, ভাবনা ও জীবনগত আশ্রয় নিয়েছিলাম। ওঁরই স্নেহছায়ায় আমি দরবেশি ও মারফতি গানের ভাব, তত্ত্ব ও দর্শন শেখার চেষ্টা করি। পরেরদিকে অবশ্য দেবদাস বাউল, মনসুর ফকির, সাধনদাস বৈরাগ্যের মতো একাধিক গুরু পেয়েছি। এঁরাই আমার লোকগানের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।'' ব্যান্ড তৈরি হয় ২০১১-তে। ''সহজিয়া ফাউন্ডেশনের পারফর্মিং উইং, 'সহজিয়া ফোক ব্যান্ড' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ২০১১ সালে। এক মেডিক্যাল কলেজের সোশ্যালে প্রথমবার পারফর্ম করি আমরা ব্যান্ড হিসেবে। তারপরে সময়ের নিয়মে ব্যান্ড ছেড়ে অনেকে চলে গিয়েছেন, আবার নতুন সদস্য এসেছেন। এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমান ধারা। বর্ষীয়ান লোকসঙ্গীত শিল্পীদের জন্য সহজিয়া গত ১১বছর ধরে নানা সহযোগিতামূলক কাজ করে চলেছে। আমরা মিনিস্ট্রি অফ কালচারের একটি পেনশন স্কিম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছি। ইতিমধ্যেই শতাধিক বর্ষীয়ান লোকশিল্পী এই প্রকল্পের অধীনে এসেছেন ও মাসে ৬০০০টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন। এছাড়া বাংলার মৃতপ্রায় কিছু শিল্পকে সংরক্ষণের কাজও করছি। শুরু করেছিলাম দরবেশি গান দিয়ে। দরবেশি গানের অস্তিত্ব কথকতায় থাকলেও কালাচাঁদ দরবেশ ছাড়া বিশেষ কেউ এই গান গাইতেন না। কিন্তু এখনকার অনেক লোকসঙ্গীতশিল্পীই দরবেশি গান জানেন। দশটা লোকগান গাইলে তার মধ্যে অন্তত একটা দরবেশি গানের অনুরোধ আসে। আরও একটি বিলুপ্তপ্রায় গান হল 'তুক্ষা গান'। উত্তরবঙ্গের প্রায় বিস্মৃত এই ধারাকে সংরক্ষণের জন্য আমরা ধনেশ্বর রায়কে নিয়ে কাজ করছি। পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলার নানা মৃতপ্রায় শিল্পধারা আর্কাইভিংয়ের কাজ করছি।'' তবে পিওর ফোকের পাশাপাশি লোকসঙ্গীত নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। কেমন লাগে সেসব? ''জীবনের খুব স্বাভাবিক নিয়মেই লোকসঙ্গীতের মধ্যে অন্যান্য সঙ্গীতের ধারা মিশতে থাকে। আধুনিকতার রং লাগে। সমকালীনতার ছোঁয়া লাগে। তাতেই সাংস্কৃতিক নাব্যতা বজায় থাকে। তবে ফিউশনের প্রসঙ্গে বলি, ফিউশন যদি সাঙ্গীতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়, তাতে যদি গানের মূলভাব ঠিক রেখে তাতে আধুনিকতা বা আন্তর্জাতিকতা মেশানো যায়, তাহলে তা অবশ্যই স্বাস্থ্যকর। শ্রোতারা এধরনের নতুন সাউন্ড ও মিউজ়িক ডিজ়াইন শুনতে চান। আর আমি এ সময়ে দাঁড়িয়ে একে খুব প্রয়োজনীয় বলেও মনে করি। বাংলার দর্শন সঙ্গীত আমার প্রিয় ও কাজের জায়গা। এছাড়া কেরল ও অসমের লোকসঙ্গীত আমাকে বিশেষ টানে।'' দেব কিছুদিন আগেই আমেরিকার ন্যাশভিলে এক কনসার্টে গান গাইতে গিয়েছিলেন। টেক্সাসের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেফার্ড স্কুল অফ মিউজ়িকের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও ডক্টরাল ফেলোদের নিয়ে সেমিনারেও একমাত্র বক্তা হিসেবে গিয়েছিলেন। এছাড়া একটি হিন্দি ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও করলেন তিনি। আর একাধিক রিয়েলিটি শোয়ে গ্রুমার বা মেন্টর হিসেবে কাজ করেন দীর্ঘদিন ধরেই। সিনেমায় লোকসঙ্গীতের ব্যবহার নিয়ে দেবের মত, ''বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমায় বরাবরই লোকসঙ্গীতের আলাদা জায়গা ছিল। শচীন দেব বর্মন বা কিছুটা রাহুল দেব বর্মন বাংলা লোকসঙ্গীতকে সর্বভারতীয় সিনেমায় ব্যবহার করেছেন। এখনও শিবপ্রসাদদা, সৃজিতদা বা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় আবহে বা অভিনেতার লিপে ফোক-আঙ্গিকের গান রাখেন। রিয়্যালিটি শো-তেও অনেকেই ফোক গান করেন।'' লোকসঙ্গীত যে নতুন প্রজন্মকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।


দেব চৌধুরী ও সহজিয়া ব্যান্ড


ছেলেও মিউজ়িশিয়ান



ফুচকা চরিত

ফুচকা— বাঙালির কাছে শালপাতায় মোড়া একরাশ আনন্দ। কলকাতার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে স্বাদের গুপ্তধন। সুলুকসন্ধানে অনিকেত গুহ।

স্বাদ আগে না স্বাস্থ্য? এই বিতর্ক চিরন্তন। কিন্তু তর্কপ্রিয় বাঙালি এই বিষয়ে কখনই তর্কে যেতে রাজি নয়। স্বাস্থ্যের কদর যতই বাড়ুক না কেন, রসনাবিলাস-ই বাঙালির শেষ কথা। স্ট্রিটফুড হোক বা মুখরোচক খাবার, বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে 'ফুচকা'র স্থান অমলিন। উত্তরের বনেদিয়ানা বা দক্ষিণের আধুনিকতা, শহরের অলিগলি হোক বা গ্রামের মেঠোপথ, ফুচকার স্বাদে মিলেমেশে একাকার আপামর বঙ্গবাসী। চিরনূতন এই স্বাদের উৎস লুকিয়ে আছে বাংলার বাঁকে বাঁকে। এই লেখা ইতিহাস ও একরাশ আনন্দের মিশেলে তৈরি বাঙালির প্রিয় ফুচকার এক বহমান জীবনচরিত।

গল্প হলেও সত্যি

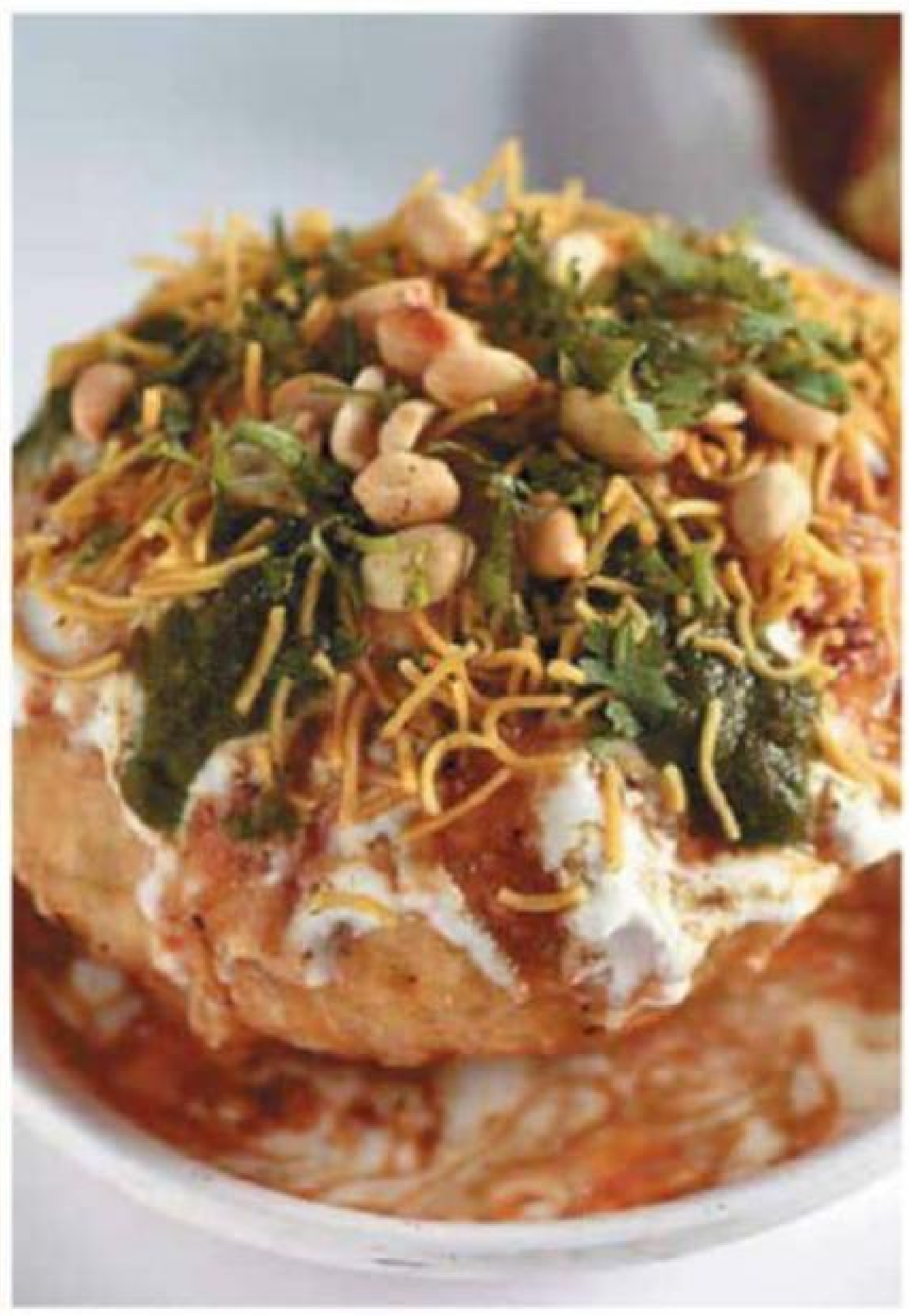
শোনা যায় ফুচকার জন্ম-ইতিহাস লুকিয়ে আছে সুদূর মগধের মাটিতে। ষোড়শ মহাজনপদের কেন্দ্রবিন্দু মগধে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে পাওয়া একাধিক হিন্দুগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থে এক বিশেষ ধরনের হালকা খাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছুটা ছোট আকৃতির ময়দার মণ্ডে বিভিন্ন ধরনের

সবজি ও আলুর পুর দিয়ে পরিবেশন করা হত। মুচমুচে ও মুখরোচক এই খাবার 'ফুলকি' নামে পরিচিত। সম্ভবত এই 'ফুলকি' থেকেই 'ফুচকা' নামের উৎপত্তি। আজও উত্তর ভারতের একাধিক জায়গায় এই নামের চল রয়েছে। অন্য একটি মত অনুসারে, ফুচকার জন্ম মহাভারতের পাণ্ডবকুলে। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন রাজমাতা কুন্তীর নির্দেশে দ্রৌপদী ঘরোয়া উপকরণে সৃষ্টি করেন এক অনবদ্য খাবার। দ্রৌপদীর এই সৃষ্টির হাত ধরেই বাংলার ইতিহাসে ফুচকার প্রবেশ। শুনতে অবাক লাগলেও অতীত-ইতিহাস সেই কথাই বলে। যে ফুচকা সকাল-সন্ধ্যায় লোকের হাতে হাতে ফেরে, তার জন্ম আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে! এই জার্নির উত্থান-পতন আছে, রয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুদীর্ঘ ইতিহাস। স্ট্রিটফুড হিসাবে স্বীকৃত হলেও ফুচকার 'খাদ্য' মর্যাদা আসে অনেক পরে। চলতি শতকের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য গবেষণা সংক্রান্ত সংস্থা একটি রিপোর্ট পেশ করে। যেখানে কলকাতার স্ট্রিটফুড হিসেবে চাউমিন, ঘুগনি ও ফুচকাকে 'খাদ্য'-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মাত্র পাঁচ-সাত টাকায় ১০০০ ক্যালরিযুক্ত খাবারের খোঁজ পাওয়া কলকাতার রাস্তা ছাড়া সম্ভব নয়। সেই সময়ে মডেল হিসেবে কলকাতার চারটি স্থান বেছে নেওয়া হয়, রাসেল স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী ও এলগিন রোড। স্বমহিমায় সেই পরীক্ষা উতরোয় কলকাতার পথের খাবার। তারপর শুধুই সময়ের বয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে ফুচকা হয়ে উঠে কলকাতার স্ট্রিটফুডের রানি। সেই ধারায় আজও ভাটা পড়েনি। শুধুই কি রসনাতৃপ্তি? কলকাতার স্ট্রিটফুডকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু মানুষের যোগাযোগ, সৃষ্টি হয়েছে দিনযাপনের রসদ। পাড়ার মোড়ের 'ফুচকাওয়ালা'ও হয়ে উঠেছে আমাদের প্রতিটা বিকেলের সঙ্গী।


ফুচকার লোভনীয় প্ল্যাটার

প্ল্যাটারে চিজ় ফুচকার রমরমা। চাহিদাতেও টেক্কা দিচ্ছে বাকিদের। সঙ্গে রয়েছে নবাবি ফুচকার স্বাক্ষর। দই ফুচকার চিরাচরিত ফ্লেভার। পুজোর কলকাতায় বরাবরের হিট।

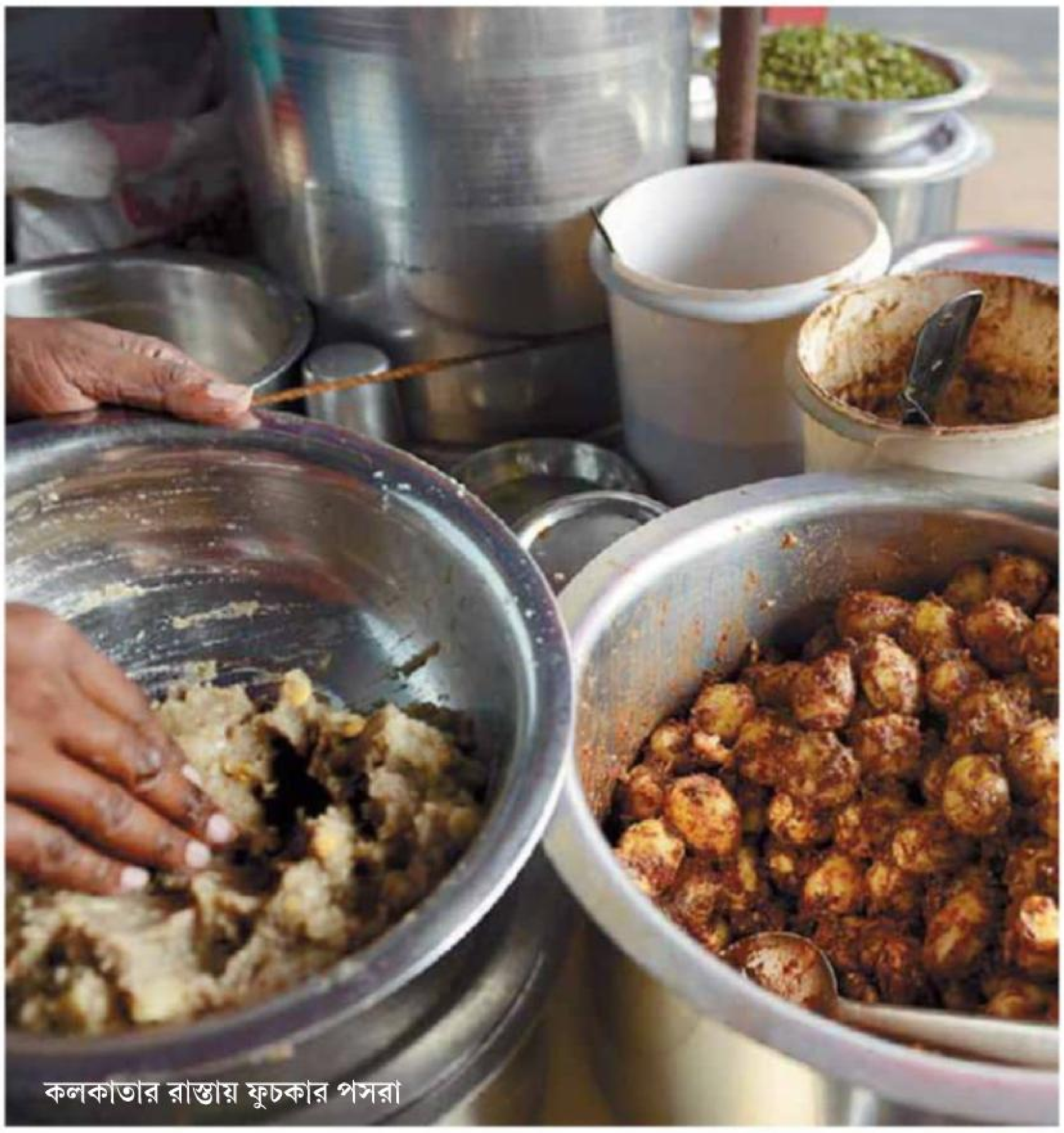




নাম দিয়ে যায় চেনা

স্থান বদলের সঙ্গে স্বাদ বদল হয়, বদল হয় নামেরও। বাংলার আট থেকে আশি 'ফুচকা' শব্দে গা-সওয়া হলেও বাংলার বাইরে চিত্রটা একটু ভিন্ন। প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘাঁটলে সংস্কৃত ভাষায় 'জলসত্র' নামক এক মুখরোচক খাবারের সন্ধান পাওয়া যায়। জলসত্রের উল্লেখ মেলে বল্লাল সেনের লেখায়। প্রাচীন বাংলার এই 'জলসত্র'ই আধুনিক ফুচকার পূর্বসূরি। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাডু ও নেপালের বৃহত্তর অংশে ফুচকার স্থানীয় নাম 'পানিপুরি'। ফুচকা ও পানিপুরি আইডেন্টিক্যাল টুইন। সামান্য ফারাক দেখা যায় গুজরাতে। চৌকো করে কাটা আলুর টুকরোর সঙ্গে থাকে সেদ্ধ মুগডাল। মিষ্টি খেজুরের চাটনির সঙ্গে পানিপুরি পরিবেশিত হয়ে থাকে। ফুচকার আর এক নাম পরিচিত নাম 'গোলগাপ্পা', সমগ্র উত্তর ভারত যাকে এক ডাকে চেনে। দিল্লি থেকে হিমাচল, উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরাখন্ড, গোলগাপ্পায় নিহিত উত্তরের পথের স্বাদ।




কলকাতার রাস্তায় ফুচকার পসরা


চকোলেট ফুচকা

চকোলেট ফুচকার ক্রেজ় ইয়ং জেনারেশনের কাছে এখন চূড়ান্ত। হট চকোলেট বা চকোলেট সিরাপের সঙ্গে ফুচকার যুগলবন্দি পুজোর বাজারে সুপারহিট। ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে চেখে দেখতে পারেন আপনিও।

আকারে কিছুটা এলিপটিক্যাল বা ডিমের মতো। স্বাদে ফুচকার সমকক্ষ। হরিয়ানার কিছু অংশে গোলগাপ্পার স্থানীয় এক ধরন চোখে পড়ে। ধনেপাতা ও কারিপাতার সহযোগে গোলগাপ্পার বিশেষ এই ধরনের নাম 'পানি কে পাতাসে'। অতিরিক্ত পাতার ব্যবহার এই নামের সম্ভাব্য কারণ। ওড়িশা, ছত্তীসগঢ়, হায়দরাবাদ ও তেলেঙ্গেনায় ফুচকার খুব ইন্টারেস্টিং একটি নাম পাওয়া যায়, 'গুপ চুপ'। তেঁতুল ও লেবুর রসে মাখা মশলাদার জল সমেত ফুচকা মুখে দিলে ঘটে স্বাদের বিস্ফোরণ। নামের কারণও ঠিক তাই। অবাক লাগে তাই না? স্বাদের ঝুলি নিয়ে বাঙালির ঘরের ফুচকা এভাবেই নেমেছে দেশজয়ের পথে।

কলকাতার ফুচকাওয়ালা

যে-কোনও দিন একটু বিকেল করে হাতিবাগান বা গড়িয়াহাটে বেরিয়ে পড়ুন। আপনার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পথের ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ফুচকার স্টলে চোখ আটকাবেই। কলকাতার অলিতে-গলিতে লুকিয়ে আছে বিচিত্র সব ফুচকার সম্ভার, সময়ের সঙ্গে বদলেছে স্বাদের ধারা। প্রচলিত আলু-লেবু-টকজলের বাইরে গিয়ে ফুচকার অঙ্গেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। কলকাতার ফুচকার প্রসঙ্গে প্রথমেই যে স্থানের উল্লেখ প্রয়োজন, তা হল বরদান মার্কেট। মাদার টেরেজ়া সরণি ধরে ক্যামাক স্ট্রিট ক্রসিং। অ্যালেন পার্ককে পিছনে ফেলে মিনিটদুয়েক হাঁটলেই বাঁ হাতে পড়বে কৃষ্ণকান্ত শর্মার বিখ্যাত ফুচকার স্টল। প্রায় চার দশক আগে কৃষ্ণকান্ত নিজেই এই ব্যবসা শুরু করেন। এই স্টল থেকে ফুচকা খাওয়া পথচলতি মানুষের এক রকমের অভ্যেস। বর্তমানে তার ছেলে এই দোকান সামলায়। কথা প্রসঙ্গে সে বলল,''এখানে বেশি ভিড় হয় ডিসেম্বরে, ক্রিসমাসের সময়। তখন আলাদা করে লোকও ভাড়া করতে হয়।'' সাধারণ আলু-ফুচকার পাশাপাশি 'মালাই ফুচকা', 'চটপটা ফুচকা', 'ফুচকার চাট' ইত্যাদি পাওয়া যায়। রয়েছে 'স্পেশ্যাল ফুচকা', যেখানে আলুর পুরে ধনেপাতা, চাট মশলা এবং মটরের মিশ্রণ থাকে। 'খাট্টামিঠা' জলের সহযোগে ফুচকার স্বাদ আপনার মন ভাল করে তুলবেই। দক্ষিণ কলকাতার বনেদিয়ানা আজও অটুট ভবানীপুর অঞ্চলে। রাস্তার আঁকেবাঁকে লুকিয়ে আছে অতীত-ইতিহাসের মৌন স্বাক্ষর। চক্রবেড়িয়া রোড ধরে এগিয়ে গেলে কাছেই পড়বে 'ভবানীপুর ফুচকাওয়ালা'। রাস্তার উপরেই ছোট্ট স্টল। এই দোকানের গোড়াপত্তন হয় ১৯৮০-র দশকে। সেই সময় ভবানীপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ফুচকার দোকান খুব একটা ছিল



আধুনিক ফুচকা-বিপণি



প্রভেশ ফুচকা, আলিপুর

নানা স্বাদের ফুচকা

অসাম থ্রিসম: টক-ঝাল-মিষ্টি এই তিন ধরনের চাটনির কম্বো
নবাবি ফুচকা: স্টাফিংয়ে কাসুন্দির ঝাঁঝালো স্বাদ সঙ্গে বেদানার টাচ
সাউথবড়া ফুচকা: দইবড়া ও ফুচকার ইউনিক কম্বিনেশন
আম-রস ফুচকা: পাকা আমের রসে সিক্ত কলকাতার ফুচকার নতুন অবতার
আইসি ফুচকা: ভ্যানিলা, চকোলেট ও টুটিফ্রুটি আইসক্রিমের লা-জবাব ব্লেন্ডিং
(তথ্য সৌজন্যে: মুয়া ফুচকা)



না। লোকমুখে নাম হয়ে যায় ভবানীপুর ফুচকাওয়ালা। সেই শুরু। তাদের ফুচকার ঐতিহ্য বর্তমানেও বহমান। সাধারণ ফুচকার পাশাপাশি ‘চানা ফুচকা’, ‘আলুর দম ফুচকা’-এর চল খুব বেশি। চক্রবেড়িয়া রোডের আর-এক প্রান্তে রয়েছে কলকাতার বিখ্যাত ‘জৈন ফুচকা’। অন্যান্য জায়গার থেকে একেবারেই ব্যতিক্রমী। ভবানীপুরের এই অঞ্চলে জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস দেখা যায়। বিশেষ ধর্মীয় রীতি পালনের সময় আলুর পরিবর্তে কাঁচকলার পুরের ব্যবহার দেখা যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় চানামটর, পকোড়ি। থাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি ‘জৈন জল’। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারের রীতি থেকে এই বিশেষ ফুচকার আয়োজন। দক্ষিণ কলকাতার ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের অদূরেই রয়েছে দিলীপ দা’র ফুচকার দোকান। কলকাতার স্ট্রিট-ফুচকার ইতিহাসে সম্ভবত সর্বাধিক ভ্যারাইটির ফুচকা পাওয়া যায় এই চত্বরে। ‘আলুর দম ফুচকা’, ‘দই ফুচকা’, ‘আম ফুচকা’, ‘তেঁতুল ফুচকা’, ‘ঘুঘনি ফুচকা’, ‘টোম্যাটো ফুচকা’, ‘পুদিনা ফুচকা’— এককথায় বলে শেষ করা প্রায় অসম্ভব। খামতি নেই জলের সঙ্গতেও। আমের আচার, কাসুন্দি, খেজুরের চাটনি, পুদিনাপাতার জল... শালপাতা জুড়ে রসনাতৃপ্তির হাজারও আয়োজন। ভিক্টোরিয়া, ময়দান ও ফুচকা, বাঙালির এভারগ্রিন ট্রায়ো। ফুচকার হাত ধরে কলকাতার এই অঞ্চলে যেন বারোমাসই বসন্ত। এই স্থানেই দীর্ঘদিনের ব্যবসা রাজীব কুমারের। ‘‘সপ্তাহের সাতদিনই থাকি। রবিবারে ভিড় হয় খুব বেশি। করোনার সময়েও ব্যবসা করেছি। কিন্তু বাজার এখন আগের চেয়ে খারাপ। বাপ-ঠাকুরদার সময়ের ব্যবসা তাই ছাড়তে মন চায় না।’’, আক্ষেপের সুরে বললেন তিনি। ময়দানের সবুজ ছাড়িয়ে এবার আসা যাক আদি গঙ্গার তীরে। রাসবিহারি পেরিয়ে চেতলা রোড হয়ে আলিপুরের রাস্তায় পাবেন ‘প্রভেশ ফুচকা’। স্থানীয় লোকজন তো বটেই, কলকাতার নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে ভিড় করে ফুচকার টানে। রয়েছে প্রায় সতেরো ধরনের ফুচকার পসরা। প্রতিটিই একদম ইউনিক ও আনকোরা। ‘ক্যায়রি ফুচকা’, ‘শেজ়ওয়ান ফুচকা’, ‘ধোকলা ফুচকা’, ‘চুরমুর ফুচকা’, ‘বাটাটা ফুচকা’, ‘টোম্যাটো মশলা ফুচকা’ উল্লেখযোগ্য। শুধু নামেই নয়, স্বাদের বাহারও আপনাকে বারবার ফিরিয়ে আনবে। বলা বাহুল্য, একাল-সেকালের গতানুগতিক ফরম্যাটে ধরা দিচ্ছে ফুচকাও। স্বাদের বিভিন্নতার পাশাপাশি উঠে আসছে বিষয়ভিত্তিক রূপান্তর। রাস্তার স্টলের পাশাপাশি পাঁচতারা হোটেল বা এয়ারকন্ডিশন্ড শপিং মলেও স্থান পাচ্ছে বাঙালির চিরন্তন ফুচকা। তৈরি হচ্ছে ফুচকার ব্র্যান্ডিং। দু’টাকার ফুচকা তৈরি করছে দু’কোটির ব্যবসা! লক্ষ্মীলাভের এই নতুন দিগন্তে এক উজ্জ্বল নাম কলকাতার ‘মুয়া ফুচকা’। কলকাতায় দু’টি আউটলেট। প্রায় বাইশ ধরনের অত্যাধুনিক স্বাদের ফুচকা এই দোকানের ইউএসপি। স্বাদ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল হতে চাইলে চেখে দেখতে







আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কি?

রাসেল স্ট্রিট: চেখে দেখুন পুদিনা ফুচকার ইউনিক স্বাদ

ম্যাক্স-মুলার ভবন: মশলা ফুচকার রকমারি সম্ভার

লেক কালীবাড়ি: কলকাতার অন্যতম আলুরদম ও ঘুঘনি ফুচকা

বিবেকানন্দ রোড: ভেজ ও নন-ভেজ দু'ধরনের ফুচকার মিশেল

বড়বাজার ক্রসিং: বিখ্যাত হিং ফুচকা



পারেন 'ইমলি খাট্টামিঠা ফুচকা', 'নবাবি ফুচকা', 'পনির ফুচকা', 'চকোলেট ফুচকা', পিৎজ়া ফুচকা', 'আইসি ফুচকা' অথবা 'চিজ় ফুচকা'। এই দোকানের কর্ণধার শ্যাম রায় ভট্টাচার্য জানালেন, ''চিজ় ফুচকার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। কোভিড পিরিয়ডে আমরা অনলাইন বিজ়নেসে নজির সৃষ্টি করেছি। কোভিড টাইমে সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে ফুচকা ডেলিভারি করেছি। মরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ - ঘরোয়া এই সকল উপকরণে তৈরি করেছি 'নো-টাচ ওয়াটার'। ইম্যুনিটি বুস্টের জন্য প্রোভাইড করা হয়েছে এই বিশেষ জল। যার চাহিদা এখনও টলেনি।'' পরের বছর শহরে আরও দুটি আউটলেট খোলার প্ল্যান আছে।''

পজোর মুখে চাহিদা বাড়ে। শহরের ফুচকাওয়ালারা আশায় বুক বাঁধে। কুমোরটুলির কাঁচা মাটিতে সোনার রং লাগে। পাড়ায় পাড়ায় ঠুকঠাক শব্দ জানান দেয় 'সে আসছে'। পাড়ার পল্টু, নিতাই, রাধেশ্যামরা জোরকদমে ফুচকা বানাতে থাকে। বাঁশের খুটির পাশাপাশি তৈরি হতে থাকে স্ট্রিটফুডের স্টল। এক সপ্তাহের জন্য আবার রঙিন হয়ে উঠে কলকাতার রাস্তাঘাট। পুজো আসছে। প্রহর গোনে তারাও। কে, কবে, কোথায় স্টল দেবে, বাগবাজারের রাস্তায় না ম্যাডক্সের মাঠে, প্ল্যানিং চলে সর্বত্র। এই শহরের অলিগলিতে দিনরাত হাঁকে যেসকল ফুচকাওয়ালারা, পুজো আসে তাদেরও। এভাবেই কেটে যাবে ক'টা দিন। কিছু উপরি রোজগারের আনন্দ ছাপিয়ে যায় উৎসবের রোশনাই, জৌলুসকেও। পুজো আসবে, পুজো যাবে। কলকাতার ঐতিহ্য ও ভালবাসার ছায়াসঙ্গী হয়ে আজীবন থেকে যাবে এই 'ফুচকাওয়ালারা'।

ছবি: শুভেন্দু চাকী



ডুবসাঁতারে ব্যস্ত



তিমির খোঁজে মহাসাগরে

চতুর্দিকে আটলান্টিকের সুনীল জলরাশির হাতছানি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে জলের তুবড়ি, আর তার বুক চিরে জলকেলিতে মত্ত তিমির দল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোমাঞ্চকর হোয়েল এক্সপিডিশনের সাক্ষী রইলেন সুচেতনা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী।

ভোর সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। এবারে তড়িঘড়ি বের হতে হবে। মালপত্তর, লটবহর কিছু সেরকম নেওয়ার নেই। শুধু ক্যামেরার ব্যাগখানা আর আমার পিঠের ব্যাগটা তুলে নিয়ে রওনা হলাম। এবার একেবারে হাই-এন্ড অ্যাডভেঞ্চার!

আমাদের জ্যাওরস্কি স্ট্রিটের একেবারে মুখটাতে এসে দাঁড়ালাম। আকাশে এখনও আলো ফোটেনি। অগস্ট মাসেই



বিলাসবহুল অ্যাসিলা এক্সপ্রেস



ট্রেনের গতি নেওয়ার মুহূর্ত



ব্রেকফাস্টের আসর

এমন কনকনে ভোর? শিরশিরে হাওয়াটা গা ঘেঁষে চলে গিয়ে আবার ফিরে ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর একেবারে উত্তরপ্রান্ত থেকে কোনও গুপ্তচর এসে নিউইয়র্ক শহরে আসন্ন শীত উৎসবের জানান দিয়ে যাচ্ছে বারবার।

জ্যাওরস্কি স্ট্রিটের মোড় থেকেই হলুদ ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। নিউ ইয়র্ক পেন স্টেশন এখান থেকে ৪০ মিনিট দূরত্বে। লিঙ্কন স্ট্রিট ধরে গাড়ি চলল তীব্র বেগে। স্ট্রিট লাইটগুলো এখনও জ্বলে আছে। গাড়ির কাচ বন্ধ, তাই বাইরের শীতলতা এখন আর অনুভব করতে পারছি না। স্টেশন চত্বরের একদিকটা একটা বড়সড় শপিং মলের মতো। অন্যদিকে বড় বড় বেঞ্চে বসে থাকা মানুষগুলো দিনের প্রারম্ভে তাদের কর্ম ব্যস্ততার অকূল সাগরে ডুব দেবে বলে সময় গুনছে। মাথার উপর বড় ঘড়িটা টিক টিক করে সেই সময়েরই বার্তা বয়ে আনছে। আমাদের কাছে অ্যাসিলা এক্সপ্রেসের এগজ়িকিউটিভ ক্লাসের টিকিট ছিল। তাই একজ়িকিউটিভ লাউঞ্জে ফ্রি এনট্রি পেয়ে গেলাম। আমার সহযাত্রীরা অনেকেই এক হাতে কফি আর অন্য হাতে নিউজ় পেপার নিয়ে বসে আছে। অনেকে আবার কোট-টাই পরে হাতে ল্যাপটপ ব্যাগ

নিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছে। ডিসপ্লে বোর্ডে ট্রেনের নাম ও তাদের আসা-যাওয়ার সময়সূচি ভেসে ভেসে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি অ্যাসিলা এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ছাড়বে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রেনে উঠে পড়লাম। রুপোলি মোড়কে আবৃত ঝাঁ-চকচকে রেলগাড়ি প্রথম দর্শনেই আমাদের মন ছুঁয়ে গেল। অ্যাসিলা এক্সপ্রেস, অ্যামট্র্যাক রেলওয়ের অন্তর্গত উত্তর আমেরিকার দ্রুততম ট্রেন। ঘণ্টায় এর গতিবেগ প্রায় ২৫০ কিলোমিটার। ট্রেনের ভিতরটা প্লেনের বিজ়নেস ক্লাসের মতো। আমার সহযাত্রীরা তাদের মালপত্রগুলো সব উপরে তুলে শাটার বন্ধ করে দিচ্ছে। ছ'টা কুড়িতে ট্রেন ছেড়ে দিল। রেলগাড়ি স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে চলল হু-হু করে। আন্ডারগ্রাউন্ড টিউব থেকে বের হওয়া মাত্রই, একগুচ্ছ আলো এসে আমার ঠিক পাশেই কাচের জানলাটা ভেদ করে আমাকে স্পর্শ করল। ট্রেনের গতিবেগ ইতিমধ্যেই ঘণ্টায় ২৪২ কিলোমিটার। তবুও সামনের ট্রে টেবলে রাখা কফির নট নড়নচড়ন। আশ্চর্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুততম রেলগাড়ি অ্যাসিলা এক্সপ্রেস হু হু করে ছুটে চলেছে বস্টন শহরের দিকে। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে নিউ ইয়র্ক হয়ে বস্টনের ৭৩১ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে মাত্র সাড়ে ছ' ঘণ্টায়।


আটলান্টিকের বাসিন্দা

নিউ ইয়র্ক পেন স্টেশনের ঠিক বাইরেই হাডসন নদী পার হওয়ার সময় ব্রিজের উপর থেকে ওই দূরে পুরনো আদলে তৈরি হোয়াইট স্টোন ব্রিজের ফাঁক দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের স্কাই স্ক্র্যাপারস এই অগস্ট মাসেও কুয়াশায় মাখামাখি। এই সমস্ত আকাশছোঁয়া ইমারতকে নিয়ে আমার প্রিয় শহরখানা পিছনেই থেমে রইল। আগেই বলেছিলাম, এই ঝকঝকে তকতকে ট্রেনের অন্দরসজ্জা যে কোনও


ক্রুজ় থেকে তিমিদর্শন


অতল নীল জলের প্রাণী

এরোপ্লেনের কেবিনের মতোই। বিমানযাত্রার সঙ্গে পার্থক্য শুধু আকাশ ও মাটির। বিজ়নেস ক্লাসই হোক, কিংবা ফার্স্ট ক্লাস বা কোয়ায়েট ক্লাস, ভিতরে রেলগাড়ির দ্রুততার আভাসটুকুও নেই।
অ্যাপ্রন পরা স্টুয়ার্ড নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সঙ্গে দিয়ে গেলেন লম্বা ফিরিস্তির মেনু কার্ড। বাইরের কুয়াশাজড়ানো আবছা দৃশ্যগুলো দ্রুতগতিতে একে একে পেছনে সরে যেতে লাগল। সেদিক থেকে কিছুক্ষণের জন্য চোখ সরিয়ে নিয়ে মেনু কার্ডের দিকে মন দিলাম। নানা প্রকারের অমলেট, বার্গার, স্যান্ডউইচ, সসেজ— কী নেই এতে? চিজ় অমলেটের উপরই চোখ আটকে গেল। মেরিন বায়োলজিস্ট মাইক ব্রাউনের পাঠানো স্টেল ওয়াগন মেরিন স্যাংচুয়ারির উপর রিসার্চ নোটটা একবার উল্টেপাল্টে দেখে নিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে দেখা হবে। উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, নাকি ধৈর্য হারানোর ব্যাকুলতা... মিলেমিশে সব একাকার হয়ে গেল।
এখন দ্রুততম মার্কিনি রেলগাড়িটার গতিও মন্থর বলে মনে হল। জানলার বাইরে কখনও সবুজে সবুজ চাষের ক্ষেত, কোথাও খাল, বিল, নদী গতিমান হওয়ার ভান করে আমাদের ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উল্টো দিকে ছুটছে। আমরা দাঁড়ালেই ওরাও দাঁড়িয়ে পড়বে। শৌখিন মানুষগুলো এখানে দৃষ্টিনন্দন কোনও স্থান বেছে নিয়ে তাদের সুন্দর বাড়ি বানিয়ে বাড়ির সামনে নিজস্ব মোটরবোট বেঁধে রাখে। ইচ্ছে হলে সমুদ্রের খাঁড়িতে দিনভর ভেসে বেড়ায়। আচ্ছা শেলি কি এইভাবেই কবিতা লিখতেন? বায়রনের সঙ্গে সারাদিন জেনেভা লেকে জল বিহারের পরই তিনি নাকি ‘মঁ ব্লঁ’ লিখেছিলেন।
দেখতে দেখতে রিভার সাইড স্টেশনও পার হয়ে গেল। ছোট্ট একটা নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ পার হচ্ছি, এমন সময় দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের ঝলক দেখা গেল। নদী গিয়ে মিশেছে সাগরে। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলল মহাসাগর। স্ট্যানফোর্ড, রোড আইল্যান্ড, নেওয়ার্ক স্টেশনে যাত্রীদের ওঠনামা কিছুমাত্রায় বেশিই ছিল। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির

দৌরাত্ম্যে একঝাঁক ছাত্রছাত্রী পিলপিল করে স্ট্যানফোর্ড স্টেশনে নেমে গেল। মহাসাগরের ধার ঘেঁষে রেললাইন আমাদের বস্টন সেন্ট্রালে পৌঁছে দিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন চত্বরের বাইরে এলাম। শান্তিপ্রিয় এই শহরটার মানুষগুলোকে দেখলে মনে হয়, প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের সূচি অনুসরণ করেই তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যস্ত। একভাবে চলা, কথা বলা, রাস্তা পারাপার করা, প্রত্যেকেই যেন একই জায়গা থেকে এই কৌশল শিখে এসেছে।

শহরের মধ্যিখান দিয়ে নরম সিল্কের মত চওড়া পিচরাস্তা। দু'পাশে বিশাল বিশাল অট্টালিকা আকাশের গায়ে মিলিয়ে গিয়েছে। বাঁপাশের ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে লক্ষ করলাম সুসজ্জিত কৃত্রিম বাগান আর তাতে স্প্রিংকলার বাথ। গরমকালে ছোট থেকে বড় সব্বাই এই স্থানে নিজের ক্লান্তি দূর করতে পারে। ম্যাসাচুসেটস-এর রাজধানী বস্টন শহরের ডাউনটাউন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে গেলাম মহাসাগরের তীরে। স্টেল ওয়াগন ন্যাশনাল মেরিন স্যাংচুয়ারিতে। সামনেই টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। টিকিট কাউন্টারের মাথার উপর হাম্পব্যাক হোয়েলের স্ট্যাচু বসানো আছে। তার নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'নিউ ইংল্যান্ড অ্যাকোরিয়াম'। ভিড় সামলে দু'টো টিকিট পেয়ে গেলাম। তারপর ক্রুজের দিকে এগিয়ে চললাম। কাঠের পাটাতনের দু'পাশে মোটা শক্ত রেলিং দিয়ে ব্রিজের মতো বানানো হয়েছে। সেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সোজা ক্রুজের দরজায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা পাটাতন ধরে হাঁটা শুরু করেছি, ঠিক সেখানেই একটা লোক ভায়োলিন বাজাচ্ছিলেন। লক্ষ করলাম, এখান দিয়ে যে-ই যাচ্ছে, তাকে তার দেশ জিজ্ঞেস



হোয়েল ওয়াচিং ক্যাটামেরন


ফ্লিপার স্ল্যাপিং


প্যাট্রলিং বোট

করে সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাচ্ছেন সেই মিউজ়িশিয়ান। আমরা যেতেই শুরু— ‘জন, গণ, মন, অধিনায়ক জয় হে...’। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।
ক্রুজ়ে ওঠার আগে ছবি তুলছি, এমন সময় নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি আটলান্টিকের নীল জলে জ্বলজ্বল করছে গোলাপি রঙের একটা জেলি ফিশ। মনে হচ্ছে যেন ওর সারা গায়ে আলো জ্বলছে।
আমরা আমাদের ক্যাটামেরনে প্রবেশ করলাম। নীল কার্পেটি আমাদের একটা কাচের দরজার সামনে নিয়ে গেল। দরজা খুলতেই ভিতরে খাবার আর পানীয় দ্রব্যের কাউন্টার। তাকে ঘিরে রয়েছে নীল গদির চেয়ার। রাজকীয় পরিবেশ। ভিতরে ঢুকতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, মেরিন বায়োলজিস্ট মাইক ব্রাউনের। মাইক আমাদের একটা জিনিস দেখাল, বেলিন। তিমি মাছের হাড়। রিসার্চের কাজের জন্য হাতে নিয়ে বসে আছে! সাইরেন বাজিয়ে ক্যাটামেরন ছেড়ে দিল। আটলান্টিক মহসাগরের নীল জলে সে ভাসতে ভাসতে চলল। বস্টন শহর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন সাড়ে দশটা বাজে। এত বেলাতেও তাকিয়ে দেখলাম দূরে নীল জলের ওপারে লাইট হাউস কুয়াশায় ঢেকে গেল। ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। মহাসাগরের বুকে সিগালগুলো লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। যেদিকেই তাকাই, শুধু রাশি রাশি নীল জলের হাতছানি। কিছুক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নীচে গেলাম। কাচের ঘরে নীল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। অনেকে কাউন্টার থেকে পাস্তা, পিৎজ়া, কফি নয়তো কোল্ড ড্রিংকস খেতে ব্যস্ত।
মাইকের হাতে এবার অন্য একটা জিনিস। তারের সঙ্গে মাইক্রোফোনের মতো লাগানো কোনও যন্ত্র হবে। মাইক বলল, এটা শোনার যন্ত্র। হাইড্রোফোন। জলে ডুবিয়ে তিমি মাছের আওয়াজ শোনা যায়। অনেকে বলে তিমি মাছের গান রেকর্ডিং করা হয় এই যন্ত্র দিয়ে।
আবার ডেকে এলাম। অস্থির অবস্থা। বারবার উপর-নিচ করছি। হঠাৎ মাইকে করে মাইক কিছু বলে উঠল। ভাল করে শুনলাম, ও বলছে, “Look at the horizon, the whale spout is there”। আমি সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি বেয়ে ডেকে পৌঁছে গেলাম। ছোট-বড় যে যেখানেই ছিল হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। উত্তেজনা আমাদের বোটের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ল।
বড় বড় চোখে দেখি জলের উপর তিনটে জায়গায় ফোয়ারার মতো জলটা উপর দিকে উঠছে। ঠিক যেন জলের তুবড়ি। খানিকক্ষণ পরপরই এমনটা হতে লাগল। জলের মধ্যে থেকে ফোয়ারাগুলো উপরে ওঠে, আবার থেমে যায়। ওইদিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছি, ঠিক তখনই জলের তলা থেকে বেরিয়ে এল এক বিশাল আকৃতির প্রাণী। বেরিয়েই কয়েক ফুট উচ্চতায় লাফ দিয়ে আবার জলের মধ্যে

ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই রাশি রাশি জল ঝাপটা দিতে দিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হাম্পব্যাক হোয়েল। সঙ্গে আরও দু'টো রয়েছে। তিনজনের পরিবার মনে হল। মা ও সন্তান। মাইকের মাইক বলল, ওদের নাম মণ্ডল, ট্রাইপড আর কর্নফ্লাস্ক। এই সময় তিমি মাছেরা মাইগ্রেট করে নর্থ আটলান্টিকে। ঠান্ডায় চলে যায় গাল্ফ অফ মেক্সিকোতে। সেখানেই ওরা সন্তানধারণ করে। আমরা ওদের থেকে খানিক দূরত্ব রেখে চললাম। ওরা তিনজন জলের মধ্যে দিয়ে চলেছে। শুধু কালো কুচকুচে পিঠটুকু বেরিয়ে আছে জলের উপর। মাঝেমধ্যে আবার লেজখানাকে উপরে তুলে ছপাৎ-ছপাৎ করে এগিয়ে চলেছে জলের মধ্যে দিয়ে। একে টেল স্ল্যাপিং বলে। ঠিক একই সময় দেখলাম, একঝাঁক গ্যানেট পাখি ঝপাং-ঝপাং করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে মাছ ধরেই উড়ে যাচ্ছে। ওরা সংখ্যায় অনেক। আর প্রত্যেকেই একসঙ্গে এসে শিকার ধরে খাচ্ছে। একে কমিউনিটি ফিডিং বলে। তিমি মাছেরা তাদের আহারার্থে এই জায়গাতেই অন্যান্য ছোট মাছেদের ঘিরে ফেলেছে। আর সেখানেই এদের বাজিমাত। ঠিক যেন বাঘ আর ফেউ। তিমি মাছেদের সুরক্ষার জন্য রেঞ্জার সাহেবের প্যাট্রলিং বোট আশেপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে ওরাও বেশ খানিকটা দূরত্বেই রয়েছে। তিমিগুলো আগে আগে চলেছে, আমরা ঠিক যেন ওদের পিছু নিয়েছি। এখানে নানান প্রজাতির তিমি পাওয়া যায়। এর মধ্যে হাম্পব্যাক হোয়েল, মিঙ্ক হোয়েল আর গ্রে হোয়েল উল্লেখযোগ্য। শেষের দু'টি তুলনায় বিরল, তবে এখানে এলে হাম্পব্যাক হোয়েলের সাইটিং নিশ্চিত। কালকেই এখানে বারোটা ডলফিনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। আটলান্টিক হোয়াইট সাইডেড ডলফিন। মাঝেমধ্যে নাকি ব্লু শার্কও দেখতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের ভাগ্যে সেই শিঁকেটি ছিঁড়ল না। এই মুহূর্তটা যেন দাঁড়িয়ে গিয়েছে খানিকক্ষণের জন্য। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির হয়ে তাকিয়ে আছি মহাসাগরের বিশালত্বের দিকে। আর সেই পথেই তিমি মাছগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই থেকে ফ্লাইটে বস্টন লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ক্যাবে ডাউনটাউন বস্টন। আশেপাশে প্রচুর ডক পাবেন, যেখান থেকে এই ধরনের ক্রুজ় ছাড়ে।

কখন যাবেন

গরমকাল, অর্থাৎ জুলাই এবং অগস্ট মাস জুড়ে এই ধরনের ক্রুজ়ের প্রচুর অপশন পাবেন। কিছু কিছু ক্রুজ় মে থেকে প্রায় অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলে। তবে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতের জন্য সব বন্ধ থাকে এখানে।

কী কী নেবেন?

সানস্ক্রিন, সানব্লক অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেকসময় ঠান্ডা লাগে। তাই হালকা জ্যাকেটও সঙ্গে রাখলে ভাল। ক্যামেরা তো নেবেনই, তবে ভাল ভিউ পেতে বাইনোকুলারও রাখতে পারেন।



টেল স্ল্যাপিং

দমদার দমপোখ্ত

মাছ, মাংস, ডিম, চাল, তেল-মশলার আলিঙ্গনে, দমের উষ্ণতায় স্বাদ বাড়বে সকলের! চিংড়ি ফুলুরি পোলাও থেকে দম মুর্গ মুসল্লম... দমপোখ্ত রান্নার নানা পদে উৎসবের এলাহি ভোজের আয়োজন করলেন ফুড কলামনিস্ট দেবারতি রায়। কবজি ডুবোলেন সায়নী দাশশর্মা।



দম-কা-গোশ্ত

ঢিমে আঁচে গা সেঁকছে লাল শালু জড়ানো পেল্লাই মাপের হাঁড়ি, তার গলা পর্যন্ত ভরা সুগন্ধি চাল, মশলায় মাখামাখি মাংস, আলু, হাঁড়ির মুখ শক্ত করে আঁটা ময়দার লেচি দিয়ে... না, বিরিয়ানি এই প্রতিবেদনের কেন্দ্রচরিত্র নয় ঠিকই, তবে 'দমপোখ্‌ত'-এর নাম শুনলে সিংহভাগ লোকের মনেই যে সবার আগে এই ছবিটা ভেসে উঠবে, তা নিয়েও বিতর্ক থাকার কথা নয়। আসলে, যে পদের সূত্র ধরে দমপোখ্‌তের আবিষ্কার, গোটা রন্ধনপ্রণালীটিই আজ তার নামের সমার্থক হয়ে উঠেছে। তবে দমপোখ্‌তের ইতিহাস কোনওভাবেই বিরিয়ানিতে সীমিত নয়। শোনা যায়, পারস্যে যখন প্রথম দম দিয়ে রাঁধার প্রচলন হয়, সে সময় মূলত সবজি এবং মাংসই মশলায় মাখিয়ে হাঁড়িতে রেখে ময়দার লেচি দিয়ে ঢাকনা আটকে দম দেওয়া হত। প্রায় ৪০০ বছর আগে যখন পারস্য থেকে এদেশে এসে পৌঁছয় দমপোখ্‌ত, তখনও তাতে ভাত বা চাল ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আঠেরো শতকের মাঝামাঝি, যখন অবিভক্ত ভারত নবাব আসাফ-উদ-দৌলার শাসনাধীন, সেই প্রথম সবজি-মাংসের চেনা সমীকরণে প্রবেশ ঘটে চালের। রাজ্যকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে মাংস, সবজি, ভাত একসঙ্গে মিশিয়ে অভিনব ওয়ান-ডিশ মিলের বন্দোবস্ত করেন তিনি। ধীরে ধীরে অওয়ধ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এই পদ এবং সেইসঙ্গে দমপোখ্‌ত রান্নার জনপ্রিয়তা। চিরাচরিত রান্নার সঙ্গে এর মূল পার্থক্য সেদ্ধ করার ধরনে। মাংস বা সবজি মশলার সঙ্গে পুরোপুরি সেদ্ধ করার পরিবর্তে, প্রথমে তা হালকা কষিয়ে (ভুনাও) তারপর ঢিমে আঁচে এয়ারসিলড পাত্রে 'দম'দেওয়া হয়। এতে মশলার স্বাদ, গন্ধও অটুট থাকে এবং সবজি-মাংসও রসালো থাকে। তাছাড়া ঢিমে আঁচে রান্না করার কারণে উপকরণের পুষ্টিগুণও হারিয়ে যায় না। ফলে কবজি ডুবিয়ে খেলেও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা তুলনায় কম। বিরিয়ানি তো বটেই, সেই সঙ্গে একাধিক ডাল, কোর্মা, নিহারি, মুসল্লম, এমনকী রানও দমপোখ্‌ত রান্নার অন্তর্গত। আবার নিজস্ব চিন্তাভাবনা কাজে লাগালে, চেনা মাছ-মাংসের পদেও দমপোখ্‌তের স্বাদ আনা সম্ভব। উৎসবের রসনাবিলাসের জন্য সেরকমই কিছু পদ বেছে নিলাম আমরা। মাছ, মাংস, পোলাও থেকে ডিম... দমের সুবাসে জমে উঠুক পুজোর খাওয়াদাওয়া।

দম-কা-গোশ্‌ত

উপকরণ: মাটন ৫০০গ্রাম, পেঁয়াজ ২টো (কুচনো), আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, গোটা রসুন ১টা, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতা ২ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩টে, সর্ষের তেল ১ কাপ, আটার ডো খানিকটা।

প্রণালী: মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। একটা বাটিতে পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুনবাটা, গুঁড়ো মশলা, নুন, ২টো শুকনোলঙ্কা, ধনেপাতার ডাঁটি, গোটা রসুন, সর্ষের তেল



ইলিশ দমপোখ্‌ত

চিরাচরিত রান্নার প্রণালীর সঙ্গে এর মূল পার্থক্য সেদ্ধ করার ধরনে। মাংস বা সবজি মশলার সঙ্গে পুরোপুরি সেদ্ধ করার পরিবর্তে, প্রথমে তা হালকা কষিয়ে (ভুনাও) তারপর ঢিমে আঁচে এয়ারসিলড পাত্রে 'দম'দেওয়া হয়।

দিয়ে মাংস মেখে আধঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। প্যানে সর্ষের তেল গরম করে তেজপাতা, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, গোলমরিচ, দারচিনি ফোড়ন দিন। এবার গ্যাস বন্ধ করে তেলটা ঠান্ডা করে নিন। অর্ধেক তেল মাংসের মধ্যে মাখিয়ে নিন। ডেকচিতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। ম্যারিনেট করা মাংস দিন। নাড়াচাড়া করে এককাপ গরম জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। ঢাকনা আটার ডো দিয়ে সিল করে নিন। ৪৫-৫০ মিনিট দমে রেখে সিল খুলে নাড়াচাড়া করে আরও ১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে পরিবেশন করুন।

ইলিশ দমপোখ্‌ত

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৪ পিস, কাজু ১ চা-চামচ, পোস্ত ১ চা-চামচ, সর্ষে ১ চা-চামচ, কিশমিশবাটা ১ চা-চামচ, দুধ ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৩টে, সর্ষের তেল ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: ইলিশমাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে ১০মিনিট রাখুন। কাজু, পোস্ত, সর্ষে, নুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেটে নিন। মাছের মধ্যে বাটা মশলা, নুন, কিশমিশবাটা, চেরা কাঁচালঙ্কা মাখিয়ে আধঘণ্টা রাখুন। কড়াইতে মাছের মিশ্রণটা দিয়ে, দুধ দিয়ে ঢিমে আঁচে ঢাকা দিয়ে দম দিন। উপরে ভারী কিছু রাখুন, যাতে ভিতরে প্রেশার তৈরি হয়। ১৫ মিনিট পর ঢাকা খুলে মাছ উল্টে দিন। প্রয়োজনে সামান্য গরম জল দিতে পারেন। এবার আরও মিনিটপাঁচেক ঢাকা দিয়ে রাখুন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পনির স্টাফড আলুর দমপোখ্‌ত

উপকরণ: আলু ১০-১২টা (মাঝারি মাপের), পনির ২০০ গ্রাম, কাজুবাদাম ১০টা, কিশমিশ ১০টা, আদা ১ ইঞ্চি, চারমগজ ২ টেবলচামচ, গোটা গরমমশলা ১ চা-চামচ, ভাজা মশলা ১ চা-চামচ (ধনে, জিরে, ছোট এলাচ, জায়ফল, জয়িত্রী শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা), হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, তেজপাতা ১টা, গোটা জিরে ১/৪ চা-চামচ, হিং ১/৪ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ মুঠো।

প্রণালী: আলুর খোসা ছাড়িয়ে দু' টুকরো করে কেটে নিন। এবার স্কুপ করে গর্ত করে নিন। স্কুপ করা অংশগুলো আলাদা করে রাখুন। গর্ত করা আলুগুলো ধুয়ে নুন, হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে অল্প তেলে সাঁতলে নিন। স্কুপ করা অংশগুলোও আলাদা করে ভেজে ম্যাশ করে নিন। পনির ১ চা-চামচ ঘি দিয়ে মেখে ভেজে নিন। এতে ম্যাশ করা আলু দিন। নুন, চিনি, ভাজা মশলা এবং অল্প কাজু-কিশমিশ কুচিয়ে দিন ওতে। ভেজে রাখা আলুর মধ্যে এই পুর ভরুন। টোম্যাটো, আদা, কাজু, চারমগজ, শুকনোলঙ্কা গরম জলে খনিকক্ষণ ডুবিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে জিরে, তেজপাতা, হিং, গোটা গরমমশলা, কাজু, টোম্যাটোবাটা, নুন, চিনি, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নিন। পরিমাণমতো জল দিয়ে পুর ভরা আলুগুলো দিন। ১০ মিনিট ঢিমে আঁচে দম দিন। ঢাকা খুলে



পনির স্টাফড আলুর দমপোখ্‌ত



পুরভরা দম পমফ্রেট

গরমমশলাগুঁড়ো ও ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

পুরভরা দম পমফ্রেট

উপকরণ: পমফ্রেট মাছ ৩টে, পাতিলেবুর রস ১ চা-চামচ, ধনেপাতার চাটনি ১ চা-চামচ, গোটা ধনে ১ চা-চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কা ২টো, নারকেলকোরা ২ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, বেসন ১ টেবলচামচ, টক দই $^{1}/_{2}$ কাপ, সর্ষে $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, কারিপাতা কয়েকটা, মাখন ১ টেবলচামচ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: মাছগুলোর ভিতর থেকে সাবধানে কাঁটা বের করে, ধুয়ে নুন-লেবুর রস মাখিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। শুকনো তাওয়ায় গোটা জিরে, ধনে ও ১টা শুকনোলঙ্কা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে গুঁড়ো করে নিন। নারকেলকোরা, ধনেপাতার চাটনি ও এই গুঁড়ো মশলা মিশিয়ে নিন একসঙ্গে। মাছের ভিতর অল্প করে এই স্টাফিং ভরে দিন। একটা বাটিতে বেসন, নুন, তেল মিশিয়ে অল্প জল দিয়ে গুলে নিন। মাছগুলো এই ব্যাটারে মাখিয়ে নিন। প্যানে ১ চা-চামচ মাখন দিয়ে মাছগুলো এপিঠ-ওপিঠ করে হালকা ভেজে তুলে নিন। একটা বাটিতে টক দই ফেটিয়ে তাতে বাকি পুরের মশলা মিশিয়ে নিন। প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে সর্ষে, কারিপাতা, শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিন। টক দই-সহ মশলা অল্প জল দিয়ে গুলে কড়াইতে দিন। মাছগুলো দিয়ে, ঢাকা দিয়ে দমে রাখুন ১০-১৫ মিনিট। তৈরি পুরভরা দম পমফ্রেট।

দম মুর্গ মুসল্লম

উপকরণ: ছাল ছাড়ানো গোটা চিকেন ১টা (১ কেজি ওজনের),



দম মুর্গ মুসল্লম


হাঁসের ডিমের দমপোখ্ত

নুন ১ চা-চামচ, ভিনিগার ২ টেবলচামচ। **ম্যারিনেট করার জন্য:** টক দই ২ টেবলচামচ, আদা-রসুনবাটা ২ টেবলচামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পাতিলেবুর রস ১ টেবলচামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কমলা বা লাল ফুড কালার ১ ফোঁটা, কেওড়ার জল ১ চা-চামচ। **স্টাফিং-এর জন্য:** পেঁয়াজ ১টা (কুচনো), আদা-রসুনবাটা ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচনো), চিকেন কিমা ১০০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, সেদ্ধ ডিম ১টা। **গ্রেভির জন্য:** কাজুবাদাম ১০টা, আমন্ড ১০টা, পোস্ত ১ চা-চামচ, লবঙ্গ ২টো, এলাচ ২টো, স্টার অ্যানিস $^1/_4$টা, জৈত্রী অল্প, গোটা গোলমরিচ ১০টা, টক দই ২ টেবলচামচ, ধনেপাতাকুচি ১ মুঠো, পেঁয়াজ ২টো (কুচনো), টোম্যাটো ২টো (বাটা), কেশর ১ চিমটে, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কেওড়ার জল ১ চা-চামচ, তেল ও মাখন পরিমাণমতো।

প্রণালী: চিকেন পরিষ্কার করে গায়ে ছুরি দিয়ে কিছু চেরা দিন। নুন, ভিনিগার দিয়ে ১০-১৫ মিনিট মাখিয়ে রাখুন চিকেনটা। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ম্যারিনেট করার সব মশলা একসঙ্গে মিশিয়ে চিকেনের গায়ে মাখিয়ে ৫-৬ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিন। স্টাফিং বানাতে তেলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে চিকেন কিমা ও স্টাফিং-এর বাকি সব মশলা দিন। সেদ্ধ ডিম দিয়ে কষিয়ে নামিয়ে নিন। একটু ঠান্ডা হলে তৈরি করা স্টাফিং চিকেনের মধ্যে ভরে দিন। প্যানে তেল ও মাখন দিয়ে চিকেন ভাল করে ভেজে নিন। এবার গ্রেভির জন্য বাদাম, পোস্ত, গোটা মশলা ও দুধ একসঙ্গে বেটে নিন। তেলে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুনবাটা, টোম্যাটোবাটা, গুঁড়ো মশলা ও বাদামবাটার মিশ্রণ দিয়ে কম আঁচে কষতে থাকুন। একটু তেল ছাড়লে ভাজা চিকেন দিয়ে মশলার সঙ্গে নেড়েচেড়ে নিন। অল্প অল্প করে গরম জল মেশান এই সময়। এক চিমটি কেশর ও এক মুঠো ধনেপাতা কুচি দিন। এরপর ঢাকা দিয়ে চারিদিক দিয়ে আটার ডো দিয়ে সিল করে ৩০ মিনিট দম দিন। আধঘণ্টা পর আঁচ বন্ধ করে কেওড়ার জল ছড়িয়ে ১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। নামিয়ে পরিবেশন করুন পরোটার সঙ্গে।

হাঁসের ডিমের দমপোখ্ত

উপকরণ: হাঁসের ডিম ৬টা, টক দই ২ টেবলচামচ, মিষ্টি দই ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ১টা (কুচনো), পেঁয়াজবাটা ১ টেবলচামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাজুবাদামবাটা ২ চা-চামচ, কিশমিশ ১০-১২টা, গোলমরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: হাঁসের ডিম সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। ডিমের গা ছুরি দিয়ে হালকা করে চিরে নিন। কড়াইতে তেল ও ঘি গরম করে পেঁয়াজকুচি দিয়ে লাল করে ভেজে নিন। এবার ডিম ও বাটা মশলা

দিয়ে কষিয়ে নিন। সামান্য জল দিন। এবার দই ও কাজুবাদামের মিশ্রণ দিন কড়াইতে। দমে রেখে দিন ৬-৭ মিনিট মতো। সব উপকরণ ভালভাবে মিশে মাখামাখা হলে গোলমরিচগুঁড়ো ও গরমমশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে নামান।

চিংড়ি ফুলুরি পোলাও

উপকরণ: বাসমতি চাল ১ কাপ, চিংড়ি ২০০ গ্রাম, বেসন ১ কাপ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, জোয়ান ১/২ চা-চামচ, পেঁয়াজ ১টা (কুচনো), নুন-চিনি স্বাদমতো, বেকিং পাউডার ১/৪ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো, দুধ ১/২ কাপ, ঘি ২ চা-চামচ, গন্ধরাজ লেবু ১টা, গন্ধরাজ লেবুর পাতা ২টো।

প্রণালী: বাসমতি চাল ধুয়ে পরিষ্কার করে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। চিংড়ি ধুয়ে নুন, গন্ধরাজ লেবুর রস মাখিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। একটা বাটিতে আদাকুচি ও বাকি গুঁড়ো মশলা অল্প অল্প করে নিয়ে মিশিয়ে নিন। কড়াইতে তেল ও ঘি গরম করে পেঁয়াজকুচি ভেজে তুলে নিন। এবার ওতে আদা ও গুড়ো মশলার মিশ্রণটা ঢেলে দিন। খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে চিংড়ি দিন। নেড়েচেড়ে চালটা দিয়ে দিন। অন্যদিকে বেসনের মধ্যে নুন, বাকি হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো এবং বেকিং পাউডার মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে ফেটানোর পর কড়াইতে তেল গরম করে ফুলুরির মতো করে ব্যাটার দিয়ে ভেজে তুলে নিন। ভাতের মিশ্রণে এই ফুলুরিগুলো দিন। দেড়কাপ জল ও আধকাপ দুধ দিয়ে দিন। গন্ধরাজ লেবুর পাতা, কুরনো লেবুর খোসা ও কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে কম আঁচে ১৫-২০ মিনিট দমে বসান। পাতাগুলো সরিয়ে পরিবেশন করুন।


চিংড়ি ফুলুরি পোলাও

কাতলামাছের দমপোখ্‌ত

উপকরণ: কাতলামাছ ৪ পিস, নারকেলবাটা ২ চা-চামচ, সাদা তিলবাটা ১ চা-চামচ, রসুনের আচার ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদার রস ১ চা-চামচ, রসুনের রস ১ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। মাছের গায়ে আদার রস, রসুনের রস, নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে নিন। ওই তেলে মেথি, মৌরি, শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিয়ে নারকেলবাটা, সাদা তিলবাটা দিয়ে কম আঁচে নাড়াচাড়া করে হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ফেটানো টকদই দিন। ঢিমে আঁচে নাড়াচাড়া করে রসুনের আচার দিয়ে আবারও কষিয়ে নিয়ে পরিমাণমতো জল দিন। মাছগুলো দিয়ে দমে রেখে দিন ১০ মিনিট। উপর থেকে চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে পরিবেশন করে দিন।

দমপোখ্‌তের এমন এলাহি আয়োজন থাকলে উৎসবের ভূরিভোজ দমদার হতে বাধ্য!

যোগাযোগ: ৯৪৩২৩৭০৩৫৭

ছবি: শুভেন্দু চাকী


কাতলা মাছের দমপোখ্‌ত



Dare to Wear

কনজ়ারভেটিভ ফ্যাশনিস্তারা বলবেন ‘ফো পা’! কিন্তু ফ্যাশনের সত্যিই কি কোনও রুলবুক হয়? আমরা তো মানতে নারাজ। প্রমাণস্বরূপ তাই সাজিয়ে দিলাম এই ফ্যাশনফাইল, সব ‘নিষেধ’ উপেক্ষা করে...



ডেটাইম লুকে বোল্ড প্রিন্ট ঠিক আছে, তাই বলে আপার-বটম দু'ক্ষেত্রেই? মন্দ কী? পার্পল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড কো-অর্ড বরং ভিড়ে স্ট্যান্ড আউট করবে আপনাকে।

পোশাক: সাস্যা
ফোন: ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩

দিনের বেলা ভেলভেট, তাও উজ্জ্বলরঙা, দেখলে ভ্রুকুটিকুঞ্চন হবে অনেকেরই। তবে অ্যাকসেসরিজ় একটু হালকা থাকলে সকালের সাজেও সকলকে তাক লাগাতে পারেন ভেলভেটের পোশাকে। (বাঁদিকের পাতা)

পোশাক: ইমেজে এন স্টাইল, গড়িয়াহাট
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪



রাতের সাজে ভিন্টেজ ড্রেসের উপর ভরসা করতে পারছেন না? একটু অন্যভাবে স্টাইলিং করুন। সঠিক হেয়ারস্টাইল, মেক-আপ আর অ্যাকসেসরাইজ়েশন ইজ় ইওর ওয়ে টু গো। রেফারেন্স তো রইলই!

সাদা টপ ও প্যান্টস: সাস্যা
লাল ড্রেস: নীল সাহা



বোল্ড প্রিন্টেড কো-অর্ড সেট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারি করার আর-একটি উপায় হল একটু হালকা বেস রং বাছা। প্রিন্ট জমকালো হলেও মন্দ হবে না!

পোশাক: সাস্যা





পার্টিওয়্যার হিসেবে হয়তো ডেনিমের নাম সবার শেষে আসবে। সিকুইন দেওয়া কাট-আউট শার্ট-ট্রাউজ়ার্স সেট বা পেপি বুস্তিয়ের থাকলে অবশ্য অন্য কথা! (বাঁদিকের পাতা)

ডেনিম শার্ট ও হট প্যান্টস: ইমেজ এন স্টাইল
ডেনিম টপ ও প্যান্টস: সাস্যা

হলুদ ভিন্টেজ শর্ট ড্রেস। দিনে যতটা নজরকাড়া, রাতে ততটাই সিম্পল। হোক না! স্টেটমেন্ট হিলস আর হ্যান্ডব্যাগের সঙ্গ নিলে গ্ল্যামারাস হতে কতক্ষণ?

পোশাক: সাস্যা
ব্যাগ: ইমেজ এন স্টাইল



কর্পোরেট ওয়্যার মাত্রেই একরঙা, প্রিন্টবিহীন মোনোটনাস পোশাক? ব্ল্যাক ওভারঅলের উপর অ্যানিমাল প্রিন্টেড লং শার্ট পরে দেখুন। বোর্ড মিটিংয়ে সক্কলে ইম্প্রেসড হবেন।

অ্যানিমল প্রিন্ট ব্লেজ়ার:
ইমেজ এন স্টাইল



শিয়ার ড্রেসিংয়ের রুলবুকে শিয়ার অন শিয়ার রীতিমতো কার্ডিনাল সিন। সাহসী হতে আপত্তি না থাকলে নির্দ্বিধায় বেছে নিন। দিনে-রাতে সবসময়ই এর আবেদন অনন্য, অনুপম।

পোশাক: সাস্যা

পরিকল্পনা: সায়নী দাশশর্মা
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার
রূপায়ণে: পিয়ালী বালা

মডেল: স্নেহা, ডিম্পল, কোয়েল
মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
স্টাইলিং: নীল সাহা
ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
লোকেশন: ইকো হাব, ইকো স্পেস বিজ়নেস পার্ক, নিউটাউন, কলকাতা
ছবি: শিলাদিত্য দত্ত

এই ফ্যাশনের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি।



চায় অ্যান্ড হেজ়েলনাট ম্যাকারুন

ফ্রম ফ্রান্স, উইথ লাভ...

ভারতে ফরাসি বেকিংয়ের অন্যতম জনপ্রিয় নাম পূজা ধিংড়া। কলকাতায় এসে 'ম্যাকারুন লেডি' জানালেন তাঁর ফুড জার্নির কথা। দিলেন ফ্রেঞ্চ কুইজ়িনের চারটে বেকড রেসিপিও। মুখোমুখি মধুরিমা সিংহ রায়।

''আমাকে কতজন যে বলেছেন কলকাতায় কেন আউটলেট খুলছি না! আসলে কলকাতার মানুষ মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন আর আমিও ডেসার্ট, পেস্ট্রি নিয়ে কাজ করতে ভালবাসি। তাই বোধহয় কোথাও একটা কানেকশন রয়েছে... এখনও অবধি সেভাবে বাঙালি খাবারের প্রভাব আমার রান্নায় পড়েনি। তবে বাঙালি রান্না নিয়ে এক্সপ্লোর করছি নিয়ত। কী ধরনের উপকরণ দেওয়া হয়, রান্নার স্পেশ্যালিটি কী ইত্যাদি। হয়তো বাঙালি রান্না থেকে ইন্সপায়ারড হয়ে কোনও ডেসার্ট বানাতেও দেখবেন শীঘ্রই,'' কলকাতায় শেফ উর্বিকা কানোইয়ের আয়োজনে এক পপ-আপে অংশ নিতে এসে প্রথমেই এ কথা জানালেন পেস্ট্রি শেফ পূজা ধিংড়া। ভারতে পেস্ট্রি শেফদের মধ্যে একদম প্রথম সারিতে থাকবেন পূজা। খুব কম বয়সেই খুলে ফেলেছিলেন নিজের রেস্তরাঁ। লিখেছেন একাধিক বইও। অনুরাগীরা তাঁকে 'ম্যাকারুন লেডি' বলেও সম্বোধন করেন। ফরাসি কুইজ়িন বিশেষত বেকিংয়ের প্রতি পূজার ভালবাসা বরাবরের। ''২১ বছর বয়সে পেস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করতে ফ্রান্স যাই। তার আগে অবধি আমেরিকান স্টাইল অফ বেকিংয়েই অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু প্যারিসে গিয়ে জীবনটাই বদলে গেল! পেস্ট্রি শপে কাজ করতে করতে দেখলাম এক একজন শেফ এক একজন শিল্পী যেন! ম্যাকারুন, পেস্ট্রির যাবতীয় অনুপ্রেরণা ওই সময় থেকেই পাওয়া। আর প্যারিস শহরটারও প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট ছিল না তখন। বরং, অনেক বেশি মুখোমুখি আলাপচারিতা হত মানুষের সঙ্গে। আমি যে কালিনারি স্কুলে পড়াশোনা করতাম, সেখানে ৬০টি আলাদা দেশের মানুষ ছিলেন! পেস্ট্রি নিয়ে, খাবার নিয়ে কত কথা বলতাম


পূজা ধিংড়া

''যখন দেশে ফিরি, বেশি কেউ ম্যাকারুন সম্পর্কে জানতেন না। যদি দশজনের সঙ্গেও দেখা হত ওঁদের বলতাম ম্যাকারুনের ব্যাপারে। তারপর পরিস্থিতি বদলাল। আমি ফ্রেঞ্চ টেকনিকের সঙ্গে ভারতীয় ফ্লেভার মেশাতে চেয়েছি।''



ফিগ অ্যান্ড গ্রিক ইয়োগার্ট গ্যালেত

ওঁদের সঙ্গে,'' বললেন তিনি। ফেরার পরে ভারতে ফ্রেঞ্চ কুইজ়িন নিয়েই কাজ করবেন এটা মোটামুটি নিশ্চিত করে ফেলেন পূজা। ''যখন দেশে ফিরি, খুব একটা বেশি কেউ ম্যাকারুন সম্পর্কে জানতেন না। যদি দশজনের সঙ্গেও দেখা হত ওঁদের বলতাম ম্যাকারুনের ব্যাপারে। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাল। আমি সবসময় ফ্রেঞ্চ টেকনিকের সঙ্গে ভারতীয় ফ্লেভার মেশাতে চেয়েছি। জাপানিজ় শেফ, ওঁদের সংস্কৃতিও আমাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন ম্যাকারুনের সঙ্গে মসালা চায়ের ফ্লেভার ধরুন,'' বললেন তিনি। পেস্ট্রি শেফ হিসেবে ম্যাকারুন তৈরি করা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং তাঁর কাছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে তাপমাত্রার সমস্যাও রয়েছে। ''ম্যাকারুনে আমার পছন্দের ফ্লেভার প্যাশন ফ্রুট। আর কেউ পছন্দ করেন না এটি (হাসি)। ভারতীয় ক্রেতাদের মধ্যে দেখেছি ওঁরা ডার্ক চকোলেট, রোজ়, ফ্রেঞ্চ ভ্যানিলা পছন্দ করেন। আর ফ্রেঞ্চ ডেসার্টের মধ্যে ম্যাকারুন বাদে শু (choux) পেস্ট্রি, ম্যাদেলিন, টার্ট আর শীতে বিশেষ করে স্ট্রবেরি সিজ়নে ফ্রেশ ফ্রুট কেক আমার প্রিয়,'' হাসতে হাসতে বললেন পূজা। ২৩ বছর বয়সে মুম্বইতে প্রথম রেস্তরাঁ খোলেন তিনি। বাবা ও ভাই দুজনেই রেস্তরাঁ মালিক। পূজা নিজেও প্যারিসে লা কর্ডন ব্লিউ থেকে পড়াশোনা করেছেন। পূজা ও তাঁর ভাই দু'জনেই এমন পরিবেশে বড় হয়েছেন, যেখানে তাঁদের সমান-সমানভাবেই ট্রিট করা হত। কিন্তু অত কম বয়সে ফুড অন্ত্রপ্রনর বিষয়টা অনেকেই তখন হজম করতে পারেননি বোধহয়। মাত্র দু'জন স্টাফ নিয়ে শুরু করে তাঁর রেস্তরাঁয় ২০১৪ নাগাদ প্রায় ৪২জনকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন পূজা। বাকিটা শুধুই সাফল্যের ইতিহাস। ''বেকিং আসলে আমার কাছে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যম। সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে ম্যাজিক তৈরি করা যায়! যে কোনও ফুড মেমরি আমার মুখে হাসি ফোটায়। যেমন ধরুন, আমার নানি যে পদগুলো বানাতেন, সেগুলোর কথা ভাবলেই আপনা থেকেই

বেকিং বেসিকস

▶ উপকরণগুলো ঠিকভাবে ওজন করে নিন। অন্য রান্নার ক্ষেত্রে আনুমানিক পরিমাণে অসুবিধে হয় না, কিন্তু বেকিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়েইং স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা ভাল।

▶ আপনার আভেন আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড। আপনি যে আভেন ব্যবহার করেন, সেটি কীভাবে কাজ করে তা বোঝা জরুরি। কোথায় হিট পকেট আছে, কোন লেভেলে ট্রে রাখবেন ইত্যাদি বুঝে নিন।

▶আভেনের উপর ও আভেনের ভিতরে দেওয়া প্রডাক্টের নির্ভর করে বেকিং টাইমও আলাদা হয়। কোনও আইটেম পুরো বেকড হয়েছে কিনা তা আপনাকেই বুঝতে হবে। কেক টিন, টার্ট রিং, কাপকেক মোল্ড বা বেকিং ট্রে...প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। লাইনিং বা গ্রিজিং কী দিয়ে করবেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

ছোটবেলায় ফিরে যাই আমি। শীতকালে নানি গাজরের হালুয়া বানাতেন। এখনও সে স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার বই লেখার সময়ও আমি মা-দিদিমাদের থেকে শেখা পদের থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি,'' বলে শেষ করলেন পূজা।

চায় হেজ়েলনাট ম্যাকারুন

(২০টি ম্যাকারুনের জন্য)

উপকরণ: *শেল তৈরির জন্য:* আইসিং সুগার ১০০ গ্রাম, আমন্ড পাউডার ১০০ গ্রাম, ডিমের সাদা অংশ ৭০ গ্রাম, ক্যাস্টর সুগার ৭০ গ্রাম, কোকো পাউডার ১৫ গ্রাম, নুন এক চিমটে। *চায় গানাশ তৈরির জন্য:* হোয়াইট চকোলেট ১৮০ গ্রাম, মাখন ২০ গ্রাম, গুঁড়ো চা ১৫ গ্রাম, চায় মসালা ৫ গ্রাম, ক্রিম ১২০ মিলি।

প্রণালী: আইসিং সুগার, কোকো পাউডার ও আমন্ড পাউডার একটি বড় পাত্রে ছেঁকে নিন। আলাদা একটি পাত্রে ডিমের সাদা অংশ ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে মাঝারি স্পিডে ফেটিয়ে নিন। ফেনা হতে শুরু করলে অল্প অল্প করে ক্যাস্টর সুগার দিন। ফেটাতে থাকুন। ডিমের মিশ্রণটি এবারে আগের শুকনো মিশ্রণের মধ্যে ঢেলে মিশিয়ে নিন। স্প্যাচুলা বা পেস্ট্রি স্ক্র্যাপারের সাহায্যে ততক্ষণ মেশাতে থাকুন যতক্ষণ না পুরো মিশ্রণটি গ্লসি আর মসৃণ হচ্ছে। ৮ বা ১০ মিলিমিটার নজ়লের সাহায্যে পাইপিং ব্যাগ লাইনিং করুন। বেকিং ট্রে-তে সিলিকন শিট দিয়ে লাইনিং করে রাখুন। পুরো ব্যাটারটি পাইপিং ব্যাগে ঢেলে বেকিং ট্রে-তে গোলাকার শেলের আকারে দিন। ৪৫-৬০ মিনিট মতো রেখে দিন যাতে ম্যাকারুনের শেলগুলো শুকনো হয়ে যায়। ১৫০ ডিগ্রিতে ১০ মিনিট মতো আভেন প্রি হিট করে তাতে বেকিং ট্রে দিন। শেলগুলো ১০-১২ মিনিট মতো বেক করুন। এবার চায় গানাশ বানানোর জন্য হোয়াইট চকোলেট কুচিয়ে গলিয়ে নিন। সসপ্যানে ক্রিম, চায়ের গুঁড়ো আর মশলা চা একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন।



মোল্টেন চকোলেট কেক


ম্যাদেলিনস

পুরো মিশ্রণটি ছেঁকে চকোলেটের উপরে ঢালুন। মিনিট দুয়েক রাখুন। সব উপাদান হুইস্কারের সাহায্যে ভাল করে মিশিয়ে নিন। পাত্রটি একটি ক্লিং ফিল্মের সাহায্যে মুড়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রাখুন। ম্যাকারুন শেল বেকড হয়ে গেলে আভেন থেকে বের করে ঠান্ডা করে নিন। পাইপের মধ্যে গানাশ ভরে দু'টি শেলের মাঝে রেখে দিন। সারারাত ফ্রিজে রেখে পরিবেশন করুন।

ফিগ অ্যান্ড গ্রিক ইয়োগার্ট গ্যালেত

(৪-৬ জনের জন্য)

উপকরণ: টার্ট ডো ৯০ গ্রাম, গ্রিক ইয়োগার্ট ৭০ গ্রাম, ব্রাউন সুগার ১০ গ্রাম, মধু ১০ মিলি, ডুমুর ৪টে।

প্রণালী: ১৬৫ ডিগ্রিতে আভেন প্রি হিট করে নিন। পার্চমেন্ট পেপার দিয়ে বেকিং ট্রে-র লাইনিং করে নিন। পরিষ্কার সারফেসে টার্ট ডো রোল (ছড়িয়ে) করে তার মাঝখানে দই দিন। ডুমুর ছোট ছোট টুকরোয় কেটে দইয়ের উপর এমনভাবে রাখুন যাতে গোলাকার বৃত্ত তৈরি হয়। উপর থেকে মধু ঢেলে ডো-এর দু'দিক থেকে ভাঁজ করে মুড়ে নিন। ছ'কোণা শেপের হবে। উপর থেকে ব্রাউন সুগার ছড়িয়ে ২০-২৫ মিনিট মতো বেক করে নিন। বাদামি রং ধরলে বের করে পরিবেশন করুন।

মোল্টেন চকোলেট কেক

(৪টি মাঝারি সাইজ়ের র‍্যামেকিনের জন্য)

উপকরণ: ডার্ক চকোলেট ২০০ গ্রাম, মাখন ২০০ গ্রাম, ক্যাস্টর সুগার ১৫০ গ্রাম, ডিম ৪টে, ময়দা ৬০ গ্রাম।

প্রণালী: মাইক্রোওয়েভে চকোলেট আর মাখন একসঙ্গে গলিয়ে নিন। এতে ক্যাস্টর সুগার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিশ্রণে একটা একটা করে ডিম দিন। প্রতিবার ডিম দেওয়ার পরে ফেটাতে থাকুন। ময়দায় ডিমের মিশ্রণ দিয়ে ফোল্ড করে নিন। পুরো ব্যাটার র‍্যামেকিনের মধ্যে ঢালুন। আভেনে ব্যাটার সমেত র‍্যামেকিনগুলো ২০০ ডিগ্রিতে ৭-৮ মিনিট মতো বেক করে নিন। চারধার কুকিজ়ের মতো শক্ত আর মাঝখানে ফোলাভাব আসবে। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

ম্যাদেলিনস

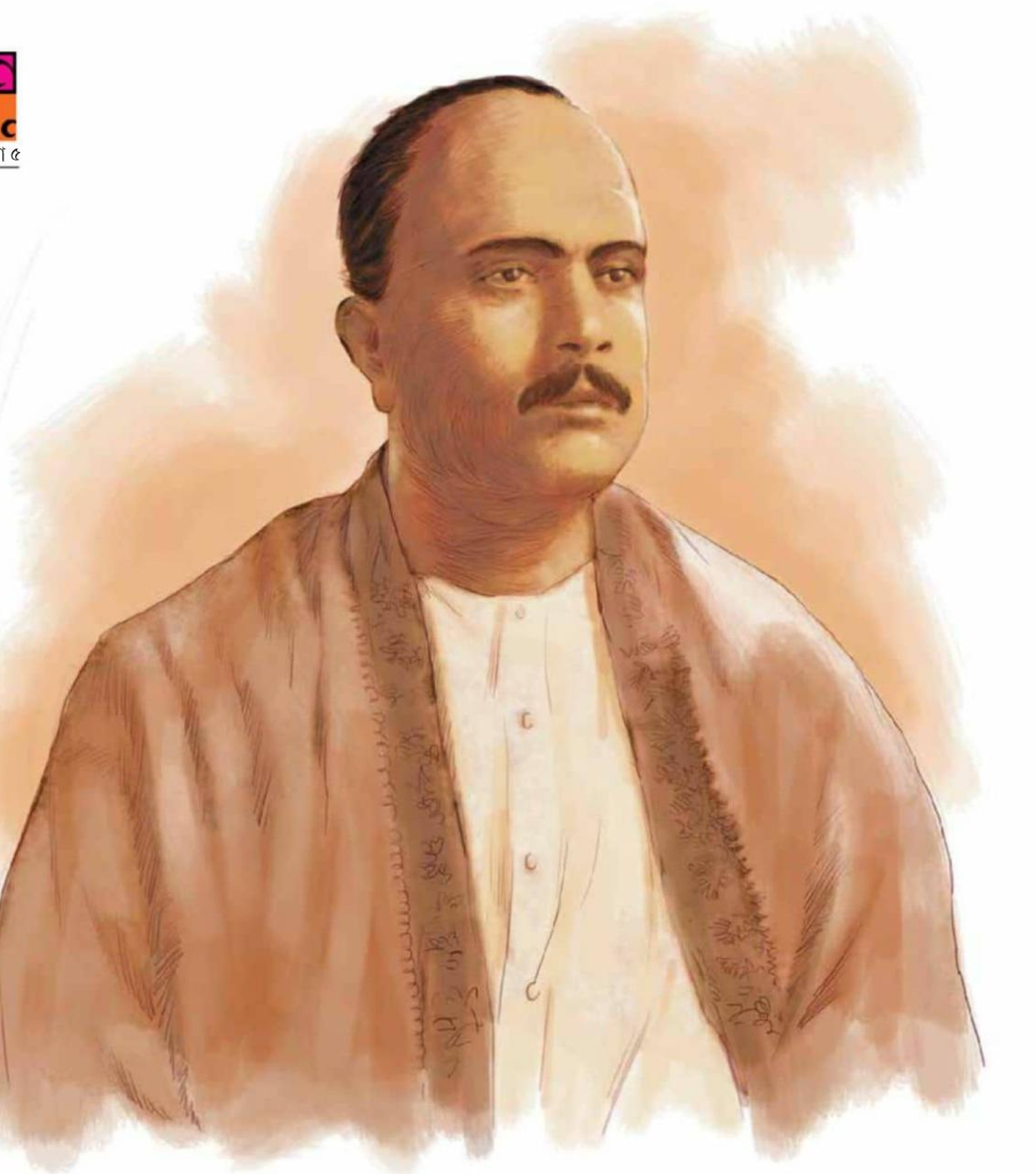
(১৮-২০টা বানানোর জন্য)

উপকরণ: ময়দা ৮০ গ্রাম, চিনি ৭০ গ্রাম, মধু ৩০ মিলি, মাখন ৮০ গ্রাম, তেল ১৫ মিলি, লেবুর রস ১ চা-চামচ, বেকিং পাউডার $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, ডিম ২টো।

প্রণালী: ছোট প্যানে মাঝারি আঁচে মাখন গরম করুন। বাদামি রং ধরলে মাখন ছেঁকে আলাদা করে তুলে রাখুন। একটি আলাদা পাত্রে ডিম ও ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। মিশ্রণে বুদবুদ দেখা দিলে ধীরে ধীরে চিনি মেশান। ফেটাতে থাকুন, যতক্ষণ না চিনি-ডিমের মিশ্রণ পরিমাণে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। একে একে লেবুর রস, মধু



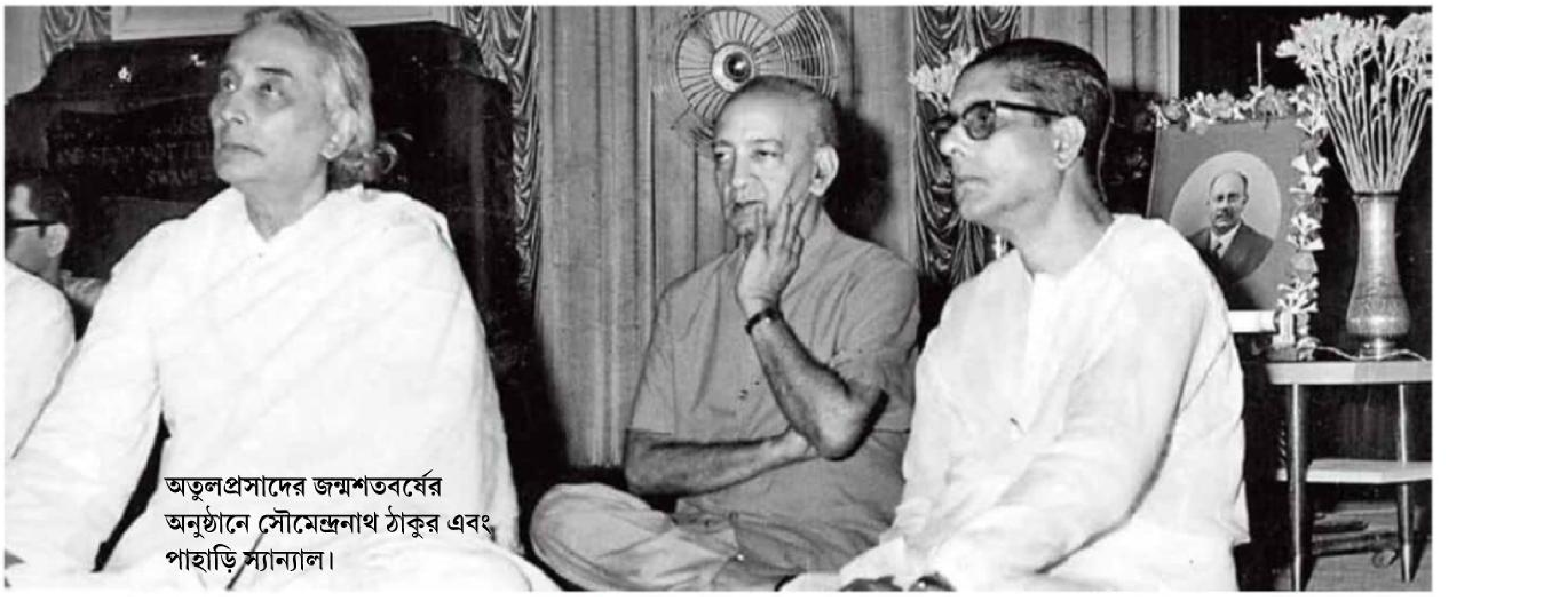
দিন। ফেটাতে থাকুন। এবার ঠান্ডা বাদামি মাখন মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। ময়দা ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে একটি পাত্রে চেলে নিন। ডিমের মিশ্রণের মধ্যে ময়দা-বেকিং পাউডার ফোল্ড করুন। পুরো ব্যাটারকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা হতে দিন। ব্যাটারটি যে ট্রে-তে রাখবেন তা একটু মাখনে গ্রিজ় করে নিলে ভাল হয়। ঠান্ডা হয়ে গেলে এবার বেক করার পালা। আভেন ১৯০ ডিগ্রিতে প্রি হিট করুন। ট্রে-র $^{২}/_{৩}$ অংশ অবধি ঠান্ডা মোল্ড ঢেলে দিন। ৭-৮ মিনিট মতো বেক করলেই তৈরি ম্যাদেলিনস।



তুমি তো আমার রহিবে...

বাঙালির জীবনে অতুলপ্রসাদ সেন কতখানি আছেন? কীভাবে আছেন? প্রেম, ভক্তি, জাতীয়তাবাদ... জন্মদিনের ১৫০ বছর পার করে আজ কোথায় তিনি, বোঝার চেষ্টা করলেন পায়েল সেনগুপ্ত।

“কদরদান বলতে লখনউয়ের লোক ঠিক কী বোঝে জানি না, তবে আমি অতুলপ্রসাদকেই বুঝতাম। বাংলাদেশ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের কাছে চির ঋণী, কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লখনউয়ের প্রবাসী করে লখনউ সে-ঋণের প্রতিশোধ করেছে।” সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ থেকে এই মন্তব্য উদ্ধার করেছেন তাঁর ছেলে কুমারপ্রসাদ। ব্যারিস্টার এপি সেনের নামে লখনউতে একটি রাস্তা রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বাঙালির মনের গহনে যিনি রাস্তা খুঁজে নিয়েছেন অতুলপ্রসাদ সেন, তাঁর গহনের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ না হয় বাদই থাক, বাঙালির প্রিয় নজরুলের থেকেও তিনি প্রায় যোজনখানেক দূরে। কিন্তু সংখ্যাই যে শেষ কথা নয়, একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালি সেই গানকে বরণ করে নিয়েছে যা সহজ সরল অনাড়ম্বর ধনে ধনী। অথচ প্রায় নীরবেই অতিক্রান্ত হল বাংলা গানের ধারার এক প্রবাদপ্রতিম পুরুষের ১৫০ বছর। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরেই নজরুলগীতি,


অতুলপ্রসাদের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাহাড়ি স্যান্যাল।


অতুলপ্রসাদ

কবি, গীতিকার, সুরকার অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদী গানের ওপারে দাঁড়িয়ে যে অতুলপ্রসাদ। তাঁর জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে সেই জীবনকে অবিরত চাষ করেছে দুঃখ।

অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্তের গান...বাঙালির গানযাত্রার নিত্যসঙ্গী ছিল। কিন্তু গান হিসেবে তাদের নাম যত এসেছে, গানের চর্চা বা গানের স্রষ্টাদের বিষয়টিই কোথাও যেন উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে। অতুলপ্রসাদ সেনের অনাড়ম্বর সার্ধশতবর্ষ পার হয়ে যাওয়া কোথাও যেন মনে করিয়ে দেয়, বাংলার নিজস্ব গানের প্রতি, তার গভীরতার প্রতি বাঙালির একধরনের ঔদাসীন্যও রয়েছে। প্রবল এবং অনুপেক্ষণীয় রবিচ্ছায়ায় থেকেও অতুলপ্রসাদ সেন খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য। মানুষ অতুলপ্রসাদের ছায়া যেন বারবার ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর সৃষ্টিতে। কবি, গীতিকার, সুরকার অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদী গানের ওপারে দাঁড়িয়ে যে অতুলপ্রসাদ। তাঁর জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে সেই জীবনকে অবিরত চাষ করেছে দুঃখ। পিতৃহারা কৈশোরের একমাত্র অবলম্বন বিধবা মায়ের পুনরায় বিবাহ, যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। এরই ফলস্বরূপ তাঁর নিঃসঙ্গ বিদেশবাস। প্রবাসে প্রথম সন্তানের মৃত্যু, স্বদেশে ফিরেও পরিজনহীন জীবন। আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত সাধারণ কিন্তু অসাধারণ এক দুর্জয় অভিমানে স্ত্রী হেমকুসুমের সঙ্গে পৃথক বাস। অথচ সঙ্গীতের রসগ্রাহিতায় তাঁর তিনি অতুলনীয়। গান শুনে তিনি 'উন্মত্ত' হয়ে যেতেন। এমন একটি ব্যক্তিজীবন সার পেয়েছে তাঁর গানের বাণী, সুর পেয়েছে প্রকৃত ভাষ্য।

অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলায়, পিতা রামপ্রসাদ সেন এবং মাতা হেমন্তশশী। রামপ্রসাদ এবং হেমন্তশশীর বাবা কালীনারায়ণ গুপ্ত দুজনেই ছিলেন ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা। ফলে অতুলপ্রসাদও শৈশব থেকেই গভীরভাবে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু পিতার আকস্মিক প্রয়াণের পর মায়ের পুনর্বিবাহ তিনি মন থেকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। মামারবাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করার পর ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাত্রা করলেন অতুলপ্রসাদ, তাঁর মামাদের উৎসাহেই। এই বিদেশযাত্রার সময়েই ভেনিসের গন্ডোলাযাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গান লিখেছিলেন অতুলপ্রসাদ, 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী।' এইসময়ই মামাতো বোন হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। হেমকুসুম খুব সুন্দর গান করতেন, সেই সঙ্গে বেহালা, পিয়ানো ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোতেও পারদর্শিনী ছিলেন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার পরে বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানেও তাঁর যাতায়াত শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ঘটে। সরলা দেবী তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রহসনটি উৎসর্গ করেছিলেন অতুলপ্রসাদকেই। মামাতো বোন হেমকুসুমের সঙ্গে এই সময়ই সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ভারতীয় আইনে এই বিয়ে স্বীকৃত ছিল না। ফলে এক স্কটিশ আইন অনুযায়ী তাঁরা বিয়ে করেন এবং লন্ডনে আইনি ব্যবসায় মন দেন। ভূমিষ্ঠ হয় যমজ পুত্রসন্তান দিলীপকুমার ও নিলীপকুমার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিলীপ মারা যান মাত্র সাতবছর বয়সে। সন্তানশোক, তার উপর ব্যবসাও তেমন জমছিল না। দেশে ফিরে এসে বন্ধুদের সাহায্যে লখনউতে প্র্যাকটিস শুরু করেন। এখানেই তাঁর পসার ক্রমশ বাড়তে থাকে। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। লখনউ শহরের সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি প্রচুর খরচ করতেন। আবার কোনও ব্যক্তির আর্থিক পরিস্থিতি ভাল নয় খবর পেলেই দুহাতে দান করতেন তাঁকে। আইনজীবী হিসেবেও তিনি অত্যন্ত সজ্জন ও সম্মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। লখনউয়ে বাঙালিদের আড্ডায় মধ্যমণি ছিলেন

অতুলপ্রসাদ। সম্পাদনা করতেন 'উত্তরা' পত্রিকা, সেখানকার মজলিশ ও মুশায়েরার উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। 'অতুলদা' সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের স্মৃতিচারণায় ছিল, ''অমন রসিক সুজন দুর্লভ। রসই তাঁকে সংহিত করেছিল। রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন।'' সে পর্ণকুটিরের উস্তাদের ঠুমরিই হোক বা রাস্তায় পাগলিনীর ভৈরবী-টোড়ী, অতুলপ্রসাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোযোগ ও অর্থসাহায্য সে পেতই। তালিব হুসেন, লখনউয়ের শেষ বিখ্যাত সানাইয়া, তিনি এসেছিলেন অতুল


রজনীকান্ত সেন


ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়

অতুলপ্রসাদের যা কিছু ওঁর পৌত্রীর কাছে ছিল, গোমতীর বন্যায় তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছিল। যেটুকু উদ্ধার করা গিয়েছিল, তাতে দেখি অনেক পুরনো বইয়ের অবস্থাই শোচনীয়। অক্ষর পড়া যাচ্ছে না, বইয়ের পাতা ক্ষয়ে গেছে।

সেনের বৈঠকখানায়। ইউসুফের সেতারের হাত মিঠে, বরকতের ছড়ির টান ভাল, অতএব নিয়ে এসো তাকে...এই ছিলেন অতুলপ্রসাদ। লখনউয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি 'বল বল বল সবে, শতবীণা বেণুরবে' গানটি রচনা করেন। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিয়ে লেখেন বিখ্যাত গান 'কত গান তো হল গাওয়া..', দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে খুবই সখ্য ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, অতুল লিখলেন গান, জয়তু জয়তু কবি।' একবার রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে এক বিহ্বল মুহূর্তে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রিয় কবির সৃষ্টি, এই লভিনু সঙ্গ তব...'' নাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর কবিসত্তাকে। অভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের কাছে আবার তিনি প্রিয় 'অতুলদা',একইসঙ্গে রাশভারী ও মজলিশি। কিন্তু কবি ও বিদ্বজন সংস্পর্শে তিনি যতখানি আনন্দ লাভ করেছিলেন জীবনে, পারিবারিক জীবনে ততখানিই দুঃখ পেয়েছেন বারবার। দ্বিতীয় স্বামী দুর্গামোহনের মৃত্যুর পর মা হেমন্তশশীর সঙ্গে ছেলের সুসম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি হেমকুসুম। লখনউতেই অন্য একটি বাসভবনে তিনি আলাদা থাকতে শুরু করেন। নিজের অসুস্থতার কারণে আবার যখন তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতে শুরু করেন, আনন্দিত অতুলপ্রসাদ লেখেন, 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে...'। কিন্তু মনোমালিন্য ফের তীব্রতর হয়, হেমকুসুম আবার চলে যান অন্য বাসভবনে, যন্ত্রণাদীর্ণ কলম আবার বলে ওঠে, 'ওগো নিঠুর দরদি।'
নিয়তির নিষ্ঠুরতা এমনই যে, ৬৩ বছর বয়সে যখন চিরকালের মতো চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ সেন, সেদিন অসুস্থ হেমকুসুম স্বামীর বাড়িতে তৎক্ষণাৎ চলে এসেও উপরে উঠতে পারেননি বলে দেখতে পাননি তাঁকে। দেখলেন পরেরদিন। সম্পর্ক যা-ই হোক, দুজন-দুজনের সম্পর্কে চিরকাল এক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কই রেখেছেন প্রকাশ্যে, অতুলপ্রসাদের গান ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে তাঁর গলায়।

বাংলায় অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনের গানকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ অনেকদিন ধরেই করছেন সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অতুলপ্রসাদের পৌত্রী শ্রীমতী মালা সেন। ঠাকুরমা হেমকুসুমের মুখে খুব ছেলেবেলায় শোনা কিছু গান ছাড়া যাঁর কোনও প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই। অতুলপ্রসাদ যে বাড়িতে থাকতেন, সেটি এখন লখনউ কলেজ। ঋদ্ধি ভাগ করে নিলেন এই ভিন্ন ধারার গান নিয়ে তাঁর জার্নি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা..

''অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনের কাজ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আমি কাজ করেছি।



অতুলপ্রসাদের পৌত্রী মালা সেনের
সঙ্গে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়



এক প্রকার বলা যায়, নতুন প্রজন্মের কাছে এই বিষয়গুলো আমি রিভাইভ করেছি। অতুলপ্রসাদের পৌত্রী এখন লখনউ নিবাসী, অশীতিপর বৃদ্ধা। উনি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আমার গান শুনেছিলেন। 'আনন্দ পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে আমি অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের গান গেয়েছিলাম, সে কথাও ওঁর কান অবধি পৌঁছয়। দেশে-বিদেশে যেহেতু আমি কাজ করেছি, ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উনি আমার কাজের কথা জানতে পেরেছিলেন। সারা পৃথিবীতে এখন আমার সাড়ে সাতশোর বেশি ছাত্র, যারা আমার কাছে নানা রকমের গান শেখে। এই সব জেনে-শুনে অতুলপ্রসাদের পৌত্রী আমাকে এক দিন ডেকে পাঠান। সেই প্রথম আমাদের দেখা হল, কথাবার্তা হল। যেহেতু বাংলার বাইরে ওঁরা বড় হয়েছেন, তাই ওঁদের স্বচ্ছ ধারণাই ছিল না, অতুলপ্রসাদ কে বা কী। ছোটবেলায় বাবা-ঠাকুরমার কাছে যেটুকু গল্প শুনেছেন, সে-ই ছিল সম্বল। অতুলপ্রসাদ মারা যান ৬৩ বছর বয়সে, যখন তাঁর ছেলে সদ্যবিবাহিত এক যুবক। পরে আমার সঙ্গে কথা বলতে বসে অতুলপ্রসাদের গানের বিশ্বজোড়া সুখ্যাতির কথা তাঁরা জেনেছেন।

বাঙালিদের মধ্যে হয়তো একটা মুষ্টিমেয় শ্রেণি অতুলপ্রসাদের গান ভালবাসেন, কিন্তু যাঁরা বাসেন — তাঁরা খুবই ভালবাসেন। পশ্চিমবঙ্গে বসে এটা সম্যক অনুধাবন করা মুশকিল, যেহেতু এখানে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর সব কিছুকেই একটু সরিয়ে রাখার প্রবণতা আছে। অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে লখনউয়ের ঠুমরীর যেহেতু সাযুজ্য আছে, গানগুলো তাই খুব মনোগ্রাহী ও ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ঘেঁষা। অতুলপ্রসাদের যা কিছু ওঁর পৌত্রীর কাছে ছিল, গোমতীর বন্যায় তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছিল। যেটুকু উদ্ধার করা গিয়েছিল, তাতে দেখি অনেক পুরনো বইয়ের অবস্থাই শোচনীয়। অক্ষর পড়া যাচ্ছে না, বইয়ের পাতা ক্ষয়ে গেছে। লখনউ থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অতুলপ্রসাদ। এই পত্রিকায় অনেকের লেখা ছিল, যেগুলো সংরক্ষণের কাজ আমরা এখনও করে চলেছি।

ছোটবেলায় বাঙালি মেয়েরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শেখে। সেভাবেই আমিও শিখেছিলাম। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চাও করেছি। আমি কোন্নগরের মেয়ে। বড় হওয়ার সময় সেখানেও অনেক গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলাম, যাঁদের হয়তো অতটাও পরিচিতি নেই। নিয়তিদি, পাকড়াশি স্যারের কাছে শিখতাম। বাবা খুব রেকর্ড নিয়ে আসতেন— এলপি, ইপি। সেখানেই প্রথমবার আমি মঞ্জুদিদি আর সন্তোষকুমার সেনগুপ্তর গান শুনি। অধিকাংশই ছিল অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান। রবীন্দ্রনাথের গান অবশ্যই খুব প্রিয়, কিন্তু এঁদের গানগুলোর আবেদন ছিল ভীষণই অন্য রকম। সে সময় রেডিয়োয় 'অনুরোধের আসর' চলত। সেখানেই বন্দনাদি, অর্ঘ্য সেনের গলায় গান শুনেছি, ছোট থেকেই। বাবা গান খুব ভালবাসতেন। বাবার বাড়িতে গান শোনার একটা চল ছিল। আমার তখন ক্লাস ফোর। মঞ্জু গুপ্ত তখন থাকেন বিটি রোডে। বাবা-মায়ের হাত ধরে সেখানেই যেতাম গান শিখতে। পরে ভর্তি হই কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি শিখেছি মায়াদি ও শৈলেন দাসের কাছে। আমার নিজের মনে হয়েছে গলা, আমার টেম্পারামেন্টের সঙ্গে এই তিন কবির গান ভীষণ ভাবে মেলে— এটাও আমাকে দেশ-বিদেশের বহু শ্রোতা বলেছেন। আমি নিজেও তাই স্বচ্ছন্দ বোধ করি এঁদের গান নিয়ে কাজ করতে। পড়াশোনায় আমি ভাল ছিলাম আর এখনও বই পড়ার অভ্যেস আমার আছে। যে কারণে আমার আরও মনে হয়— রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের এখানে অনেক শিল্পীই গেয়ে থাকেন, কিন্তু বাংলায় বহু অন্য গানই আজও খুব অবহেলিত। সেই গানগুলো গেয়ে শুধু প্রোগ্রাম করলাম, কুড়িটা গান গেয়ে খাম ভর্তি টাকা নিয়ে নেমে গেলাম — এ রকম কিছু না-করে



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১, অতুলপ্রসাদের ১৮৭১, প্রথম দর্শনেই তাঁদের ‘প্রেম’ হয়। কুমায়ুনের রামগড় পাহাড়ে কবি বাড়ি কেনার পর অতুলপ্রসাদ সেখানে যান, নিজের গানও শোনাতে বাধ্য হন কবিকে।

এটাকে বরং আমাদের কারও কারও অন্তত একটা মিশনের মতো দেখা উচিত। ছোট থেকে এই কথাটা আমার মনের মধ্যে ঘুরত, যে কারণেই এই গানগুলোর চর্চা করে আজও আমি মনে মনে খুব আনন্দ পাই। আমার মনে হয়, এই গানগুলোকে আন্তর্জাতিক স্তরে কোথাও যেন পৌঁছে দিতে পারছি। যাঁরা শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, তাঁরাও এই গানগুলো এখন গাইছেন। মাঝে, কৃষ্ণাদির মৃত্যুর পর তো এই গানগুলো নষ্ট হতে বসেছিল, হারিয়েই যাচ্ছিল প্রায়।

কৃষ্ণাদি আমার অন্যতম গুরু, কিন্তু আমি কখনও তাঁর গায়কি অনুকরণ করিনি। অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে শিখে যাঁরা গেয়েছেন, যেমন মঞ্জু গুপ্ত, সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত, রেণুকা দাশগুপ্ত — এঁদের গানে কিন্তু কোনও ম্যানারিজ়ম আমরা পাই না। দিলীপকুমারের শিষ্য হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণাদির বাবা। দিলীপকুমার ছিলেন অসাধারণ এক প্রতিভা। যেমন তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দক্ষতা, তেমন তাঁর ঐশ্বরিক চেহারা, তেমনই দারুণ গলা। একটু দাঁত চেপে গাইতেন তিনি। হরেন্দ্রনাথ নিজে সেভাবে গাইতে শিখে হয়তো মেয়েকেও তেমন ভাবেই গাইতে শেখান। গোবিন্দকুমার মুখোপাধ্যায়ও দিলীপকুমারের কাছ থেকে একই রকম গায়কি পান। ফলে অনেকে বলেন, এ ভাবে দাঁত চেপে গাওয়া, ধাক্কা মেরে মেরে গাওয়া—এটাই বুঝি এ সব গানের ঘরানা। সেটা কিন্তু নয়। নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বুঝেছি, এই ম্যানারিজ়মগুলোই এই গানগুলোকে সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গানগুলোকে তো বাঁচাতে হবে। এই তাগিদ থেকেই আমার এই কাজে ঝাঁপ দেওয়া। পঞ্চকবির গান নিয়ে ২০১৪ সাল থেকে আমি কাজ করছি। শ্রোতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ আমার গান, আমার গায়কি, গবেষণা সবটাই তাঁরা সব সময় খুব পছন্দ করেছেন। বাঙালি শ্রোতারা আজও ভাল গান শুনতে চান। শ্রোতারা শুনতে চান বলেই যাঁরা শুদ্ধ সঙ্গীত নিয়ে কাজ করছেন— তারা সারভাইভ করতে পেরেছে। অতুলপ্রসাদের পরিবারে পরের প্রজন্মে আর গানের চর্চা হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তো সেভাবে প্রজন্ম নেই। ছেলে দিলীপকুমার রায় বিয়ে করেননি। মেয়ে ছিলেন মায়া। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলের। তাঁদের মেয়ে এষা, অরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যান। রজনীকান্ত সেনের বংশ এখন প্রবাসী। কেউ শিকাগো, কেউ নিউ ইয়র্ক, কেউ ক্যালিফর্নিয়ায় আছেন। ওঁদের সঙ্গে আমার খুব যোগাযোগ আছে। রজনীকান্তের একাধিক সন্তান ছিল। ফলে খুব অর্থকষ্ট ছিল। চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে নিজের বই বেচতেও হয়েছিল তাঁকে। তবে আনন্দের কথা, ওঁর বংশধররা আজ সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সচ্ছল। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের প্রাণপণে তৈরি করার চেষ্টা করছি, যাতে দেশে ও বিদেশে এই ভিন্ন ধারার বাংলা গান হারিয়ে না যায়, বরং আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।”

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১, অতুলপ্রসাদের ১৮৭১, প্রথম দর্শনেই তাঁদের ‘প্রেম’ হয়। কুমায়ুনের রামগড় পাহাড়ে কবি বাড়ি কেনার পর অতুলপ্রসাদ সেখানে যান, নিজের গানও শোনাতে বাধ্য হন কবিকে। দুঃখেও দুজনের খুব মিল। কিন্তু দিনের পর দিন কবিসঙ্গ করে অতুল বুঝেছিলেন সৃষ্টি ও প্রকাশের আনন্দ সমস্ত নিহিত বেদনাকে অতিক্রম করে যায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। তাই অতুলপ্রসাদও দুঃখের নির্জন বাগানে ভিতরের নরম আত্মসঙ্কট ও আত্মত্রাণকে ফুটিয়ে তোলেন মায়াবি রাগ-রাগিণীর ছায়ায়, লখনউয়ের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাবে, কীর্তনের আঙ্গিকে, যাতে দুঃখের চেয়েও আত্মতৃপ্তি বড় হয়ে ওঠে, শোককে ছাপিয়ে যায় বৈরাগ্য। “পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ..”। তাই এই গানগুলি বাঙালির মননের সঙ্গী হয়ে ওঠে আজও। রচয়িতা জানেন, জাতির ঔদাসীন্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত সম্পদ কোনওদিন হারিয়ে যাবে না। নিজের জীবন দিয়ে তিনি বুঝেছেন, “সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া/ তুমি তো আমার রহিবে..”

তথ্যসূত্র: কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গি, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাদার পত্রিকা আর্কাইভ



'আরআরআর' ভেঙে দিয়েছে সব রেকর্ড

ওঁ সিনেমায় নমঃ!

ভারতজুড়ে এখন দক্ষিণী ছবির জয়জয়কার। বলিউড ধুঁকছে আর টলিউড রয়েছে মন্দের ভাল অবস্থায়। কিন্তু তা হলেও একটা প্রশ্ন খচখচ করতে থাকে মনের মধ্যে। দক্ষিণের সবই যদি ভাল, তাহলে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে সম্প্রতি স্ট্রাইক ডাকতে হল কেন? লিখছেন কৌশিক পাল।

কথায় বলে, প্রত্যেক সাত থেকে দশ বছরে মানুষের রুচি বদলায়। বিশেষত সিনেমার দর্শকদের। এবং এই কথাটাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন স্বয়ং 'ইন্ডাস্ট্রি', প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেদিন এক সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেদককে তিনি বলছিলেন, ''এই পরিবর্তনটা যে হয়, সেই ফ্যাক্ট কিন্তু রেকর্ডেড। আমি শুধু বাংলা বা ভারতের কথা বলছি না, সারা পৃথিবী জুড়ে তা-ই হয়। একটা সময় আমরা 'জেমস বন্ড' দেখতে ভালবাসতাম। তারপর লভস্টোরি হতে শুরু করল। তারপর এল লার্জার দ্যান লাইফ সিনেমা... আমরা যারা সিনেমার কর্মী, আমাদের কাজটাই হচ্ছে এই নতুন দিশাটাকে ধরা— এবং এক্ষেত্রে ম্যাজিক নেই কারও হাতে।''

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে কি এখন আমরা সেই ট্রানজিশনটার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি? না হলে যখন একটার পর একটা দক্ষিণী ছবি একই দিনে সারা ভারতে মুক্তি পাচ্ছে এবং বক্স অফিসে গড়ছে নতুন-নতুন রেকর্ড, সেই সময় তাদের সামনে পড়ে কেন কুঁকড়ে যাচ্ছে বলিউডের

সুপারস্টারেরা? অথচ কয়েক বছর আগে পর্যন্তও তো এই দক্ষিণী ছবির রিমেক করেই বক্স অফিসে কামাল করতেন সলমন খান! আসমুদ্র হিমাচল তারকা বলতে চিনত যে তিন খানকে কিংবা অক্ষয়-অজয়দের, সেই তাদের মুখে-মুখে এখন কেন ঘুরছে আল্লু অর্জুন, বিজয় দেবেরাকোন্ডা, যশ, জুনিয়র এনটিআর-এর মতো আঞ্চলিক ছবির তারকাদের নাম? খেলাটা বদলে গেল কী করে?


এবছর বলিউডের মুখ রক্ষা করেছে 'ভুলভুলাইয়া ২'

ম্যাজিকের নাম 'প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ়'

মনে হয় না এই মুহূর্তে ভারতে এমন কোনও প্রান্ত আছে, যেখানে সিনেমা নিয়ে আলোচনা হবে, অথচ সেখানে উঠে আসবে না 'পুষ্পা', 'কেজিএফ' কিংবা 'আরআরআর'-এর প্রসঙ্গ! 'কাটাপ্পা নে বাহুবলী কো কিঁউ মারা?' ২০১৫ সালে 'বাহুবলী-দ্য বিগিনিং'-এর মাধ্যমে এই অমোঘ প্রশ্নে সারা দেশে যে ঝড় তুলেছিলেন পরিচালক এস এস রাজামৌলি, সেটাই আঁধি হয়ে ফিরে আসে ২০১৭ সালে 'বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন'-এর হাত ধরে। আর ২০২২-এর গোড়া থেকে সেটাই যেন আকার নিয়েছে সুপার সাইক্লোনের! একের পর এক আছড়ে পড়েছে আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা' (এটি অবশ্য মুক্তি পায় ডিসেম্বর, ২০২১-এ, তারপর দাপিয়ে বেড়ায় ২০২২-এর প্রথম মাস জুড়ে), রামচরণ ও জুনিয়র এনটিআর অভিনীত 'আরআরআর' (২৫ মার্চ, ২০২২) এবং কান্নাড়া সুপারস্টার যশ-এর 'কেজিএফ চ্যাপ্টার টু' (১৪ এপ্রিল ২০২২)। সারা দেশের সিনেমাপ্রেমী জনতা যেন কাবু হলেন দক্ষিণী ছবির গণ-হিস্টিরিয়ায়। এমন নয় যে 'বাহুবলী'-ই দক্ষিণের প্রথম ছবি, যেটি সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় মুক্তি পেয়েছিল। নয়ের দশকের গোড়াতেই মণিরত্নমের তামিল ভাষায় নির্মিত 'রোজা'র হিন্দি ডাবড ভার্শন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা, প্রেক্ষাগৃহে গিয়েই। কিন্তু কোথাও গিয়ে সেটা যেন ঠিক ট্রেন্ড হয়ে উঠতে পারেনি। পথ দেখিয়েছিল মাত্র। সেই পথ ধরেই যেন বিগত কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে একটি শব্দবন্ধ, 'প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ়'। কোনও একটি আঞ্চলিক ছবিকে (পড়ুন দক্ষিণী) অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় ডাব করানোর পাশাপাশি উত্তর ভারতের দর্শকদের জন্য হিন্দিতেও ডাব করানোর ট্রেন্ড শুরু হয়। এরই পোশাকি নাম 'প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ়'। গত বছর এই প্যান ইন্ডিয়া ট্রেন্ডের প্রথম বড় সাফল্য আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা: দ্য রাইজ়'। কোভিডের প্রকোপ তখনও রয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশ অকুপেন্সির খাঁড়া মাথায় নিয়ে কোনওরকমে ধুঁকছে সিনেমাহলগুলি। তার মধ্যেও বক্স অফিসে 'পুষ্পা'র আয় সেসময় পেরিয়ে যায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা (১৭০


অক্ষয়ের 'রক্ষাবন্ধন' পড়েছে মুখ থুবড়ে

২০২২-এর গোড়া থেকে সেটাই যেন আকার নিয়েছে সুপার সাইক্লোনের! একের পর এক আছড়ে পড়েছে আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা', রামচরণ ও জুনিয়র এনটিআর অভিনীত 'আরআরআর' এবং কান্নাড়া সুপারস্টার যশ-এর 'কেজিএফ চ্যাপ্টার টু'।


'লাইগার' গর্জালেও বর্ষায়নি



'পুষ্পা' দেখিয়েছে 'প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ়'-এর ম্যাজিক



'ব্রহ্মাস্ত্র'র অ্যাডভান্স বুকিং সাড়া জাগিয়েছিল



'৭৭৭ চার্লি' মন ছুঁয়ে যায় দর্শককুলের

কোটি টাকার ছবি)! কাছাকাছি সময়ে মুক্তি পাওয়া বলিউড সুপরস্টার রণবীর সিংহ অভিনীত, কবির খান পরিচালিত কপিল দেবের বায়োপিক '৮৩'-কে ব্যবসার নিরিখে বহু যোজন পিছনে ফেলে দিয়েছিল 'পুষ্পা'। 'বাহুবলী' থেকে যে সাফল্যের শুরু, দক্ষিণী ছবির সেই সর্বভারতীয় আবেদন ২০২২-এ বোধহয় তুঙ্গে। ২০১৫ থেকে ২০২২, এই সময়কালের মধ্যেও কিন্তু 'কেজিএফ ওয়ান'-এর মতো উত্তর ভারতে ব্যবসাসফল ছবি এসেছে। তবে ধারাবাহিক সাফল্যের নিরিখে ২০২২ সাল তথাকথিত 'প্যান ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রি'র জন্য একটি মাইলফলক বলা যেতে পারে। যদিও দক্ষিণী ছবির জনপ্রিয়তা কিন্তু উত্তর এবং পূর্ব ভারতে বরাবরই ছিল। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে ডাবড ছবির টিআরপি বরাবরই সেই কথা প্রমাণ করেছে। সুরিয়া, মহেশবাবুরা কিন্তু অনেকদিন ধরেই ঘর বাঁধছিলেন উত্তর এবং পূর্ব ভারতের দর্শকদের মনে। 'প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ়' এবং ওটিটি-র আগমন সেই জনপ্রিয়তাকেই উসকে দিয়েছে আরও বহুগুণ। প্রশ্ন হল, বলিউড কি তাহলে কনটেন্টের নিরিখে দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারছে না? দক্ষিণের সঙ্গে বলিউড যেভাবে হাত মেলাচ্ছে (করণ জোহর যেভাবে প্রমোট করলেন বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে), বলিউডের ছবি পরপর দক্ষিণী ছবির রিমেক হিসেবে তৈরি হচ্ছে, তাতে কিন্তু একটি আঞ্চলিক ইন্ডাস্ট্রির (দক্ষিণের চারটি আলাদা ইন্ডাস্ট্রি: তামিল, তেলুগু, মলয়ালম, কান্নাড়া) ক্ষমতায়নের কথাই উঠে আসে। তবে তার মানে কিন্তু এই নয় যে, দক্ষিণের বিগ বাজেট ফিল্ম সবই বক্স অফিসের স্নেহধন্য হচ্ছে!

বলিউড পিছিয়ে পড়ছে কোথায়?

সম্প্রতি দক্ষিণী ভাষার ছবি নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, অভিনেতা-পরিচালকদের পরিচিতি যেভাবে বাড়ছে, দর্শকরা যেভাবে উৎসাহ দেখাচ্ছেন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন পজ়িটিভ রিভিউ উঠে আসছে...তাতে স্পষ্ট যে, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণের বিভেদ এখন অনেকটাই ঘুচে গিয়েছে। তার একটা অন্যতম কারণ যদি হয় 'প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ়' অন্য কারণটি অবশ্যই কোভিডকালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলির প্রবল বিস্তার লাভ। লকডাউনের সময় ঘরবন্দি মানুষ যখন এন্টারটেনমেন্টের উপায় খুঁজছেন, সেই সময় ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলি তাঁদের সামনে উপস্থিত হয় দক্ষিণের খোলা জানালা হিসেবে। সেখানে বিদেশি কনটেন্টের পাশাপাশি যখন দক্ষিণ ভারতের বৈচিত্রমূলক কনটেন্টও হাতের মুঠোয় এসেছে, তখন তা আপন করে নিয়েছেন দর্শককুল। দর্শকদের মধ্যে এই সময়কালে নানাধরনের কনটেন্টের সহজলভ্যতা যেমন বেড়েছে, তেমন বেড়েছে গ্রহণযোগ্যতাও। এবং সেটা যে কোন মাত্রায়, তা তুলে ধরতে একটা ছোট পরিসংখ্যান না হয় রাখি আপনাদের সামনে। গত বছর নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত মলয়ালম সুপারহিরো ফিল্ম 'মিন্নাল মুরলী' প্রায় ৩০টি দেশে সেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের টপ টেন-এ ছিল! তামিল অ্যান্থোলজি 'নবরস'-এর মুক্তির প্রথম সপ্তাহে অন্তত ৪০ শতাংশ দর্শক ছিলেন ভারতের বাইরের! অ্যামাজ়ন প্রাইমের হিসেবও বলছে, তামিল, তেলুগু, মলয়ালম ও কান্নাড়া ছবির ৫০ শতাংশ দর্শকই এখন নাকি দক্ষিণের বাইরের। আর অন্তত ২০ শতাংশ দেশের বাইরের। এই সাফল্যের কারণেই এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে ভারতের প্রথম লং ফর্ম স্ক্রিপ্টেড অরিজিনাল শো, 'সুঝল: দ্য

ভোর্টেক্স' (তামিল)। এর পাশাপাশি ওটিটি-তে বড় তারকাদের ছবি দেখার সুযোগ তো আছেই। গত বছর ওটিটি-তে মুক্তি পেয়েছিল সুরিয়ার 'জয় ভীম'। কনটেন্টের নিরিখে অসম্ভব প্রশংসিত হয় সে ছবি। একইভাবে সুরিয়ার 'সুরারাই পোত্তরু' কোভিডের কারণে হলে মুক্তি পায়নি। ওটিটি-তে সেই ছবি দেখে মুগ্ধ হন দর্শকরা। ভাবলে তাজ্জব হতে হয়, 'আরআরআর' সিনেমা হল (মুক্তি পেয়েছিল ২৩০০ স্ক্রিনে, বক্স অফিস কালকেশন প্রায় ১২০০ কোটি টাকা!) থেকে উঠে যাওয়ার পর যখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসে, তখন তার ভিউয়ারশিপ ছাড়িয়ে যায় সাড়ে চার কোটি ঘণ্টা! মানে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে কী পরিমাণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে! আসলে দক্ষিণী ছবির বৈচিত্রমূলক কনটেন্টই মানুষকে আরও বেশি করে ওখানকার ছবির প্রতি আকৃষ্ট করছে। একদিকে যেমন 'আরআরআর', 'বিক্রম', 'কেজিএফ', 'পুষ্পা'-র মতো লার্জার দ্যান লাইফ ছবি আছে তাদের ঝুলিতে, তেমনই '৭৭৭ চার্লি', 'মেজর' বা 'রকেট্রি'-র মতো কনটেন্ট ভিত্তিক ছবিও। আর মলয়ালম ইন্ডাস্ট্রি তো বরাবরই কনটেন্ট-নির্ভর। সেখানে ওটিটি-তে একের পর এক এক্সপেরিমেন্টাল কনটেন্ট সর্বভারতীয় স্তরে অনেক বেশি পরিচিতি দিয়েছে দুলকর সলমান, ফাহাদ ফাসিল, শেন নিগম, টোভিনো থমাসদের। সেখানে বলিউড কী করছে? একের পর এক রিমেক আর প্রোপাগান্ডাধর্মী ছবি। হ্যাঁ, 'কাশ্মীর ফাইলস' বা 'ভুল ভুলাইয়া ২'-এর



'লাল সিং চড্ডা' নিয়ে আমির মাতামাতি করলেও মুখ ফিরিয়েছে দর্শক



'লাইগার'-এর সঙ্গে মুক্তি পেলেও তার আঁচড় পড়েনি 'লক্ষ্মী ছেলে'র গায়ে

এখন ওটিটি এবং ইউটিউবের দৌলতে দক্ষিণের অরিজিনাল কিংবা ডাবড ভার্শন আগেই দেখে নিচ্ছেন উত্তর এবং পূর্ব ভারতের দশর্ক। তাহলে আর রিমেক ছবি কেন দেখবেন তাঁরা? বিশেষত তথাকথিত বলিউড 'স্টার'দের ফ্যানবেসই যখন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে!

মতো বক্স অফিসে সফল ব্যতিক্রমী ছবি আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আগামী কয়েকটি হিন্দি ছবির দিকে চোখ বোলান। 'বিক্রম বেধা' (তামিল), 'আলা বৈকুণ্ঠপুরামুলু' (তেলুগু), 'সুরারাই পোত্তরু' (তামিল), 'কাইথি' (তামিল), 'আন্নিয়ান' (তামিল), 'ড্রাইভিং লাইসেন্স' (মলয়ালম), 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কিচেন' (মলায়লম), 'হিট' (তেলুগু)...এই সব ছবিরই রিমেক নিয়ে হাজির হচ্ছে বলিউড। আর এই ছবিগুলোর কোনওটায় রণবীর সিংহ, কোনওটায় হৃতিক-সেফ, কোনওটায় অক্ষয়কুমার, অজয় দেবগন কিংবা কার্তিক আরিয়ানের মতো তারকা! প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, বলিউডের অরিজিনাল কনটেন্ট তাহলে কোথায়? যদিও ভুলে গেলে চলবে না, কোভিড পরবর্তী সময়ে রোহিত শেট্টির 'সূর্যবংশী' কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বলিউডি বক্সঅফিসে অক্সিজেন দিয়েছিল। কিন্তু সেই ট্রেন্ড ধরে রাখতে পারা যায়নি।

আগে তা-ও দক্ষিণী হিট ছবির রিমেকের মধ্যেও একটা ফ্রেশনেস পাওয়া যেত, কিন্তু এখন ওটিটি এবং ইউটিউবের দৌলতে সেই ছবিগুলির অরিজিনাল কিংবা ডাবড ভার্শন তো আগেই দেখে নিচ্ছেন উত্তর এবং পূর্ব ভারতের দশর্ক। তাহলে আর রিমেক ছবি কেন দেখবেন তাঁরা? বিশেষত তথাকথিত 'স্টার'দের ফ্যানবেসই যখন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে! আমির খানের 'লাল সিং চড্ডা' (ফরেস্ট গাম্প-এর রিমেক. ১৮০ কোটির ছবি, বক্স অফিস থেকে সাকুল্যে তুলেছে ৬৪ কোটি টাকা) তো এই বুমেরাং প্রকল্পের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তবে ব্যতিক্রম কি নেই? 'কবীর সিংহ'-এর কথাই ধরুন। তেলুগু ছবি 'অর্জুন রেড্ডি'-র এই হিন্দি রিমেকই তো শাহিদ কপূরের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় হিট! তবে ওই, ব্যতিক্রম-ই তো যে-কোনও সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করে।

বোঝার ওপর শাকের আঁটি: #বয়কট ট্রেন্ড

একটা সময় ছিল, যখন ছবির বিষয়বস্তুর কারণে রাজনীতিকদের আঁতে ঘা লাগলে (পড়ুন, কোনও না কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে) বিশেষ কিছু ছবিকে বয়কটের ডাক দিতেন তাঁরা, সংগঠিতভাবে। যেমন ১৯৯৮ সালে দীপা মেহতার 'ফায়ার' মুক্তি পাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে প্রতিবাদ শুরু হয় শিবসেনার নেতৃত্বে। প্রেক্ষাগৃহ ভাঙচুর শুরু হয়। জিগির তোলা হয়, দুই জায়ের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক দেখানোর কারণে, স্ত্রী-পুরুষের সনাতন সম্পর্কের ফলে বংশবৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া, তা ভেঙে পড়বে। দীপারই আর এক ছবি 'ওয়াটার', মনীষা কৈরালার 'এক ছোটি সি লভ স্টোরি' বা



'বাহুবলী' রচনা করেছিল এক অন্য মহাকাব্য


'টনিক' পেয়েছে বক্স অফিসের আশীর্বাদ


'বেলাশুরু'র বক্স অফিস সাফল্য নিয়ে কারও মনে দ্বিধা ছিল না

শাহরুখ খানের 'মাই নেম ইজ় খান'কে কেন্দ্র করে নানা কারণে দেওয়া হয় তাঁদের ছবি বয়কটের ডাক। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, ছবির পর ছবি বয়কটের ডাক দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ! এবং সেটা করতে গিয়ে দল বেঁধে রাস্তায় নামতে হচ্ছে না তাঁদের, ভাঙচুর, কুশ পুতুল পোড়ানোর মতো কাজও করতে হচ্ছে না। স্রেফ তারকাদের কিছু ভিডিয়ো বা পুরনো সাক্ষাৎকারের বক্তব্য ভাইরাল করে দেওয়া হচ্ছে। স্লোগানের পরিবর্তে চলে আসছে হ্যাশট্যাগ, তাঁদের ছবি বয়কটের ডাক। এবং রাতারাতি তা ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো। ফলস্বরূপ চোখে পড়ার মতো ফাঁকা থাকছে প্রেক্ষাগৃহ! 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' 'লাল সিংহ চড্ডা', 'লাইগার', 'রক্ষাবন্ধন', 'দোবারা'... একের পর এক ছবি পড়ছে #বয়কটের কোপে (অবশ্য বয়কট ট্রেন্ড না এলেও ছবিগুলি বক্স অফিসে কতটা কী করত পারত, তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে)। কখনও অসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গে টেনে এনে, কখনও নেপোটিজ়মের পৃষ্ঠপোষকতার কারণ দেখিয়ে, কখনও বা কোনও কারণ ছাড়াই চলছে এই 'বয়কট'-এর খেলা। কিন্তু কেন এই বয়কটের ডাক? সাধারণ মানুষ কোন নেশায় মেতে উঠেছেন এই খেলায়? একটু তলিয়ে দেখলে, মূলত দু'টি কারণের কথা মাথায় আসবে। এক, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তারকাদের প্রতি নিজেদের ফ্রাস্ট্রেশন ঝেড়ে ফেলা খুবই সহজ। আর এটাও ঠিক যে বলিউডের তারকারা মুখে যতই বলুন 'জনতাই জনার্দন, তাঁরা আছেন বলেই আমরা আছি' টাইপের কথাবার্তা, আসলে তাঁরা সকলেই নিজেদের দর্শকের চেয়ে উপরেই রাখেন। একটা-দুটো ছবি করেই নিজেদের কেউকেটা ভাবতে শুরু করেন। ফলে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের ব্যবহারও পালটে যায়। আর ডিজিটাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তারকাদের ব্যবহারিক পদস্খলন, ঔদ্ধত্য মানুষের মনে জন্ম দেয় বিতৃষ্ণার। মোদ্দা কথা, তারকাদেরও সংযত হওয়ার সময় এসেছে। দর্শককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে, ইটের বদলে পাটকেল খেতে এখন সময় লাগবে না। এই দেখুন না, বয়কট ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যেমন 'দোবারা' ছবির প্রচারে তাপসী পান্নু বললেন, 'আপনারা তো শুধু বড় তারকাদের ছবি বয়কট করছেন। আমাদের ছবিও বয়কট করুন, না হলে নিজেদের ঠিক তারকা মনে হবে না।' ফলে 'দোবারা'কে সত্যিই মানুষ বয়কট করলেন! এবং প্রথম সপ্তাহেই ছবি কেবল রাতের শো-টাইমেই হলে পড়ে রইল। মোদ্দা কথা, ওভার কনফিডেন্স, উপরচালাকি, দর্শকের প্রতি তাচ্ছিল্য, এগুলো দর্শক আর মজার ছলে নিচ্ছেন না।

তবে এই বয়কটের পিছনে দ্বিতীয় কারণটি নেহাত একটি কনসপিরেসি থিয়োরি হিসেবে উঠে এলেও, বিষয়টি কিন্তু যথেষ্ট গুরুতর। এই যে হল-রিলিজ়ের একমাসের মধ্যে ছবিগুলো ওটিটি মাধ্যমে চলে আসছে, সেই কারণেই কি এই বয়কট ট্রেন্ডের জনপ্রিয়তা? কোভিডের পর মানুষ এখন খুব হিসেব করে পয়সা খরচা করেন। লকডাউনে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর বাৎসরিক সাবস্ক্রিপশন নিয়ে বসে রয়েছেন অনেকেই। সেখানে হলে আর অর্থব্যয় করে ছবি দেখবেন কেন, যদি একমাসের মধ্যেই সেই ছবি ওটিটি-তে দেখতে পান? বরং যত তাড়াতাড়ি হল থেকে

ছবিটি পাততাড়ি গোটাবে, তত তাড়াতাড়ি ওটিটি-তে সেটি চলে আসবে! না হলে বক্স অফিসে ব্যর্থ ‘শেরদিল’, ‘শাবাস মিঠু’ কিংবা ‘শমশেরা’র মতো ছবিগুলি সব তো ইতিমধ্যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন্ডিং! ওটিটি-তে ছবি মুক্তির সময় ত্বরান্বিত করতেই কি এই ক্যালকুলেটেড স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছে দর্শককুল এবং শুনতে খারাপ লাগলেও, খোদ ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিরই কি পরোক্ষ ইন্ধন রয়েছে এর পিছনে? বলা কঠিন। কিন্তু তা যদি হয়, তা হলে কিন্তু ক্ষতি আদতে হচ্ছে সিনেমা হলের মালিকদেরই। কারণ পরিচালক-প্রযোজকরা হয়তো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে চুক্তি করে নিজেদের ব্যবসার অঙ্ক ঠিকই মিলিয়ে নেবেন, কিন্তু সিনেমা হলে কমিউনিটি ভিউয়িংয়ের সংস্কৃতি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।


‘কেজিএফ’ নিয়ে উন্মাদনা ছিল অকল্পনীয়


বক্স অফিসে ‘অপরাজিত’র ম্যাজিক চমকে দিয়েছে সকলকে

বাংলা ছবির হাল হকিকত

এই কথাটি গর্ব করে বলা যায়, এবছর অন্তত তুলনামূলকভাবে বলিউডের চেয়ে টলিউডের পরিস্থিতি ভাল। বাংলায় এবছরের সবচেয়ে আলোচিত ছবিটির নাম ‘অপরাজিত’। সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ তৈরির গল্প তুলে ধরে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন পরিচালক অনীক দত্ত। প্রথম সপ্তাহে মাত্র ৪০টি শো দিয়ে শুরু করে দ্বিতীয় সপ্তাহেই তা বেড়ে হয় ১২০টি! এমন নজির সত্যিই বিরল। যশ রাজ ফিল্মসের মতো ব্যানার, রণবীর সিংহের মতো তারকা সম্বলিত ‘জয়েশভাই জোরদার’-এর সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পায় ‘অপরাজিত’। কিন্তু আনকোরা জিতু কমলের সামনে (‘পথের পাঁচালী’র নস্ট্যালজিয়াও একটা বিশাল ফ্যাক্টর বটে) জাস্ট উড়ে গিয়েছেন রণবীর সিংহ। একই ঘটনা ঘটছে ‘লক্ষ্মী ছেলে’-র ক্ষেত্রেও। দক্ষিণী সুপারস্টার তথা বলিউডের নতুন সেনসেশন বিজয় দেবেরাকোন্ডার ‘লাইগার’ কোনও রকম আঁচড়ই ফেলতে পারেনি ‘লক্ষ্মী ছেলে’-র গায়ে (সারা দেশেই অবশ্য মুখ থুবড়ে পড়ে ‘লাইগার’)। টলিউডের হিট মেশিন, পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, ‘‘প্রায় প্রত্যেকটা সিঙ্গলস্ক্রিনের তরফ থেকে আমার কাছে ফোন এসেছে, ‘দাদা, লাইগার টানতে পারছি না। তিনটে শো-এই লক্ষ্মী ছেলে চালিয়ে দিই?’ ভাবতে পারছেন ব্যাপারটা?’’ শিবপ্রসাদ-নন্দিতা রায়ের ‘বেলাশুরু’ তো বক্স অফিসে এবছরের অন্যতম সফল ছবি। এছাড়া আছে দেবের ‘টনিক’ (এই ছবিটি গত বছরের ডিসেম্বরে রিলিজ় করলেও বক্স অফিস ধরে রেখেছিল ২০২২-এর প্রায় পুরো জানুয়ারি মাস জুড়ে)। সফল হয়েছে একেনবাবু ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির প্রথম ছবি ‘দ্য একেন’-ও। সেখানে, বলিউডে এখনও পর্যন্ত বাণিজ্যসফল ছবি মোটে দু’টি। ‘কাশ্মীর ফাইলস’ এবং ‘ভুলভুলাইয়া ২’। অ্যাডভান্স বুকিংয়ের ট্রেন্ড দেখে অবশ্য বলা যায়, রণবীর-আলিয়ার ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ হয়তো অনেক হিসেব বদলে দিতে পারে (এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত, এখনও মুক্তি পায়নি ছবিটি)। কিন্তু ৪১০ কোটি টাকার ছবি, যেটি বানানো হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর ধরে, সেটির বক্স অফিস হিট-ফ্লপের অঙ্ক কষাটাও কিন্তু বেজায় কঠিন। কারণ, ৪১০ কোটি টাকার এই পাঁচ বছরের ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টকেও হিসেবের মধ্যে রাখা উচিত, নয় কি? যাক, এই জটিলতার মধ্যে আমরা না-ই বা গেলাম।

মোদ্দা কথা হল, ভারতজুড়ে এখন দক্ষিণের জয়জয়কার। বলিউড ধুঁকছে আর টলিউড রয়েছে মন্দের ভাল অবস্থায়। কিন্তু তা হলেও একটা প্রশ্ন খচখচ করে মনের মধ্যে। দক্ষিণের সবই যদি ভাল, তাহলে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে সম্প্রতি স্ট্রাইক ডাকতে হল কেন? তারকাদের আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক নাকি এর কারণ। কিন্তু সত্যিই যদি অধিকাংশ ছবি বক্স অফিসে সাফল্য পেত, তাহলে কি আর তারকাদের ওই পারিশ্রমিক দেওয়া নিয়ে চিন্তিত হতে হত প্রযোজকদের? যদিও তেলুগুতে পরপর একাধিক ছবি ফ্লপ হওয়ার পরেও পরপর তিনটি ছবি হিট (‘সীতা রামম’, ‘বিম্বিসারা’, ‘কার্তিকেয় ২’)। তিনটি ছবির মূল নির্যাস ভারতীয়ত্ব বা মিথোলজিতে নিহিত। তামিলেও ধনুষের ‘তিরুচিত্রাম্বলম’ হিট। তবুও হিটের চেয়ে যে ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশি! সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির প্রকৃত ব্যবসার ছবিটা যে কি, তা দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা!





শাড়ির সাজে সকাল-সন্ধে

দেবী আরাধনায় মেতে উঠেছে ভুবন। শক্তির আরাধনার এই শুভক্ষণে নারী শাড়িতে অপরূপা। ট্র্যাডিশনাল থেকে কনটেম্পোরারি, বৈচিত্রময় শাড়ির সাজে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক পুজোর সকাল-সন্ধে...

পুজোতে উজ্জ্বল সাজে চাই ট্র্যাডিশনাল শাড়ি। ম্যাট গোল্ড জ়রি পাড়, বেগুনি রঙের বালুচরি শাড়ি। এই শাড়ির প্রধান ইউএসপি হল এর রিভার্স প্যাটার্ন বালুচরি ডিজ়াইন। ডানদিকে অন্যজন পরেছেন চওড়া জ়রি পাড়ের কাঞ্চিপুরম সিল্ক শাড়ি।

বালুচরি শাড়ি: প্রথা, **কাঞ্চিপুরম শাড়ি:** স্টুডিও বিন্দি, **রুপোর গয়না:** করিশ্মাজ়



ট্র্যাডিশনাল নীল কটন জামদানি শাড়িতে কনটেম্পোরারি ডিজ়াইন। স্ট্র্যাপি ব্লাউজ় ও রুপোর গয়নার সঙ্গতে পুজোয় স্টাইলিশ সাজ।

শাড়ি: প্রথা
ফোন: ৯৮৩১২৬৬৬০০
গয়না: করিশ্মাজ়



পুজোয় চাই এক্সক্লুসিভ শাড়ির সাজ। লাম্বানি এমব্রয়ডরি কাজ করা বেগুনি ইন্কল কটন শাড়ি ও স্টাইলিশ হেয়ারস্টাইলে জমে উঠুক পুজোর সাজ।

শাড়ি: স্টুডিও বিন্দি
ফোন: ৮৩৭৬৮২৭২২২
গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭



ট্র্যাডিশনাল তসর শাড়িতে অভিনবত্ব আনতে এবার পুজো কালেকশনে রাখতে পারেন গুজরাতের ভুজোড়ি তসর শাড়ি। মাল্টিকালার্ড আঁচল ও পাড়ের কমলা তসর শাড়িতে ঝলমলে সাজ।

শাড়ি: স্টুডিও বিন্দি
গয়না: করিশ্মাজ়



এবার পুজোতে
লাম্বানি ডিজ়াইন
শাড়ি ইন ট্রেন্ড।
হালকা ও গাঢ়
গোলাপি শেডের
সিল্ক শাড়িতে লাম্বানি
এমব্রয়ডারি কাজ।
সঙ্গে হালকা
গয়নার সাজ।

শাড়ি: প্রথা
গয়না: করিশ্মাজ়



ট্র্যাডিশনাল সিল্ক গাদোয়াল শাড়ি। কিন্তু রঙের ক্ষেত্রে আছে অভিনবত্ব। ধূসর রঙের গাদোয়াল শাড়িতে সিলভার ও গোল্ডেন জ়রির ডিজ়াইন। ভিন্ন ধরনের ড্রেপিং স্টাইলে ইউনিক লুক।

শাড়ি: প্রথা
গয়না: করিশ্মাজ়



চওড়া জ়রি পাড়ের গাঢ় নীল সিল্ক চান্দেরি শাড়ি। সঙ্গে কস্টিউম গয়নার সাজে ঝলমলে পুজোর সন্ধ্যার সাজ।

শাড়ি: BYYB
ফোন: ৯৮২৩৯৫৮৯৪০
গয়না: বম্বে বাই আয়েশা

মডেল: শুভমিতা, তনিশা
মেক-আপ ও হেয়ার: মৈনাক দাস
ফোন: ৮২৭৪৯০২৫২৭
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: অঙ্গনা সামন্ত
লোকেশন: দ্য স্ট্যাডেল, সল্টলেক স্টেডিয়াম ক্রিকেট গ্রাউন্ড, গেট নম্বর ৩
ফোন: ০৩৩ ৭১৬৪৪৬০০
ওয়েবসাইট: www.thestadel.com
ছবি: শিলাদিত্য দত্ত
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার
রূপায়ণে: পিয়ালী বালা

এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন এই QR কোডটি।



মেঘের কোলে মাউন্ট ভিসুভিয়াস



গন্তব্য ভিসুভিয়াস

এই জায়গা থেকে ফিরে আসার সময় মোটেই বলা যাবে না যে, ‘আসছে বছর আবার হবে’। কিন্তু ভিসুভিয়াসের সৌন্দর্যের অমোঘ টান এড়ানো খুব মুশকিল। ঘুরে এসে কলম ধরলেন সুচিত্রা দাস।

গত ক্রিসমাসে বেরিয়ে পড়েছিলাম নেপলসের উদ্দেশে... গন্তব্য মাউন্ট ভিসুভিয়াস।

রোম থেকে যাত্রা শুরু করব। সেইমতো সকাল-সকাল তেরমিনি স্টেশন থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে পৌঁছে গেলাম নাপোলি সেন্ট্রাল। ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে ট্রেনে। স্টেশনের পাশেই একটা হোটেলে লাগেজ রেখে রওনা দিলাম ভিসুভিয়াসের পথে। একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। রাস্তায় যেতে যেতেই টের পেলাম শরীর-মনে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছি। যদিও এই প্রথম দেখা নয় ভিসুভিয়াসের সঙ্গে। এর আগে ২০১০ সালে গিয়েছিলাম। এবারে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র আমার কন্যা। এত কাছ থেকে আগ্নেয়গিরি দেখার রোমাঞ্চ সেও তখন আর ধরে রাখতে পারছে না!

ইতালির ক্যাম্পানিয়া নামে একটা জায়গায়, পাশাপাশি অনেকগুলো আগ্নেয়গিরির অবস্থান, যাদের একত্রে বলা হয় ক্যাম্পানিয়ান আগ্নেয়গিরি আর্ক (চাপ)। এই আর্কের একাধিক আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি ভিসুভিয়াস। নেপল্স থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার পূর্বে, সমুদ্র উপকূলের খুব কাছে এর অবস্থান। দেখতে বৃহৎ শঙ্কুর মতো, যা আংশিকভাবে একটি সামিট ক্যাল্ডেরার খাঁড়া রিম দ্বারা বেষ্টিত। শোনা যায়, পুরনো এবং মূলত অনেক উঁচু একটা কাঠামোর পতনের কারণে ভিসুভিয়াসের এই গঠনটা তৈরি হয়েছিল।

ভিসুভিয়াসের স্থানীয় নাম ভেসুভিয়ো। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে এটি একমাত্র আগ্নেয়গিরি, যাতে



নেপল্‌সের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ

বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। যদিও সৌভাগ্যবশত, বর্তমানে এটি থেকে কোনও অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে না (এতে সর্বশেষ অগ্নুৎপাত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে), তবুও এখনও এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরি হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এই আগ্নেয়গিরির যথেষ্ট কাছাকাছি বাস করেন অন্তত ৩০ লাখ মানুষ। এদের মধ্যে অন্তত ৬ লাখ রয়েছেন অতি বিপজ্জনক অঞ্চলে, যার ফলে এটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ভয়ানক হিংস্র ভাবে বিস্ফোরক অগ্ন্যুৎপাতের একটা প্রবণতা এই আগ্নেয়গিরির রয়েছে, যার পোশাকি নাম 'প্লিনিয়ান অগ্ন্যুৎপাত'। ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ আছে, ৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে রোমান শহর পম্পেই, হারকুলানিয়াম, ওপ্লোন্টিস, স্ট্যাবিয়া এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায়। বিধ্বংসী সেই অগ্ন্যুৎপাত প্রায় ৩৩ কিলোমিটার (২১ মাইল) উচ্চতায় পাথর, ছাই এবং গ্যাসের মেঘ ছুড়ে দিয়েছিল সেবার। প্রতি সেকেন্ডে বিপুল হারে গলিত শিলা বেরিয়ে এসেছিল আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে। ভিসুভিয়াসের সে দিনের বিস্ফোরণে এক হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছিলেন বলে মনে করা হয়, যদিও মৃতের সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায়নি।

নাপোলি সেন্ট্রাল থেকে দু'মিনিট হাঁটা পথে



পিয়াজ়া গারিবাল্ডি স্টেশন। লোকাল ট্রেনে টিকিট কেটে উঠে পড়লাম। নামতে হবে ভেসুভিয়া স্টেশন থেকে তিন-চার স্টপ আগে, এরকোলানো স্কাভি স্টেশন। ভাড়া নিল মাথাপিছু এক ইউরো চল্লিশ সেন্ট। এতটা আগে নেমে পড়ার কারণ, গত দু'বছর ধরে করোনার জন্য ভেসুভিয়ো স্টেশনের কাছের টিকিট কাউন্টারটি বন্ধ। অগত্যা নামতে হল আগের স্টেশনে। এরকোলানো স্কাভি স্টেশন থেকে বেরলে পাশেই টুরিস্ট অফিস। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে আধঘণ্টার মধ্যেই ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির প্রবেশপথে পৌঁছে গেলাম। ড্রাইভার বলে দিলেন দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। গাড়ি থেকে নেমে শুরু করলাম হাঁটা। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে, মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, মাউন্ট ভিসুভিয়াসে চড়া আদৌ নিরাপদ কিনা। উত্তরে বলি, ভিসুভিয়াস পর্বত আরোহণে বিপদের আশঙ্কা নেই। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি হলেও, পথ চলতে চলতে হঠাৎ করে লাভা উদ্‌গীরণ শুরু হবে, তেমনটাই নয়। স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি, এই ধরনের কোনও বিপজ্জনক কার্যকলাপ হওয়ার আগেই তার আভাস পাওয়া যায় এবং তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা-সংকেতের ব্যবস্থাও রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে অন্তত দু'সপ্তাহ আগে থেকেই অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস পেয়ে যান সকলে।



দুর্গম, রুক্ষ পাহাড়ি পথ



ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস

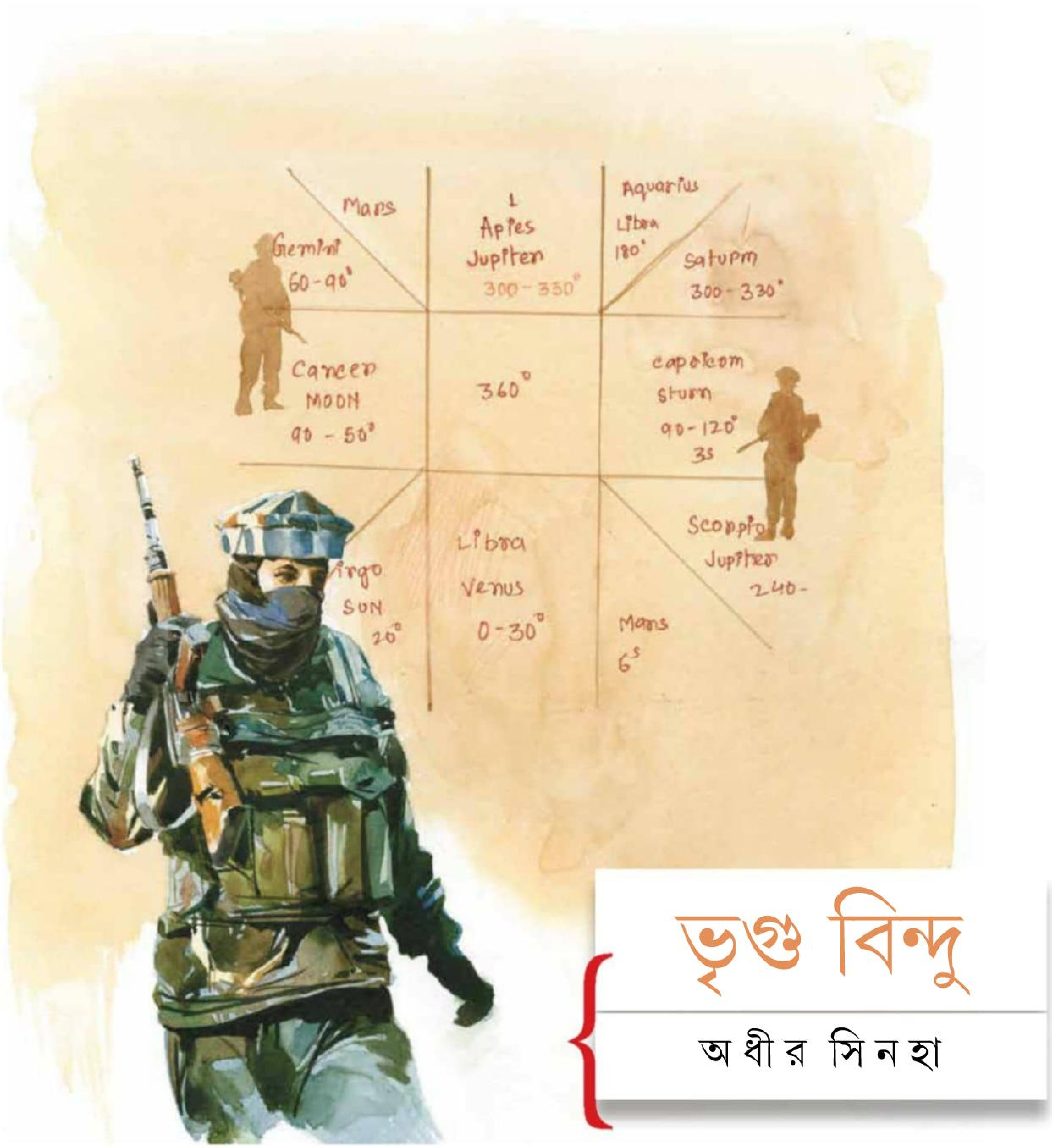
তবে এই পাহাড়ে বিপদের চেতনার আড়ালে এখনও অনেক রোমাঞ্চ রয়েছে। যে কারণে ভিসুভিয়াস আরোহণ একটি সাধারণ পর্বতারোহণের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দদায়ক।

ক্যামেরায় শাণ দিতে দিতেই পাহাড় ভেঙে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম। প্রচণ্ড খাড়াই পথ। ডিসেম্বরের ভয়ংকর ঠান্ডাতেও দেখি দরদর করে ঘামছি সকলে। ভালই কষ্ট হচ্ছিল! কিন্তু অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছিল পুরো পথেই। পাগলের মতো আনন্দ হলে কী হবে, পাহাড়ের উঁচুতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রাও কমছিল। পথ চলতে চলতে তাই বারে বারে না দাঁড়িয়েও উপায় নেই। একটা সময় মনে হচ্ছিল, আর বোধ হয় পৌঁছতে পারব না। হাতে অনন্ত সময়ও নেই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার নীচে ফিরে যাওয়ার শর্ত আরোপ করা আছে। কিন্তু পৌঁছতে যে আমাকে হবেই। সে



এক অমোঘ আকর্ষণে আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। মনের মধ্যে অদ্ভুত সেই ভাললাগা।
সমস্ত রাস্তা ছোট ছোট নুড়িপাথরে ভর্তি। ফলে পায়ে ফ্যাশনেবল হিল জুতো থাকলে পথ হাঁটা অত্যন্ত দুর্গম, পা হড়কে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তীব্র। আমার পায়ে আমদায়ক স্নিকার্স, কষ্টের পথ হলেও হাঁটতে অসুবিধা হল না। পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছতে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লাগল। শেষ যাত্রী আমি, সবাই আমার আগেই যাত্রা শেষ করে ফেলেছে। উঠে দেখি মেয়ে আর তার বাবা, দিব্যি সেলফি তুলতে ব্যস্ত! খুব ইচ্ছা করছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লাইভ ভিডিয়ো করে সবার সঙ্গে এই সুন্দর মুহূর্তটা শেয়ার করি। কিন্তু নেটওয়র্ক নেই। অগত্যা প্রাণভরে ভিডিয়ো আর স্টিল ছবি তুলে রাখলাম ছোট্ট যন্ত্রটিতে।
উপর থেকে পুরো শহরটাকে কী যে সুন্দর লাগছিল! সারা শরীরে-মনে তখন এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি, সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, এত কাছ থেকে আগ্নেয়গিরি দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে। সৌভাগ্যই বলছি কারণ আগ্নেয়গিরিও যে এরকম ভাবে আকর্ষণ করতে পারে, সেটা কল্পনার অতীত ছিল। আগ্নেয়গিরির মুখের চারপাশ থেকে এখনও ধোঁয়া বেরিয়ে চলেছে। চূড়া থেকে সেই দৃশ্যের ছবি তুলে নিলাম চটপট। প্রাণভরে প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করলাম। প্রায় আধঘণ্টা উপরে কাটিয়ে এবার আবার নামার পালা। মাঝে গলা ভিজোতে কফি খাওয়া হল। আসলে সেই বাহানায় যতটা বেশি সময় থাকা যায় আর কী!
উপরে দু'টো ছোট-ছোট স্ন্যাক্সের দোকান ছিল। সেখানে চিপ্স, চকোলেট, বিস্কিট, কফি, নানা রকমের ওয়াইন আর বিয়ার পাওয়া যায়। টুকটাক কেনাকাটা সেরে নামার পথ ধরলাম। নামতে সময় কম লাগে, খাটনিও কম। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে যে পথ উঠেছিলাম, নামতে সময় লাগল আধঘণ্টারও কম। যদিও ততক্ষণে দেড় ঘণ্টার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে ঘড়ির কাঁটা। একটু ভয়ে ছিলাম, নেমেই বুঝি ড্রাইভারদাদার লাভাবর্ষণ শুনতে হবে। বা হয়তো দেখব, গাড়ি আমাদের না-নিয়েই রওনা দিয়ে দিয়েছে!
নাহ, গাড়ি যেখানে থাকার সেখানেই। নেমে দেখি, ড্রাইভারদাদাও দিব্যি খোশ মেজাজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখে-মুখে রাগের লেশমাত্র নেই। আর সময় নষ্ট না করে ফেরার পথ ধরলাম। ফিরতে ফিরতেও শুধু ভিসুভিয়াসকে নানা ভাবে ক্যাপচার করে গিয়েছি। জানি, এই জায়গা সম্পর্কে বলতে পারব না যে, আসছে বছর আবার হবে। কিন্তু একবার দেখলে যে বারবার দেখতে ইচ্ছে করবে, তা নিশ্চিত। তাই ওর কাছে ফিরে আমি যাবই। পাক্কা প্রমিস ভিসুভিয়াস!

ছবি: লেখক



ভৃগু বিন্দু

অধীর সিনহা

বছর পাঁচেক আগে থেকেই ছেলেটা উচ্ছন্নে গিয়েছে! দিন রাত মস্তানি, পাড়ার ক্লাব আর পার্টি করে বেড়ায়। ছোটবেলায় মেধাবী ছাত্র ছিল। ভাল নাম ছন্দক, ডাক নাম ছন্দ। জ্যোতিষাচার্য বিদ্যাধর চক্রবর্তী মহাশয় এই নাম পছন্দ করেন জন্মের সময়। ছন্দক ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের সারথি। তিনি ভগবান বুদ্ধ হওয়ার আগে, সিদ্ধার্থকে প্রাথমিক ভাবে জাগতিক দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। পাড়াপড়শি বলত, সার্থক নাম রেখেছেন বাবা-মা— ছন্দক। আদর্শ ছাত্র এবং পুত্র। মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করতেন বাবা।

যত দিন যেতে লাগল, ছন্দ পড়াশুনা থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। বদসঙ্গে পড়ে নেশা ধরল... মস্তানি শুরু হল। স্কুল ছাড়তে বাধ্য হল ছন্দ, দলবল নিয়ে মারপিট করার কারণে। কোন অভিজ্ঞ চেলা তাকে একদিন খবর দিল, "গুরু, ইউটিউবে দেখলাম একটা বেলাক হোয়াট ছবি। সেখানে বাংলার বিখ্যাত মস্তান ছিল ছেনো। নামটা বেড়ে মানাবে তোমাকে। আমরা তোমাকে ওই নামেই ডাকব।"

ছন্দ হল ছেনো। চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এনে, হাবেভাবে, রোয়াবে সে বারাসত শহরতলির ছেনো মস্তান হয়ে উঠল। ছেনোর এখন ইচ্ছা তার বাবা ঘর ছেড়ে, সেন জুয়েলারিতে বসে জ্যোতিষগিরি করুন। অনেক রোজগার হবে, অভাবের সংসারে কাজে লাগবে। বিদ্যাধর চক্রবর্তী মহাশয় জানেন, এতে তার মায়েরও প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে।

কিন্তু জ্যোতিষাচার্য বিদ্যাধর চক্রবর্তী মহাশয় এই ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি নন। "ও সব লোকঠকানো ব্যবসায়ের ভাগিদার আমি হতে পারব না," পরিষ্কার বলে দিয়েছেন তিনি।

বছর দুয়েক আগে জ্যোতিষাচার্যকে এই ধরনের প্রস্তাব দিতে কেউ সাহস করত না। কিন্তু করোনা দিনকাল বদলে দিয়েছে। অবশ্য বদল আসছিলই ধীরে ধীরে, জ্যোতিষাচার্য মহাশয়ের গায়ে তার আঁচও লাগছিল। একটা ঠিকুজি তৈরি করতে তাঁর

যেখানে সাত দিন লেগে যায়,সেখানে কম্পিউটার পাঁচ-সাত মিনিটে তা প্রিন্ট করে দিয়ে দেয়। রেডিমেডের যুগ, মানুষের হাতে অত সময় নেই অপেক্ষা করার। কয়েক বছর আগেও বিয়ের মরসুম আসার আগে কুষ্ঠি মেলানোর জন্য তাঁর বাড়ির সামনে বাবা-মায়েরা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দুই পক্ষের কুষ্ঠির আঠারো গুণের তুলনা বিচার করে তিনি রায় দিতেন। সকলে একবাক্যে তাঁর রায় বিশ্বাস করত।
আজকাল ঝকঝকে চেম্বারে, নতুন ল্যাপটপে জ্যোতিষীরা তা কয়েক মিনিটে করে দেয়।
সেন জুয়েলারির মালিক আদিত্য সেন নিজে এসেছিলেন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে, প্রস্তাব নিয়ে।
''বিদ্যাধর চক্রবর্তী মশাই, আসুন আমাদের জুয়েলারি হাউসে। আপনার আলাদা চেম্বার থাকবে। টেবিলে ল্যাপটপ রাখা থাকবে। আপনার নাম এবং উপাধি সহ বড় বড় করে বাইরের বোর্ডে লেখা থাকবে, জ্যোতিষাচার্যের বিচার অনুযায়ী যাচাই করা আসল গ্রহরত্ন কিনুন। নীচে অবশ্য ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোট করে লেখা থাকবে, শর্তাবলী প্রযোজ্য। গ্রাহকরা যা ফি দেবে তা আপনার, আর গ্রহরত্ন যা বিক্রি হবে তারও বিশ শতাংশ আপনার।''
চক্রবর্তী মহাশয় রাজি হননি। সেনবাবু এতটাই মনক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন যে তিনি তার সব সময়ের সঙ্গী, সোনাবাঁধানো পুরীর লাঠিটাই ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। চক্রবর্তী মশাইয়ের মেয়ে রেবতী পরে গিয়ে সেটা দিয়ে আসে।
চক্রবর্তী মহাশয়ের সাফ কথা, ''আমি লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করতে পারব না। গ্রহরত্ন যা ওঁরা রাখেন, তা বেশিরভাগই খাঁটি নয়। তাই জেনেশুনে এই পাপের ভাগী আমি হতে পারব না।''
চক্রবর্তী মশাই রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হল, ঘরে কেউ এসেছে। গোটা ঘর মদের গন্ধে ভরে গিয়েছে। চক্রবর্তী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, ''কে? কে?'' সাদা পোষাকে কেউ সামনে দাঁড়িয়ে।
''আমি ছেনো বা-ও-য়া, নি-জে-র ছেলেকে দে-খে কেউ ভয় পায়?'' তাঁর মাতাল জ্যেষ্ঠপুত্র বিছানার কোণে ধপ করে বসে পড়ল। এ অবশ্য নতুন কিছু ঘটনা নয়!
''বাওয়া, তো-মা-র পায়ে ধরছি মা-ই-রি। জুয়েলারি হাউসে কাল থেকে যাবে আর বসবে। ওরা অ-নে-ক টাকা দেবে।''
ছেনো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।
''স-রি, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম। তোমার আবার ওঠার সময় হয়ে গে-ল। গু ড না- ই ট।''
''শোন ছন্দ, ভেতরের ঘরে যাস না। তোর মা আর রেনু ঘুমোচ্ছে। বাইরের তক্তপোশে শুয়ে পড়।''
''ব-স, এখানে আমার ঘু-ম আ স বে না।'' ছন্দ বেরিয়ে গেল।
বিদ্যাধরবাবু মশারি খুলে আলো জ্বেলে দিলেন। ছন্দর কুষ্ঠি আর একবার বের করে চোখ রাখলেন তার ভৃগু বিন্দুতে। কোথাও ভুল করেছিলেন মনে হয়। খুঁটিয়ে পড়লেন, না ভুল নেই কোথাও। তবে এরকম অমানুষ তৈরি হল কেন? হয়ত ওর জীবনে আসবে একটা প্রলয় ঝড়, যা ঘুড়িয়ে দেবে ওর জীবনের মোড়। অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। পেন্ডুলাম ঘড়িতে ডং ডং ডং করে রাত তিনটে বাজল। জ্যোতিষাচার্য আর বিছানায় গেলেন না। আজও একটি কুষ্ঠির বাকি কাজ শেষ করতে মন দিলেন— সকাল দশটায় আসবে নিতে। ভৃগু বিন্দু চিহ্নিত করার পর তার ব্যাখ্যা দিয়ে কুষ্ঠির কাজ তিনি সমাপ্ত করলেন।
সকাল দশটায় পঞ্চাননবাবু এলেন। চক্রবর্তী মশাই হলুদ কাগজে রোল করা কুষ্ঠি তাঁর হাতে তুলে দিতে গেলে, তিনি হাত দেখিয়ে থামতে বললেন।
মুখের পানের পিক বাইরে ফেলে এসে বললেন, ''আপনার দেরি হতে পারে ভেবে আমি পাশের ল্যাপটপ জ্যোতিষীর কাছ থেকে কাল এই কুষ্ঠিটা করালাম পঞ্চাশ টাকায়। দেখুন, দু'পাতায় কুষ্ঠি শেষ। প্রথম পাতায় ছক আর পরের পাতায় প্রতিকার। সোজা হিসাব। পাঁচ রতির প্রবাল আর পলা, দুটি রত্ন নিতে হবে। উনিই এনে দেবেন বললেন। খুব ভাল লোক। দেখি আপনারটা, কী লিখেছেন?''
পঞ্চাননবাবু চক্রবর্তী মহাশয়ের করা কুষ্ঠির কাগজ খুলে পড়ার চেষ্টা করলেন।
''আপনি কুষ্ঠিতে এই সব ভৃগুফিগু আবার বিন্দুফিন্দু, কী সব যে ছাইপাঁশ যে লেখেন— এগুলো কী জিনিস? এই সব বিন্দুফিন্দু কি আর এখন মনে আছে? জ্যামিতিতে সেই কবে যেন পড়েছিলাম মনে হয়।''
''যাহার কেবল অবস্থান আছে, দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা বা বেধ কিছুই নেই, তাকে বিন্দু বলে। আবার ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে সব সময় সমান দূরত্ব রেখে অন্য বিন্দু যদি এক বার ঘুরে আসে, তবে আমরা কী পাই?''
''কী পাই, আপনিই বলুন?''
''বৃত্ত,'' হা হা করে হেসে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য। পঞ্চাননবাবু মনে মনে ভাবলেন, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গিয়েছে যা হোক! কুষ্ঠি করছেন না জ্যামিতি পড়াচ্ছেন? চক্রবর্তী মশাই তাঁর মনের ভাব আঁচ করে বললেন, ''আপনি আমাকে পাগল ভাবছেন আমি জানি। তবে জেনে রাখবেন ভৃগু বিন্দুর অবস্থানই আমাদের জীবনের আসল ব্যাপার। আমরা সকলে জন্মগ্রহণ করি একটা নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য। এ জন্মে যদি সেই কাজ শেষ না করতে পারেন, পরের জন্মে আপনাকে সেই কাজ শেষ করার জন্য আবার পৃথিবীতে আসতে হবে। জন্মের ছকে একে নির্দিষ্ট জায়গায় পাওয়া যায়, সেটাই আমি চিহ্নিত করে দিই। এই নির্দিষ্ট জায়গা হল চন্দ্র আর রাহুর মধ্যবিন্দুতে। একেই ভৃগু বিন্দু বলে।ভৃগু ঋষির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বিন্দু যে ঘরে আছে তা বলে দেবে আপনি কী কাজের জন্য এসেছেন পৃথিবীতে। এটি আপনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করবেই।''
পঞ্চাননবাবুর মাথা হেলানো আর চোখের চাউনি দেখে বোঝা গেল, তিনি এ সব বিন্দুমাত্র বোঝেননি বা বুঝতে চান না। মুখে বললেন, ''ও, আচ্ছা আচ্ছা।''
তারপর কুষ্ঠির কাগজ গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন যাওয়ার জন্য। আবার দরজার কাছ থেকে ফেরত এলেন।
''এই দেখুন কী ভুলো মন আমার, পয়সা না দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। এই নিন একশো টাকা। অনেক খরচা হয়ে গেল।''
ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন চক্রবর্তী মহাশয়। কম্পিউটার হরোস্কোপ যেখানে পঞ্চাশ টাকায় হয়ে যায়, সেখানে একশো টাকা দিয়ে কুষ্ঠি করাতে লোকে কেন তাঁর কাছে আসবে?
''চক্রবর্তী মহাশয়, কী এত ভাবছেন? পায়ের ধুলো দিন।''
দরজার বাইরে থেকে উদাত্ত কণ্ঠের সম্ভাষণ শুনে তাকালেন।
''আরে জগন্নাথবাবু, আসুন আসুন।'' জগন্নাথবাবু ওপরে উঠে এলেন।
''সুখবরটা দিতে এলাম, আপনার তৈরি কুষ্ঠি এবং কুষ্ঠি-মেলানো পাত্রের সঙ্গে চার বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছিলাম। সুখে আছে তারা। ফুটফুটে নাতি হয়েছে। তাই মিষ্টি নিয়ে এলাম। না বলবেন না কিন্তু।''
জগনাথবাবু টেবিলের ওপর মিষ্টির হাঁড়ি রাখলেন।
''আপনার ওই ভৃগু বিন্দু নজরে রেখে চলছি। অতুলনীয় জন্মকুণ্ডলি করেছেন। কিন্তু একটা জায়গায় একটু খটকা লাগছে। নিয়ে আসব সময় পেলে। একটু বুঝিয়ে দেবেন।''
''নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেব, যখন মনে হবে চলে আসবেন।''

''নাতির নামকরণ ও কুণ্ডলি আপনাকেই করতে হবে। দিনক্ষণ সব এই কাগজে লিখে এনেছি।''
চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখে তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য ফিরে এল।
''নিশ্চয়ই ,নিশ্চয়ই, আপনি পরশুদিন নিয়ে নেবেন।''
মিনতি দেবী পর্দার আড়ালে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। এবার বাইরে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, ''বাজারে যাও একবার, অনেকদিন মাছের মুখ দেখেনি কেউ। ছেলেমেয়ের জন্য একটা মাথা অন্তত আনো।''
চক্রবর্তী মশাই থলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুটো বাড়ি পরেই ঝাঁ- চকচকে কালো কাচের দরজা, ল্যাপটপ জ্যোতিষীর দোকান। ইংরেজিতে সাইনবোর্ড— হরোস্কোপ ইন ফাইভ মিনিটস। বেশ ভিড়। চক্রবর্তী মশাই হনহন করে এগিয়ে গেলেন।
সেদিন ছন্দ একরাশ অভিযোগ নিয়ে বাবার সামনে বসে পড়ল। না, সেন জুয়েলারি নিয়ে নয়— সবে কুড়িতে পা দেওয়া তার বোন রেবতীকে নিয়ে। আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো চেহারা, মাজা রং, দোহারা গড়ন। নরম স্বভাবের, নজরুলগীতি গাইতে ভালবাসে।
''বস, রেবুকে ভাল করে কড়কে দাও। আমার কথা শুনছে না। বেপাড়ার একটা ছোকরা, দীপ্ত নাম। কলেজে তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি চলছে। ছেলেটাকে হাতে পেলে মাইরি ঘাড় মটকে দেব।''
চক্রবর্তী মহাশয় উত্তর না দেওয়াই শ্রেয় ভাবলেন।
''কী বস, মুখে কুলুপ কেন? রেবু ছেলেটার সঙ্গে কিছু কেলেঙ্কারি করে ভেগে গেলে আমায় দোষ দিও না যেন, বলে গেলাম।''
ছন্দ চলে গেল। রেখে গেল একরাশ ঝাঁঝ।
চক্রবর্তী মহাশয় ঢক ঢক করে জল খেয়ে ফেললেন। লম্বা শ্বাস নিলেন। এতদিনের সযত্নে রক্ষা করা চক্রবর্তী পরিবারের মানমর্যাদা চোখের সামনে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।
''ছন্দর মা, এদিকে শুনে যাবে একবার।''
''কী হল? এত হাঁকডাক কেন?'' মিনতি দেবী কাছে এসে দাঁড়ালেন।
''হওয়ার বাকি কী আছে? মেয়েকে বলবে বাড়ির মান যতটুকু বাকি আছে, সেটা যেন বাঁচিয়ে চলে। কলেজে যাওয়া শিক্ষালাভের জন্য। অভব্য আচরণ দয়া করে যেন না করে। ছন্দ এসেছিল, আমাকে ধমকে গিয়েছে। তোমার মেয়ে কোন বেপাড়ার ছেলের পাল্লায় পড়েছে।''
''বুঝেছি।''
২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে জনজীবন স্তব্ধ। বন্ধ দোকানপাট, অফিস। রুজিরোজগারের পথ রুদ্ধ। এই সময় বিদ্যাধর চক্রবর্তী মহাশয় ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন। ছন্দ দাদাগিরি করে বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সময় পায় না। রাজনৈতিক দলাদলিতে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মিনতি দেবী বাধ্য হয়ে দীপ্তকে খবর দিলেন। দীপ্ত অ্যাম্বুলেন্সে চক্রবর্তী মহাশয়কে নিয়ে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে ডাক্তারদের পায়ে ধরল।
''চক্রবর্তী মশাইকে একটা বেডে ভর্তি করে নিন।''
গভর্নমেন্ট হাসপাতালে বেড পাওয়া গেল না।
এই অবস্থায় চক্রবর্তী মশাইকে বাঁচাতে গেলে বেশ কিছু টাকা লাগবে। ধারদেনা করে বেসরকারি হাসপাতালের খরচা মিটিয়ে, দীপ্ত ছন্দকের বাবাকে সুস্থ করে ঘরে ফিরিয়ে আনল। কিন্তু ছন্দকের দেখা নেই। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে! তার নিজের আর বিরোধী দল হন্যে হয়ে খুঁজেও হদিস তার পেল না।
এই অবস্থায় দীপ্ত চক্রবর্তীবাড়ির হাল ধরে। রেবতীর আর মিনতি দেবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। বিদ্যাধর চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে বসে, তাঁর খবর নিয়ে যায়। এ পাড়ায় এখন সে বেশ পরিচিত মুখ, নানা সাহায্য এলাকাবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়। ভাইরাসের প্রকোপ কমে এলে একদিন রেবুর মা দীপ্তর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা তুললেন। কিন্তু বিদ্যাধর চক্রবর্তী মশাই তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। কুষ্ঠি না মিলিয়ে তিনি বিয়ে দেবেন না। তা ছাড়া এই আর্থিক সংকট আর মহামারির আবহাওয়ায় বিবাহ না হওয়াই ভাল।
''আচ্ছা বিয়ে না হয় না দিলে, কিন্তু ছেলেটা অনেক টাকা তোমার চিকিৎসার জন্য খরচ করেছে। তার কিছু অন্তত ফেরত দেওয়ার উপায় ভাব।''
চক্রবর্তী মহাশয় চিন্তা করে বললেন, ''রেবুকে বল সেন জুয়েলারিতে ফোন করতে। ভাবছি সপ্তাহে তিনদিন ওদের শো-রুমে বসব। তবে ওই কম্পিউটারে করা কুষ্ঠি আমি আমার মতো শুদ্ধ করে, দেখে, তার পর ছাড়ব আর গ্রহ রত্নের কাগজে আমি কিছু লিখতে পারব না। জানিয়ে দিতে বল এই মত। আমি পরে গিয়ে কথা বলে আসবে।''
''আমি এখনই বলে দিচ্ছি।''
রেবতীর মার মুখে হাসি ফুটে উঠল।
কয়েক মাস পর বিদ্যাধর চক্রবর্তীর নামে মানি অর্ডার আসতে বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল।
''না হরিলাল, আমার জন্য এটা নয়। কস্মিনকালে আমাদের বাড়িতে কেউ টাকা পাঠায়নি, পাঠাবার লোক নেই। ভাল করে দেখ।''
''কী মুশকিল! এই তো তোমার নাম লেখা। প্রেরকের ঠিকানায় লেখা আছে লাদাখ আর্মি পোস্টাল সার্ভিস। এসেছে কলকাতা এ পি ও ৯৯ থেকে।''
একটু পরেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, যখন রেবুর মোবাইলে ফোন এল, ''শোন আমি ছন্দ, তোর দাদা বলছি। ব্যারাকপুরে লুকিয়ে ছিলাম। সেখান থেকে আমি সেনায় ভর্তি হতে পেরেছি। ওখানে সেনা দপ্তরে লোক নেওয়া হচ্ছিল। আর এক মাস পরে আসলে বয়স পেরিয়ে যেত। যখন বাড়ি আসব, সব গল্প খুলে বলব। ট্রেনিং শেষ হয়েছে। আমি এখন ১৬ রাজপুত রেজিমেন্টের রাইফেলম্যান। মাইনে পেয়ে দশ হাজার টাকা পাঠিয়েছি। পেলে এই নম্বরে বলিস।''
ছন্দর মা খবর শোনা অবধি অনুতাপ করছেন। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত গোলাগুলির মুখে দাঁড়িয়ে দিন কাটাবে!
বিদ্যাধরবাবু এটা আশা করেননি। পাড়ার দলাদলি থেকে পালিয়ে সেনাবাহিনিতে যোগ দেওয়া? তবুও কষ্ট ভুলে বাড়িতে অনেকদিন পর সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ছন্দ দেশের সেবা করে রোজগার করছে, এটাই বড় কথা।
চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে রেবুর মা আবার মেয়ের বিয়ের কথা তুললেন। তাঁর সেই এক কথা, ''তোমার মেয়ে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে, কিন্তু এক শর্তে। কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখব আমি। ছেলের ভৃগু বিন্দু কোথায়, দেখতে হবে।''
''দীপ্ত খুব ভাল ছেলে। বিপদে-আপদে ও-ই এখন আমাদের ভরসা। ছেলেটা তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। তুমি এখন তার কুষ্ঠি বিচার করবে?''
''তার জন্য আমি ওর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে কুষ্ঠি আর ভৃগু বিন্দু মেলাতেই হবে। এর কোনও নড়চড় হবে না।''
''আচ্ছা, তুমি কি ওই বিন্দুর বাইরে আসবে না? জগৎ অনেক বদলে গিয়েছে... রোজই বদলাচ্ছে।''
''আমি অমত করছি না। মেয়েকে বলো, ছেলের জন্মক্ষণ ইত্যাদি কাগজে লিখে দিতে। খুব তাড়াতাড়ি আমি মিলিয়ে দেখে নেব।''
পরদিন সকালে দীপ্ত এল, ডান কাঁধ নিচু করে প্রণামের চেষ্টা করল। এটাও আজকাল কতজন করে? ভটচাজ মশাই একবার মুখ তুলে তাকে দেখলেন।
'' তুমি ভেতরে যাও, আমি এখন ব্যস্ত আছি। পরে কথা বলব।''
দীপ্ত নিঃশব্দে একটা প্যাকেট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে রেবুর মা ঢুকলেন,প্যাকেট তুলে নিয়ে বললেন, ''ছেলেটা বাড়ি বয়ে এসে মিষ্টি দিয়ে গেল একবার

বসতেও বললে না?''
''বসার কী আছে? আমায় ওর জন্মের দিনক্ষণ, জায়গা এসব দিলে না এখনও। কুষ্ঠি কী করে বানাব?''
''সে তুমি সারা জীবন ধরে বানিও। দীপ্ত রেলে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তাই মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। আমায় প্রণাম করে বলে গেল।''
বিদ্যাধর চক্রবর্তী মশাই তাকালেন। মিনতি দেবী ততক্ষণ ভেতরে চলে গিয়েছেন।
''রেবুর মা, রেবুকে একবার আসতে বলো আমার কাছে।''
একটু পরে রেবু এসে দাঁড়াল। লম্বা বিনুনিটা হাতে নিয়ে একবার সামনে, একবার পিছনে করতে লাগল ।
''তুই কি পারিস দীপ্তর জন্মের দিনক্ষণ জেনে আমায় বলতে? রেলে যখন চাকরি পেয়েছে, বার্থ সার্টিফিকেট নিশ্চয়ই আছে।''
''বাবা আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি বরং দীপ্তকে বলছি তোমার সঙ্গে কথা বলতে।''
পরদিন দীপ্ত এল। চক্রবর্তী মশাই জন্মের দিনক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে মাথা নামিয়ে বসে থাকল।
''মেসোমশাই আমার মা বেঁচে থাকলে সব বলতে পারতেন। উনি গত বছর মারা গিয়েছেন। বাবা তারও আগে মারা গিয়েছেন। কাকাদের কাছে থাকি। পঞ্চায়েত থেকে বার্থ সার্টিফিকেট করানো হয়েছিল কাজের জন্য। কাজেই আমার সঠিক দিনক্ষণ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে আমি এই দেশেই জন্মেছি।''
চক্রবর্তী মশাই গুম হয়ে বসে থাকলেন। দীপ্ত চলে গেল।
একটু পরে রেনু ফোন হাতে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল।
''তুই দীপ্তকে কাল আসতে বল।''
দীপ্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে নতুন চাকরিতে জয়েন করার শুভ তারিখ জেনে গেল। পোস্টিং গালুডি স্টেশন, কেবিন ম্যানের ডিউটি। এখন ট্রেনিং হবে তিন মাস। থিতু হয়ে ওখানে কোয়ার্টার ঠিক করে কয়েক মাস পরে আসবে। তখন বিয়েটা সেরে ফেলতে চায়।
ছন্দ সুযোগ পেলেই ফোন করে মা, বাবা, বোনের সঙ্গে কথা বলে। লাদাখ-চিন সীমান্তে ভারতীয় সেনা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গালোয়ানে হাতাহাতি লড়াইয়ের খবরে প্লাটুনের সকলে মুখিয়ে আছে, তারা কবে সুযোগ পাবে সীমান্তে যাওয়ার। ছন্দর ভাষায়, ''একটার অন্তত ঘাড় যদি মটকাতে পারতাম!''
ছন্দ বোনকে আরও বলে, ''আগে নিজের পাড়া, বেপাড়া নিয়ে ঝগড়া করতাম, মস্তানি করতাম। সকলে ভয় পেত, এখন সকলে নিশ্চয়ই বলছে, আপদ গিয়েছে, বাঁচা গিয়েছে। কয়েকদিন পরে সকলে আমায় ভুলে যাবে। যাক ভুলে, এখন অনেক বড় দায়িত্ব আমাদের ওপর, দেশের সীমান্ত রক্ষার। যাক ও সব কথা, তোর বিয়ের তারিখের অন্তত একমাস আগে জানাবি। ছুটি মঞ্জুর হতে বেশ সময় লাগে। মোবাইলে ছবি পাঠালাম সেনার পোশাকে, হাতে রাইফেল কেমন চমকাচ্ছে দেখবি।''
কিছুদিন পর থেকে ফোন বেশ দেরিতে আসতে লাগল। দুশমনদের মুখোমুখি সীমান্তে অতন্দ্র নজরদারি চলছে তখন। মোবাইল ব্যবহারের অনুমতি নেই সেখানে। হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রায় তাঁবুতে রাত কাটাতে হয়। ছন্দক তার জন্য চিন্তা করতে বারণ করে। এখন তাকে লুকিয়ে, পালিয়ে বাঁচতে হয় না।
ওদিকে দীপ্ত আর রেবুর বিয়ের তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে। রেবুর জেদ, দাদা না এলে বিয়ে হবে না। কোভিডের প্রকোপ অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাধানিষেধ শিথিল হয়েছে। কিন্তু ছন্দককে খবর দেওয়া যাচ্ছে না।
শেষ ফোন এসেছিল, যখন সে কনভয়তে ছিল। ওদের কাশ্মীর সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পৌঁছে ফোন করার কথা। তখন রেবুর বিয়ের তারিখ জেনে ছুটির দরখাস্ত দেবে।
আলিপুর ইস্টার্ন কমান্ড থেকে রাতে রেবুর ফোনে ছোট্ট এস এম এস এসেছিল, "শ্রীমান ছন্দক চক্রবর্তী হ্যাজ অ্যাটেন্ড মাটারডম হোয়াইল ইন অ্যাকশন।"
রেবু কান্নায় ভেঙে পড়ল। দীপ্ত বারাসতেই ছিল। পরদিন আলিপুর কমান্ড অফিস থেকে ক্যাপটেন মিশ্র এলেন জি-ও-সি'র সই করা শোকবার্তা নিয়ে। টিভিতে শহিদ বঙ্গ সন্তান ছন্দকের খবরের সঙ্গে দেখানো হচ্ছে কাশ্মীরে সেনা কনভয়ে হামলার রক্তাক্ত দৃশ্য। মরদেহ পরশুদিন দশটার মধ্যে বিমান বন্দর থেকে আর্মি ট্রাক নিয়ে আসবে বলে জানানো হয়েছে। ব্যারাকপুর গঙ্গার ঘাটে শেষকৃত্যের আয়োজন করা হয়েছে। নবান্ন থেকে সরকার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে। ফোন এসেছিল— মন্ত্রী আসবেন, সঙ্গে সাংবাদিকের দল।
বাস্তব আজ কঠিন নির্মম রূপে এসেছে, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য চক্রবর্তী মহাশয় অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধেছেন। তিনি ছন্দর কুষ্ঠিতে দেখেছিলেন জাতকের দেশপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে ছন্দ ভৃগু বিন্দুর সত্যতা প্রমাণ করল।
ব্যারাকপুর গঙ্গার পাড়ে লোকের জমায়েত নগণ্য নয়, বিশেষ করে এই মহামারির সময়। সেনাদের তরফ থেকে ইস্টার্ন কম্যান্ডের মেজর এসেছেন। একটু পরেই দূরে সেনা-বোঝাই এসকর্ট গাড়ি দেখা গেল। পেছনে ফুলে সাজানো ট্রাক,তার পেছনে জনতা। মন্ত্রী এসে গিয়েছেন, সঙ্গে সাংবাদিকের দল। তাদের কয়েকজন এগিয়ে এল। সেনার জিপ চক্রবর্তী পরিবারকে নিয়ে এসেছে।
ট্রাক থেকে কফিন বাইরে আনা হল। ভেতর থেকে জাতীয় পতাকায় ঢাকা দেহ বাইরে ফুলের মালায় সাজানো একটি অস্থায়ী বেদির ওপর রাখা হল। নীচে লেখা, শহিদ রাইফেলম্যান ছন্দক চক্রবর্তী। জ্যোতিষাচার্য বিদ্যাধর চক্রবর্তী মহাশয়কে দীপ্ত ধরে ধরে নিয়ে গেল।
রুদ্ধ কণ্ঠে রেবু বলল, ''সাবাস দাদা,তুমি বংশের মুখ উজ্বল করলে।''
চক্রবর্তী মহাশয় ও মিনতি দেবী শেষবারের জন্য তাকে দেখতে চাইলেন। ক্যাপ্টেন মিশ্র বারণ করলেন। গুলিতে ঝাঁঝরা দেহ মা-বাবাকে দেখানো ঠিক হবে না। রেবতী মা-বাবাকে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসাল।
মন্ত্রী মহোদয় মালা দিলেন। তারপর আরও অনেকে। চিতার প্রস্তুতি শেষ। পতাকা সরিয়ে সাদা চাদরে ঢাকা দেহ রাখা হল।
রেবু এসে বাবার হাতে হাত রাখল। ''বাবা... সময় হয়েছে, উঠতে হবে।'' চক্রবর্তী মহাশয় তাকিয়ে থাকলেন। শূন্যে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি।
''বাবা মুখাগ্নি করতে হবে, ওঠো।''
রেনু ধরে ধরে বাবাকে নিয়ে চলল চিতার কাছে। পুরোহিতমশাই মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর হাতে একটি জ্বলন্ত কাঠ দিলেন। রুনু বাবার হাত ধরে সেই আগুন চিতায় স্পর্শ করল।
আগুন ধীরে ধীরে লেলিহান হয়ে উঠল।
ধ্বনি উঠল, ''শহিদ ছন্দক অমর রহে, ভারত মাতা কি জয়।''
সারিবদ্ধ মিলিটারিদের কাঁধে দাঁড় করানো ঊর্ধ্বমুখি রাইফেল থেকে কয়েক ঝাঁক গুলি অজানা শত্রুর উদ্দেশ্যে মহা আক্রোশে গর্জন করে শূন্যে হারিয়ে গেল। তারপর রাইফেলের মুখ ধীরে ধীরে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নীচে নেমে এল। জ্যোতিষাচার্য বিদ্যাধর চক্রবর্তী মহাশয় অগ্নিকে সমর্পণ করলেন ছন্দকের কুষ্ঠি।
ভৃগু এখন আর বিন্দুতে সীমাবদ্ধ নেই। অসংখ্য বিন্দু মিলে সৃষ্টি করেছে এক অসীম বৃত্ত, যা মিলে গিয়েছে ওই মহাকাশে। সেখানে বুঝি শোনা যায়, "আমি চিরতরে দূরে সরে যাব, কিন্তু আমারে দেব না ভুলিতে।"

অলংকরণ: কুনাল বর্মণ



রানি পিঙ্ক ও সোনালি চেকসের যৌথতায় হাতে বোনা লিনেন কুর্তা-পাজামার সেট। পুজো আসছে, তাই পোশাকেও উজ্জ্বল রঙের রেফারেন্স।

সিঁদুর লাল, ম্যাঙ্গো ইয়েলো, রানি পিঙ্কের মতো প্রাণবন্ত রং। আর সোনালি জ়রির উজ্জ্বল উপস্থিতি। পুজোর আবহে ডিজ়াইনার পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন কালেকশনের কিছু এক্সক্লুসিভ ছবি।

রঙিন হোক পুজো...



রানি পিঙ্ক কেডিয়া স্টাইল অঙ্গরাখা টপের বিশেষত্ব হল এর গ্যাদারড ওয়েস্ট। স্লিভ কাফের সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি আর হ্যান্ডমেড ব্রাসের বোতাম আলাদা মাত্রা যোগ করছে পোশাকে। সঙ্গে ঘেরওলা সোনালি জ়রি স্কার্ট।



ম্যাঙ্গো ইয়েলো রঙের লিনেন কোঅর্ডিনেটেড সেট। টিউনিক আর প্যান্ট সেটটি আদ্যোপান্ত কমফর্ট ওয়্যার। স্টেটমেন্ট নেকপিস বা ইয়ারিংয়ের সঙ্গে টিম আপ করতে পারেন।



হাতে বোনা সিঁদুর লাল মটকায় জামদানি ড্রেস। ড্রেস হিসেবেও পরতে পারেন, আবার গোল্ড জ়রি পাজামা প্যান্টসের সঙ্গেও টিম-আপ করতে পারেন।

“ভারতের উৎসব মানেই রঙের আতিশয্য। সেই কথা মাথায় রেখেই আমার কালেকশন ‘সাজ’। বরাবরের মতো এবারেও হাতে বোনা ফ্যাব্রিকেই কাজ করেছি। পুজোর সময় বা কোনও অনুষ্ঠানের আগে এধরনের পোশাক পরতে পারেন। আরামদায়ক আবার নান্দনিকও। মটকা আর লিনেনের মেটেরিয়াল...বুঝতেই পারছেন কতটা আরামদায়ক ফ্যাব্রিক। পুজোর সকালের সাজের জন্য লিনেনের আউটফিট, আর শাড়ি বা অঙ্গরাখা টপ সন্ধের সাজের জন্য বেছে নিতে পারেন। সঙ্গে স্টেটমেন্ট জুয়েলারি, ব্যস! গত দু’বছরে আমি দেখছি লোকের শপিংয়ের প্যাটার্নে বদল এসেছে। লোকে এখন এমন পোশাক কিনতে চান, যা অনেকদিন থাকবে। ওয়ার্ড্রোব থেকে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে পরতে পারবেন। রেসপন্সিবল শপিং করেন তাঁরা।”

মডেল: কথা নন্দী
মেক-আপ: ভাস্কর বিশ্বাস
পোশাক: পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগাযোগ: www.paromita-banerjee.com
ছবি: দেবর্ষি সরকার



প্রবাসের প্রসাদ-পাঁচালি



কচুর শাক ও পান্তাভাত

বাংলার বাইরে দুর্গাপুজোর ভোগের পরাতে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে একই রকম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোগের পদে কি ঘটছে বিবর্তন? প্রবাসে ভোগ রান্নার অভিজ্ঞতা থেকে তেমনই কিছু ভোগের পদ সাজালেন ফুড স্টাইলিস্ট ও কালিনারি এক্সপার্ট অনুরাধা দাস।

হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে আরও একটা পুজোর দোরগোড়ায় এসে গেলাম আমরা। বাংলার শহর-গ্রাম-মফস্‌সলে, পাড়ায়-পাড়ায় পুজোর প্রস্তুতিতে চলছে ফিনিশিং টাচ। এ ব্যাপারে কোনওকালেই পিছিয়ে থাকেন না প্রবাসী বাঙালিরাও। আয়োজনে যদি আড়ম্বর না-ও থাকে, দেবী-আরাধনায় তাঁদের আন্তরিকতার ঘাটতি হয় না মোটেই! নিষ্ঠা, ভক্তি এবং মনের শুদ্ধতায় একতিলও পরিবর্তন আসে না। পরিবর্তন— বা বলা ভাল, বিবর্তন— ঘটেছে ভোগের থালায়। চিরকালীন ভোগের পদের পাশাপাশিই সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে চিলি পনির বা স্টার অ্যানিস ফ্রায়েড রাইস। পেঁয়াজ-রসুনের জায়গায় স্বাদ সৃষ্টি করছে আদা, কাঁচালঙ্কা, তিলবাটা, কর্ন বা গাজরের মতো সবজি। নিজেদের প্রিয় পদই রেঁধেবেড়ে দেবীকেও নিবেদন করছেন তাঁরা। আবার চিরাচরিত লাবড়া বা নাড়ু-পায়েসও বাদ যায় না। দশমীর ভোগে তামার পরাতে দেওয়া হয় আলোচালের ভাত আর কচুর শাক— মা যাতে হালকা কিছু খেয়ে ফেরার পথে রওনা দিতে পারেন, সে জন্য। তেমনই কিছু পদ রইল।

কচুর শাক ও পান্তাভাত

উপকরণ: গোবিন্দভোগ চালের ভাত পরিমাণমতো, কচুর শাক ২ আঁটি, মাঝারি নারকেল ১টা (কুরনো), কাঁচালঙ্কা ৪টে, সর্ষের তেল ৫০ গ্রাম, চিনি ১ টেবলচামচ, নুন ১/৩ চা-চামচ।

প্রণালী: গোবিন্দভোগ চালের ভাতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন আগের রাতে। কচুর শাক নুন দিয়ে সেদ্ধ করে, জল ঝরিয়ে রাখুন। সর্ষের তেল গরম করে, নারকেল আর কাঁচালঙ্কা ভেজে, লাল করে নিন। শাক দিন। নুন আর চিনি মেশান। নাড়াচাড়া করে রেঁধে, শুকনো করে নিলেই কচুর শাক তৈরি। এই রান্নায় সর্ষেদানা ব্যবহার করা হয় না। কারণ সর্ষেদানাকে তামসিক মনে করা হয় বলে, তা ভোগের রান্নায় যায় না।

সাদা কপি

উপকরণ: বড় ফুলকপি ৪টে (ডুমো করে কাটা), সাদা তেল ১৫০ গ্রাম, জল-ঝরানো টক দই ২০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কাবাটা ২ টেবলচামচ, আদাবাটা ১ টেবলচামচ, চিনি ১ টেবলচামচ, নুন ১ চা-চামচ, জয়িত্রীগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাজুবাটা ৩ টেবলচামচ।

প্রণালী: ফুলকপিতে নুন মাখিয়ে, সাদা তেলে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই আদাবাটা আর কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে, ভাল করে কষে নিন। দই দিন, কাজুবাটা দিন তারপর। কষাতে থাকুন। তেল বের হতে শুরু করলে, জয়িত্রী দিন। কপি দিন তারপর। ভাপে রান্না হতে দিন। কপি নরম হলে, নামিয়ে নিন।

গঁদের পায়েস

উপকরণ: খাওয়ার গঁদ ১০০ গ্রাম (বড় টুকরো), ঘন দুধ ১ লিটার, কনডেন্সড মিল্ক ১/২ কাপ, ছোট এলাচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ভাজার জন্য ঘি ৭০ গ্রাম মতো, আমন্ডকুচি ৩ টেবলচামচ, কিশমিশ ৩ টেবলচামচ।


সাদা কপি


গঁদের পায়েস

প্রণালী: ঘি গরম করে অল্প অল্প গঁদ খইয়ের মতো ভেজে তুলুন। দুধ ফুটতে দিন। দুধে একে একে এলাচ, বাতাসা আর কনডেন্সড মিল্ক মেশান। নামিয়ে নিয়ে, ভাজা গঁদ মেশান দুধে। ঠান্ডা করে, কিশমিশ আর আমন্ডকুচি ছড়িয়ে দিন।

চিলি পনির

উপকরণ: পনির ১ কেজি (২ ইঞ্চি বাই ২ ইঞ্চি টুকরো করে কাটা), বড় সবুজ ক্যাপসিকাম ২টো (২ ইঞ্চি বাই ২ ইঞ্চি করে কাটা), আদা (১/২ ইঞ্চি লম্বা টুকরো করে কাটা) ৩ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা ১০টা (কুচনো), সাদা তিলবাটা ৩ টেবলচামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ২ টেবলচামচ, নুন ১/২ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবলচামচ, মাখন ৫০ গ্রাম, সাদা তেল ৫০ গ্রাম, তাজা লেমনগ্রাসকুচি ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: পনিয়ের টুকরোয় অর্ধেকটা মাখন, কর্নফ্লাওয়ার, নুন, চিনি, লেবুর রস মাখিয়ে, কাঁটা দিয়ে পনিরের গায়ে ফুটো ফুটো করে রাখুন। সাদা তেল গরম করে, তাতে মাখন মেশান। কাঁচালঙ্কাকুচি দিন এতে। আদা দিয়ে, মিনিটখানেক নেড়েচেড়ে ভাজা-ভাজা করে নিন। ক্যাপসিকাম দিয়ে, আরও মিনিটখানেক ভাজুন। তারপর পনির দিন। চিলি ফ্লেক্স আর সাদা তিলবাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে রাঁধতে থাকুন। সবটা ভালমতো মিশে গেলে, লেমনগ্রাস ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

স্টার অ্যানিস ফ্রায়েড রাইস

উপকরণ: দেরাদুন রাইস ২৫০ গ্রাম, মাখন ৭০ গ্রাম, লাল ক্যাপসিকাম ১/৪ কাপ, হলুদ ক্যাপসিকাম ১/৪ কাপ, সবুজ ক্যাপসিকাম ১/৪ কাপ (চৌকো টুকরো করে কাটা), লম্বা করে কুচি করা আদা ২ ইঞ্চি, নুন ১/২ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, পার্সলেকুচি ২ টেবলচামচ, কর্ন ২ টেবলচামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ৫টা, স্টার অ্যানিস ৮টা (২টো গোটা রাখতে হবে)।

প্রণালী: চাল ধুয়ে, একটু শক্ত করে সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরিয়ে, চাল কাপড়ে মেলে শুকিয়ে নিন। মাখন গরম করে, আদা আর কাঁচালঙ্কা দিন। আধমিনিট মতো নেড়েচেড়ে নিন। কর্ন আর ক্যাপসিকাম দিন। আরও মিনিটখানেক নাড়াচাড়া করুন। এরপর ভাত দিন। নুন আর চিনি দিয়ে, হালকা হাতে নাড়াচাড়া করুন। সবটা মিশে গেলে, এতে স্টার অ্যানিসগুঁড়ো মিশিয়ে নিন। পার্সলেও মেশান। নামিয়ে, উপরে দুটো গোটা স্টার অ্যানিস সাজিয়ে দিন।

মুগের নাড়ু

উপকরণ: সোনামুগ ডাল ১/২ কেজি, গাওয়া



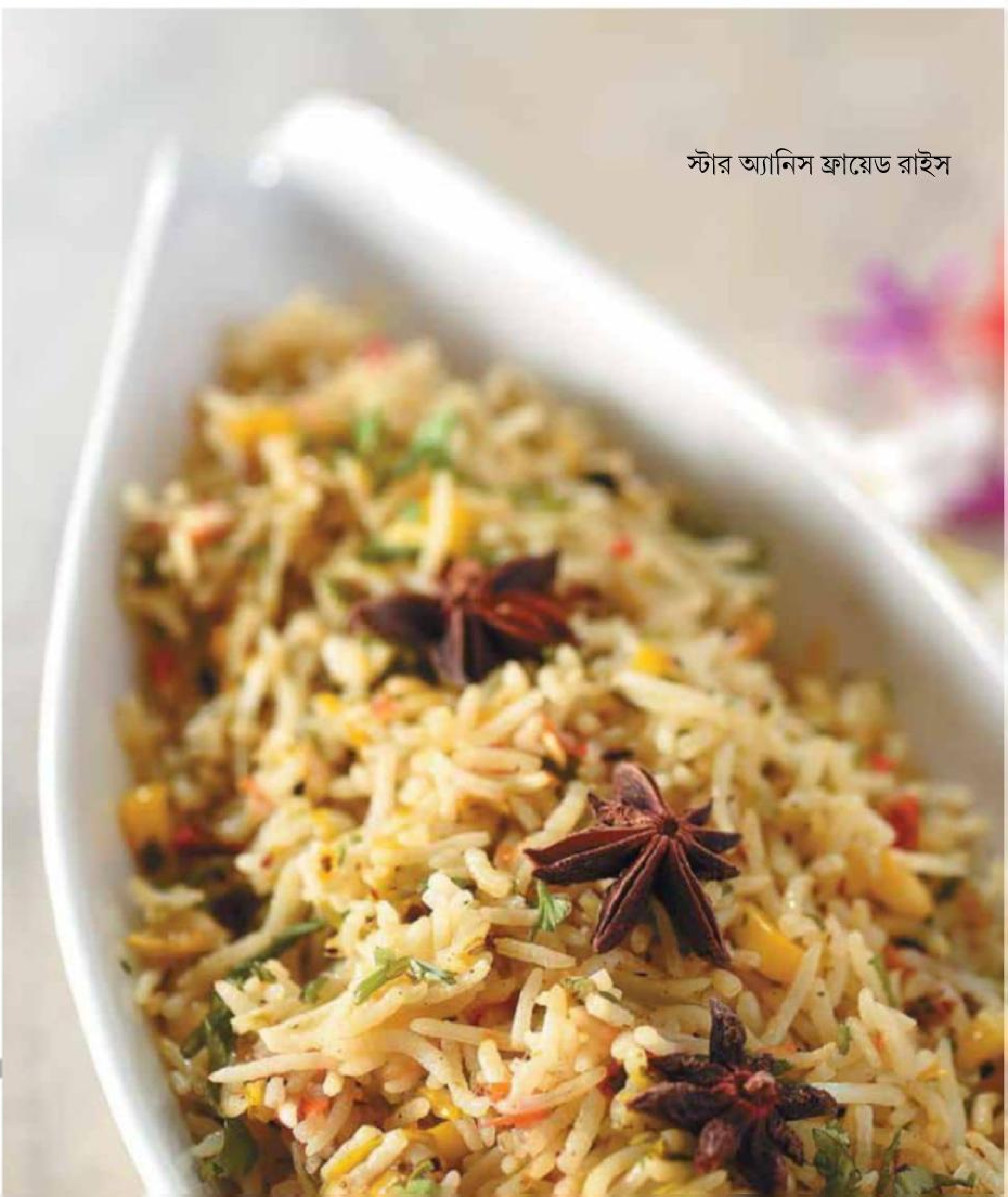
চিলি পনির

ঘি ৩০০ গ্রাম, গুঁড়ো চিনি ৪০০ গ্রাম, খোয়াক্ষীর ৩০০ গ্রাম, কেশর ৫ চিমটি, দুধ অল্প, জায়ফলগুঁড়ো $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, পেস্তাকুচি ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: কেশর দুধে গুলে রাখুন। ডাল ভেজে, অল্প জলে সেদ্ধ করে নিন মড়মড়ে করে। শিলে বেটে নিন। ঘি গরম করে, তাতে জায়ফলগুঁড়ো মেশান। ডালবাটা দিন। অল্প আঁচে ভাজুন, সোনালি হওয়া অবধি। হয়ে গেলে, ডালে চিনি মিশিয়ে, পাক দিতে থাকুন। মিশ্রণ কড়াই থেকে ছেড়ে এলে, ক্ষীর মিশিয়ে আবার পাক দিন। ডালের মিশ্রণ তাল পাকিয়ে কড়াই থেকে উঠে এলে তাতে দুধে গোলা কেশর ও কিছুটা পেস্তার কুচি মেশান। নামিয়ে নিন। ডালের মিশ্রণ গরম আছে, কিন্তু হাতে নিয়ে নাড়ু পাকানো যাচ্ছে— এমন থাকতে থাকতেই নাড়ুগুলো পাকিয়ে ফেলুন। বাকি পেস্তাকুচি উপরে সাজিয়ে দিন।

নাসপাতির চাটনি

উপকরণ: আপেল (সেদ্ধ করে, জল সমেত বাটা) $^{1}/_{2}$ কেজি, চিনি $^{1}/_{2}$ কেজি, নুন $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, সাইট্রিক অ্যাসিড $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, বড় নাসপাতি ২টো (খোসাসহ কুচনো), বড় বেদানা ১টা (ছাড়ানো), কর্নফ্লাওয়ার ১



স্টার অ্যানিস ফ্রায়েড রাইস



মুগের নাড়ু

টেবলচামচ।
প্রণালী: আপেল সেদ্ধ করে, চিনির সঙ্গে জ্বাল দিয়ে নিন। এবার এতে সাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে, ফুটতে দিন। অল্প জলে কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিন। আপেলে এই কর্নফ্লাওয়ার গোলা মিশিয়ে, আর একবার ফুটতে দিন। হয়ে গেলে, আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। নাসপাতির কুচি আর বেদানার দানা দিয়ে সাজিয়ে দিন।

আলু মাখানা

উপকরণ: সেদ্ধ আলু (চৌকো করে কাটা) ১/২ কেজি, মাখানা ২০০ গ্রাম, মাখন ৭০ গ্রাম, গোলমরিচ ১ টেবলচামচ, নুন ১/২ চা-চামচ, শুকনো পুদিনাপাতা ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ।
প্রণালী: প্রথমে ২০ গ্রাম মাখন দিয়ে মাখানা ভেজে নিন। কম আঁচে, লাল করে ভাজবেন। ১ চা-চামচ গোলমরিচ দিয়ে, নামিয়ে নিন। এবার বাকি ৫০ গ্রাম মাখনে সেদ্ধ আলু ভেজে নিন। নুন, বাকি গোলমরিচ ও শুকনো পুদিনাপাতা মিশিয়ে দেবেন আলুতে। নামিয়ে, লেবুর রস দিয়ে দিন। আলু ও মাখানা মিশিয়ে নিন।



নাসপাতির চাটনি

যেহেতু ভোগের রান্না, ফলে রান্নার সময় স্বাদ নেওয়া যাবে না। তাই উপকরণের মাপ বজায় রাখা জরুরি।

যোগাযোগ:
৯১৬৩০৭৭৮৭৪/৯৮৩১৮৫৮৬২৯
তথ্য সহায়তা: প্রবাস অ্যান্ড কো. দুর্গোৎসব
ছবি: শুভেন্দু চাকী
রেসিপি সংকলন: সংবেত্তা চক্রবর্তী



আলু মাখানা